সুনীল চক্রবর্তী

বঙ্গবাণী প্রকাশন

৫৬ সূর্য সেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৭ ॥

প্রকাশক
শ্রীহিতেন্দু ভট্টাচার্য
বঙ্গবাণী প্রকাশন
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ ॥

মুদ্রাকর
শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস (প্রাইভেট) লিমিটেড
৯, এ্যান্টনী বাগান লেন, কলিকাতা ৯ ॥

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুমুখ মিত্র

বাঁধাই
উদয় বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ ॥

●

মূল্য তিন টাকা ॥

তাঁদের হাতে
যাঁরা আমার
সুখে সুখী
দুঃখে দুঃখী

ঝাঁ ঝাঁ ক'রে আগুন বেরিয়ে গেল, কানের ছু'পাশ দিয়ে। কপালের ছু'পাশের শিরা ছু'টো টিপে ধরে, দাঁড়িয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন মুহূর্তে সরে গেল। আমি যেন অতলে তলিয়ে গেলাম।

বন্ধুটি এপার ছেড়ে ওপারে চলে গেছে।

খবরদাতা, আমাদের পরিচিত ভদ্রলোকটির দিকে একবার পিছন ফিরে তাকালুম। দেখলুম, আমাকে উদ্বেগাকুল সাগরে অপ্রত্যাশিত ভাবে ঠেলে ফেলে দিয়ে তিনি কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে কদম চালে চলেছেন।

পথের মাঝে এ হেন খবরটি ওঁর না দিলেও চ'লত। কারণ এ তো আর বন্ধুর থাকা বা না থাকার প্রশ্নই শুধু নয়; এ যে আমার পথে বসবার পাকা ব্যবস্থা! কিন্তু আমার অবস্থা জেনে শুনে সজ্ঞানেই উনি খবরটা আমাকে দিলেন। কারণ খবর সু অথবা কু-ই হোক, তা পরিবেশনের মধ্যে একটা বিলাস আছে।

কিন্তু না! আর দাঁড়িয়ে ভাবা চলে না! এগোলাম বাসার দিকে।

হঠাৎ 'কাফে-ডি-মঁসিয়ে' রেঁস্তোরার সামনে থম্‌কে দাঁড়ালুম। অনেক স্মৃতিই মনের মধ্যে এসে ভিড় জমাল। এই রেঁস্তোরায় বসে আমি আর বন্ধুটি কত না চা টোষ্ট খেয়েছি।

আমাকে দাঁড়াতে দেখেই দোকানদার সনাতন বাবু, সনাতনী প্রথায় আমাকে আহ্বান করলেন—'এই যে আসুন।'

একরকম নিজের অজান্তেই দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। মনের ও দেহের দিক থেকে নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। একটু

জিরিয়ে নেবার তাগিদ অনুভব করলুম। তাই আমাদের নির্দিষ্ট কোণের দিকের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম, যে চেয়ারটিতে বন্ধুবর বসত, সেই চেয়ারটিতেই দেহভার ন্যস্ত করলুম।

সনাতনবাবু হেসে বললেন—আজ যে বড় একা! বন্ধুটি কোথায়?

ভেতর থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। সেটাকে চেপে রেখে বললুম—এক কাপ্ চা!

মনে মনে বললুম—এখানে এই বসাই তো শেষ বসা!

সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে দুঃখ হ'ল। কারণ উনি তো আর জানেন না, যে যার জন্যে আমার এত সমাদর—সেই বন্ধুটি আর এপারে নেই!

কতদিন এই দোকানী দু'দিনের বাসী চপ্ সদ্য বলে আমাদের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছেন।

একদিন ত 'চপে' কামড় দিয়ে, পচা গন্ধ পেয়ে বন্ধুটির নিষেধ সত্ত্বেও দোকানীকে চেপে ধরলুম। সনাতনবাবু হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন তদন্ত করতে। কর্মচারীদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুব একচোট ধম্‌কালেন—পাঁজী কোথাকার! কাকে কি দিতে হবে তা এখনও শিখলিনি? দে শীগ্‌গীর, ঐ আলমারীর কোণের দিক থেকে ভাল চপ্ এনে।

আমাদের দিকে ফিরে খেদের সঙ্গে বললেন—দেখছেন ত মশাই, এইসব অর্বাচীনদের নিয়ে আমার চলতে হয়। কিছু মনে করবেন না, ও আপনারা ফেলে দিন। ভাল জিনিস এনে দিচ্ছি।

সনাতনবাবুর নির্দেশ মত যা এনে দিল, তাতে কামড় দিয়েই আমার অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবার উপক্রম হ'ল। আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে কলের কাছে ছুটে গেলুম। ফিরে এসে রেগে বন্ধুকে বললুম—এ দোকানে আর নয়। বন্ধুটি হেসে বললে—কিন্তু কোথায় যাবি? সবার চেহারাই যে একরকম দেখতে।

আজ বিস্মিত সনাতনবাবুকে শুধু নির্জলা এক কাপ্ চা মাত্র খেয়ে, পয়সা দিতে গিয়ে, নিজেরও বুক ফেটে কান্না এল। কারণ এই পয়সা বরাবর বন্ধুটিই দিত।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে রাস্তায় নামলুম। চলন্ত ট্রামটার দিকে চেয়ে, বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল। ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে, ওই কণ্ডাক্টর ভদ্রলোকটি আমাদের মুখচেনা হয়ে গিয়েছে। কতদিন তার গাড়ীতে পয়সা ফাঁকি দিয়ে গিয়েছি!

বন্ধুটি বরাবরই আপত্তি করত। এমন কি নামবার সময় পর্যন্ত কণ্ডাক্টরকে ডেকে ন্যায্য ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তবে নামত। এর জন্যে গন্তব্যস্থল ছেড়ে এক স্টপেজ পরে নামতেও সে রাজী ছিল। আমার উল্টোটি, কণ্ডাক্টরের মোলাকাৎ এড়াতে চার স্টপেজ পিছনে নেমে গন্তব্যস্থলে হেঁটে আসবার জন্যে সব সময়ই প্রস্তুত।

আমি তাকে বোঝাতাম,—দ্যাখ, বিদেশী বেনিয়া কোম্পানী, কতভাবেই না আমাদের রক্ত শোষণ করে নিয়েছে; এমন কি ট্রামে ছারপোকা পুষে আমাদের অবশিষ্ট রক্তটুকু পর্যন্ত চুষে নেবার ব্যবস্থা করেছে। অথচ যানবাহনের মত এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা নাকি বহুপূর্বেই বৈধভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া উচিত ছিল: তা না হয়ে আমাদের বুকে বসে, আমাদেরই দাড়ি ওপড়াচ্ছে। আমাদেরই রক্ত মাংস মজ্জা লুটে নিয়ে বিলাতী দেহের মেদ বৃদ্ধি করছে। অতএব হে বন্ধু, এমন রক্তশোষক বিদেশী বেনিয়া কোম্পানীকে পয়সা ফাঁকি দিয়ে পুণ্য সঞ্চয় কর।

কিন্তু বন্ধুটি, আমার এতসব তালিম দেওয়া দামী দামী কথাগুলোর উত্তরে ওষ্ঠদ্বয় সিকিটাক ফাঁক ক'রে হাসল মাত্র। বলাই বাহুল্য যে এর পর তাকে উপদেশ দেবার মত উৎসাহ ও ধৈর্য কোনোটাই আমার থাকার কথা নয়। বুঝলাম এ একেবারে ছাইয়ে জল ঢাললুম।

ঢং ঢং করে আমার বুকের ভিতর হাতুড়ীর ঘা মেরে ট্রামটি চলে গেল।

এই রাস্তার হু'ধারে যা দেখি তাই আমার বন্ধুর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত। ওই যে ওই ফুটের মাংসের দোকানটি। সাইন বোর্ডে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলছে—'বাঙ্গালী পাঁঠার দোকান, গ্রাহকদের সম্মু কাটিয়া দেওয়া হয়।'

বন্ধুটি ভয়ে ওই দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটত না। আমি কতদিন সাহসে ভর ক'রে, প্রাণ হাতে ক'রে, বন্ধুর টাকায় ওই দোকানের গ্রাহকদের সম্মু কাটিয়া দেওয়া বাঙ্গালী পাঁঠার মাংস কিনে এনে, ষ্টোভে তা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় ক'রে রান্না ক'রে খেয়েছি।

লর্ড ক্লাইভ মসি ছেড়ে অসি ধ'রেছিলেন ভারতে বৃটিশ রাজত্ব কায়েম করতে। আর ওই যে ওই ফুটপাথ দিয়ে, যে ভদ্রলোকটি পান চিবুতে চিবুতে যাচ্ছেন,—তিনি অসি ছেড়ে মসি ধরেছিলেন সেই রাজত্বের উচ্ছেদ করতে। ভদ্রলোকটি যৌবনে ছিলেন টেররিস্ট দলের পাণ্ডা। কয়েক বছর কারাবাস ভোগ করে, জেল থেকে বেরিয়ে এসে এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হয়ে বসলেন। পত্রিকাটির মালিকানাও তাঁরই। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বৃটিশকে চুটিয়ে গালাগাল দিতেন। স্বাধীনতা পাবার পর এখন বিশেষ একটি দলকে খুব কষে শাপ-শাপান্ত করছেন। ফলে সরকারী বিজ্ঞাপনগুলো ওঁর কাগজে ছাপা হচ্ছে। পত্রিকাটির প্রচার বহুল নয়, অথচ মেদ বহুল। আর মেদ বাড়ছে দিন দিন ঐ ভদ্রলোকটির।

ভদ্রলোকটি গভীর জলের মাছ। চালচলন দেখে তাঁর চালিয়াতি বোঝা দুষ্কর, সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মতই গুরু-গম্ভীর চালে থাকেন, কিন্তু দেখা হলেই অমায়িক হাসি, হাসিটাই তার ট্রেড্‌মার্ক। বাজারে এর অনুরূপটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া

যাবে না। মুখ না দেখেও শুধু হাসিটি দেখেই বলে দেওয়া যাবে, হাসিটির মালিক কে। তাঁর হাসিতে শব্দ হয় না। অথচ তাম্বুল-রাগ-রঞ্জিত দাঁতগুলির প্রায় সব ক'টিই দেখা যায়। শ্রবণসীমার বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর হাসিটি দেখলে মনে হবে, কত প্রচণ্ড শব্দেই না তিনি হাসছেন!

রাজনীতির কর্মসূত্রে ভদ্রলোকটির সঙ্গে বন্ধুর পূর্বে পরিচয় ছিল।

হ্যাঁ, ভাল কথা। বন্ধুটির একটি কু-কীর্তির কথা এখনও বলা হয়নি। রাজবন্দী হিসেবে দীর্ঘমেয়াদী কারাবাসের অখণ্ড অবসরগুলো সে সাহিত্য-চর্চা দিয়ে ভরে রেখেছিল। আর সেগুলো যথারীতি বাক্সে ভরে রেখেছে। বন্ধুটি ওগুলো নিয়ে কারো কাছে যায়ওনি বা কারুকে দেখায়ওনি। ফলে তার কতগুলো কেটেছে পোকায়, কতগুলো গেছে হারিয়ে, বাকীগুলো বিবর্ণ হয়ে বাক্সের ভিতর কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে আছে।

আমিই একদিন সেগুলো আবিষ্কার করে অনুযোগের সুরে বললুম—এগুলো ছাপাসনি কেন?

বন্ধুটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—দূর দূর! এসব কি কেউ ছাপ্‌বে নাকি? যতসব অখাদ্য—!

আমি প্রতিবাদ করে বললুম—মোটেই না। দেখছিস না, পোকায় কেমন সুখাদ্য করে খেয়েছে!

তারপর তার কোনোপ্রকার নিষেধ না শুনে আমি তার ভিতর থেকে কতগুলো বেছে নিয়ে, বললুম—যাচ্ছি—।

বন্ধুটি বললে—কোথায়?

আমি ওই সম্পাদক ভদ্রলোকটির নাম করলুম। বন্ধুটি শুনে বল্‌লে—যেতে চাও-যাও, কিন্তু শেষে পস্তিওনা। গেলুম এবং বন্ধুর পরিচয় দিলুম। শুনে সেই অমায়িক হাসির ভিতর তা সাদরে গ্রহণ করলেন। ভাব দেখে খুবই আশান্বিত হলুম।

মনে মনে একটু গৌরবও অনুভব করলুম। যাক,—এগুলোর এতদিনে একটা হিল্লে হ'ল, আর তা আমারই প্রচেষ্টায়।

দিন যায়, মাস যায়, বছরও প্রায় গড়িয়ে চল্‌ল। মাসিক পত্রিকার নো পাত্তা। আমি যতই উদ্বিগ্ন হচ্ছি বন্ধুটি ততই নির্বিকার। অবশেষে মরিয়া হ'য়ে গেলুম একদিন সম্পাদক মশাইয়ের কাছে। যেতেই সেই অমায়িক হাসির ভিতর বাণ্ডিলটা ফেরত দিয়ে ব'ললেন—এ চলবে না।

দিনকয়েক বাদে, একদিন অন্য একটি মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে একটা গল্পের দিকে চোখটা হঠাৎ আটকে গেল। দেখলুম হুবহু বন্ধুর লেখা একটি গল্প। কিছু-মাত্র বদল হয়নি। সবই ঠিক আছে, শুধু লেখকের নাম আর পাত্র পাত্রীর নামের যা' বদল হ'য়েছে। আমি রেগে মেগে হাত পা ছুড়ে খানিকক্ষণ লম্ফঝম্ফ করলুম। তক্ষুণি যেতে চাইলুম ওই সম্পাদক ভদ্রলোকের কাছে।

বন্ধুটি হেসে নিষেধ করে ব'ললে—যাসনি, উনি আমার একটি মহৎ উপকার করলেন রে!

আমি ব'ললুম—উপকার!

বন্ধুটি ব'ললে—হ্যাঁ, এতদিনে জানলুম—আমার লেখাও তাহলে ছাপার যোগ্য! বলে হাসল। আমার যত রাগ গিয়ে পড়ল বন্ধুর উপর। এলোপাতাড়ি বললুম—তুই নির্বীর্য, ক্লীব—তোর যা কিছু তেজ—সব জেলে খুইয়ে এসেছিস। তুই এখন হাতীর খাওয়া কদ্‌বেলের মত—

বন্ধুটি একটি সিগারেট ছুড়ে দিয়ে ব'ললে—নে এখন ঠাণ্ডা হয়ে ব'স।

সম্পাদক মশাই গদাইলস্করী চালে হেল্‌তে দুল্‌তে চ'লে গেলেন। আমি তাকে ভেংচি কাটব কি কিল দেখাব ঠিক করতে না পেরে পথ ধরলুম।

চ'লতে গিয়েই আঁৎকে উঠলুম। সেই বেওয়ারিশ গরুটি।

একদিন আমাকে আর বন্ধুকে কি বিষম তাড়াই না করেছিল! আমরা সেদিন পড়তে পড়তে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিলুম। বন্ধুটি সেদিনই রাষ্ট্রের কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে এর প্রতিকারকল্পে এক দরখাস্ত লিখে ফেল্‌লে। আমি দরখাস্তের বয়ানের সঙ্গে আর একটু যোগ করে দিতে ব'ললুম—'ঐ সঙ্গে লিখে দে—আমরা গম ও কাঁকরভোজী বাঙ্গালীরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক ঠেলাগুতায় এমনিতেই ক্ষীণপ্রাণ হইয়া আছি, তার উপর আবার গরুর গুতা খাইলে আর অবশিষ্ট কি থাকিবে!"

কিন্তু বন্ধুটি আমার কথাগুলো কানেই তুলল না, তা' লেখা ত দূরের কথা!

কিন্তু বন্ধুর দরখাস্ত যে আস্তাকুঁড়েই স্থান পেয়েছে, তা এই গরুটিকে বহাল তবিয়তে বিচরণ করতে দেখেই বুঝলুম।

তবু এই গরুটিকে আজ আমি নবরূপে দেখলুম। কারণ এর সঙ্গে আমার বন্ধুটির স্মৃতি জড়িত।

সাবধানে পাশ কাটিয়ে এগোলাম।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে অবাক হয়ে গেলুম। চেয়ে দেখি 'অবাক জলপানে'র মালিক অক্ষয়বাবু কাকে যেন ডাকছেন।

অক্ষয়বাবুর নাকটি আর ইঞ্চি তিনেক লম্বা করে বাঁকা করে দিতে পারলেই, সিদ্ধিদাতা গণেশ বলে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যেত। যে উড়ে বামুনটি রোজ সকাল-সন্ধ্যায় হাত দশেক দূর থেকে দুর্বোধ্য ভাষায় গণেশ পূজা করে যায়, সে নিশ্চয়ই দু'একদিন ভুল করে অক্ষয় বাবুর গায়ে গন্ধ পুষ্প ছিটিয়ে থাকবে।

এ দোকানে 'এ' থেকে 'জেড্‌' পর্যন্ত সকল প্রকার ভিটামিন-

যুক্ত খাবার সযত্নে সুরক্ষিত থাকে। সাইন্‌বোর্ডে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—"রসনার তৃপ্তি আর স্বাস্থ্যের সুস্থতা, সুপরিচ্ছন্ন সুখাদ্যের উপরই নির্ভর করে এবং তা সরবরাহের দাবী একমাত্র আমরাই করিতে পারি।"

অতএব বন্ধুকে একদিন ঠেলে-ঠুলে নিয়ে গেলুম অক্ষয়বাবুর 'অবাক জলপানে'।

কিন্তু সিঙ্গারার ভিতর মরা মাছি পেয়ে বন্ধুটি দেখি অবাক হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

তবু আবারও হয়ত যেতাম ঐ দোকানে। কিন্তু একদিনের এক দৃশ্য দেখে চক্ষু স্থির করে 'অবাক জলপানে'র সাইন্‌বোর্ডের দিকে চেয়ে রইলাম।

রাস্তার পাশে হাইড্রেন্টকে কেন্দ্র করে চারদিকে দুই বর্গফুট ইট খোয়া সরিয়ে এক বৃত্তাকার বিকল্প পুকুরের সৃষ্টি করে নিয়েছে পাড়ার বাসিন্দারা। হাইড্রেন্টটির মুখ সদাই উন্মুক্ত, আর তা দিয়ে অনবরত জল উদ্‌গীরণ হচ্ছে। আশেপাশের লোকের নিত্যকর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা ওখানেই। সেদিন যা দেখলাম--!

এক পাশে একটি ছ' সাত বছরের উলঙ্গ বালক, তার সদ্যকৃত অবশ্য-করণীয় ক্রিয়ার পর, পরবর্তী অনুষ্ঠানটি সেরে নিচ্ছে। তার পাশে এক মুচী বেশ কয়েক জোড়া পুরোনো জুতো ধুয়ে পরিষ্কার করছে, তার স্পর্শদোষ এড়িয়ে একটি মহিলা ব'সে এক রাশ বাসন মাজছেন, তারই সঙ্গে আর একজন মহিলা সুখ দুঃখের কথা ব'লতে ব'লতে তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের রাত্রি বেলাকার অপকর্মদুষ্ট কাঁথা-কাপড়গুলো পরিষ্কার করছেন, একটি লোক খুব গম্ভীর ভাবে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নিচ্ছে, আর একটা দিক্‌ প্রায় আধখানা অধিকার করে—অবাক জলপানের এক কর্মচারী গণ্ডা কয়েক দইয়ের মাল্‌সা ধুয়ে সুপরিচ্ছন্ন সুখাদ্য প্রস্তুতের প্রথম পর্ব সম্পাদন করছে।

আমি একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। অক্ষয়বাবুর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করাতে, তিনি উল্টে আমার অজ্ঞতার দরুণ কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। বললেন—বলেন কি, এতে দোষের তো কিছু নেই। মা গঙ্গার জল, অতি পবিত্র—তবে বলতে পারেন 'চাপাকলের জল'—তা গঙ্গার জল সব সময়ই গঙ্গাজল। তাছাড়া চোখে দেখলেন বলেই যা!

আমি রেগে বললুম—সাইন্‌বোর্ডে ত খুব লিখেছেন সুপরিচ্ছন্ন সুখাদ্য···। এই কি সুপরিচ্ছন্নতার নমুনা!

অক্ষয়বাবু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আহা-হা, আপনি তো গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল করে ফেললেন, সুপরিচ্ছন্নতা তো আমাদের প্রস্তুতের বেলায় নয়, ওটা পরিবেশনের বেলায়। দেখছেন না, খেতে বসে বাবুদের আমাদের প্রতি কি কড়া দৃষ্টি! বলেন, হাত দিয়ে রসগোল্লা তুলে দেবে না, চিমটে দিয়ে দাও। কিন্তু বাবুরা যদি জানতেন যে ঐ রসগোল্লা খানিক আগে আমারই কর্মচারী ঘণ্টু ঘর্মাক্ত কলেবরে দুহাতে পাকিয়েছে, তাহলে আর—বলেই খক্-খক্ করে হাসতে লাগলেন অক্ষয়বাবু।

হাসলেন মুখ খুলেই, কিন্তু মুখের উপর মৈনাক পর্বতের মত তাঁর খাড়া নাকটি চেপে থাকায় অর্ধেকটা মুখ তার দেখা গেল না। অক্ষয়বাবু একটানা হেসে চল্‌লেন, আমার পেটের ভেতর যেন আমাশয়, টাইফয়েড, কলেরার জার্মগুলো এক সঙ্গে কিল্‌বিল্ করে উঠল।

'অবাক জলপান' থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে হেঁটে চ'ল্‌লাম।

কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকের বিখ্যাত হাসপাতালের দিকে চেয়ে একটা কথা মনে পড়ে এত দুঃখের ভিতরও হাসি পেল।

কিছুদিন আগের কথা। আমি আর বন্ধুটি ঘুমিয়ে আছি।

রাত তখন আন্দাজ দু'টো। হঠাৎ আমাদের দুর্বল দুয়ারের উপর সবল ধাক্কা পড়ল। সঙ্গে ত্রস্ত কণ্ঠের আবেদন—'উঠুন ত!'

আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে, দুয়ার খুলতেই দেখি—সমরেশ। সমরেশ প্রায় কাঁদ কাঁদ হ'য়ে ব'ললে—শীগ্গীর একবার আসুন। আমার স্ত্রীর আর বেশী দেরী নেই।

আমরা আকাশ থেকে পড়লুম। বললুম—সে কি!

সমরেশের অসহায় মুখের দিকে চেয়ে, এ বিপদে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য মনে করলুম। বললুম—কি আর করবেন। সবই ভগবানের হাত।

সে ব'ললে—আবার এদিকে মুস্কিল দেখুন। মা, বৌদি, দাদা সবাই বেলুড়ে, আমার মামাত বোনের বিয়েতে আজকেই চ'লে গেছেন, আজই যে একটা এদিক্-ওদিক্ হ'য়ে যাবে, তা তাঁরা অবশ্য বোঝেননি। কি যে করি!

আমরা যতদূর সম্ভব তাকে ভরসা দিয়ে বললুম—আপনার কিছু চিন্তা নেই! আমরা দু'জন আর আপনি এই তিনজন যখন আছি, তখন একটা ব্যবস্থা হবেই।

সে ব'ললে—একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

বন্ধুটি ব'ললে—আপনি যান। আমরা এক্ষুণি আসছি।

সমরেশ চ'লে গেল। আমরা দুই বন্ধু খানিক বাদে, গামছা কাঁধে, খালি পায়ে, সমরেশের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করলুম।

পথে বন্ধুটি একবার গম্ভীর হয়ে ব'ললে—অথচ বিয়ে হ'য়েছে মাত্র এই একবছর! কি যে হ'ল!

সত্যিই কি যে হ'ল—এটা সমরেশের মুখের দিকে চেয়ে আর জিজ্ঞেস করতে ভরসা পাইনি।

এসব ব্যাপারে বন্ধুর চেয়ে আমার উৎসাহই সমধিক। পাড়ার কোনো লোক মরলে, আমি গামছা কাঁধে হাজির হবই। বিশেষ ক'রে যদি কোনো বড়লোক মরেন। মৃতের স্বজনরাও আমাকে

পরম বন্ধু ভাবেই গ্রহণ করে থাকেন। কারণ—'রাজদ্বারে শ্মশানে চ—' এমন বান্ধব তারা সহজে হাতছাড়া করতে চাইত না। একটা সত্য আমি উপলব্ধি করেছি, বড়লোকের পিছনে ঘোরায়, সব সময়ই কিছু না কিছু প্রসাদ-লভ্য হয়ই হয়। তা জীবিতই হোক্ আর মৃতই হোক্। শ্মশান-বন্ধুকে না খাইয়ে, মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বর্গে যাবার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এমন দুরাত্মা উত্তরাধিকারী বোধ হয়, বাংলাদেশে একটিও নেই। অতএব আমার বরাতে মাঝে মাঝেই চর্ব্য-চোষ্য-ভোজন অবধারিত থাকত। কিন্তু বন্ধুটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সে স্বেচ্ছায় শবযাত্রী হ'ত। কিন্তু মৃতের বাড়ীতে সে এক ফোঁটা জল স্পর্শও করত না। ঐ এক ধরন! আর এই জন্যে আমি তাকে মনে মনে 'ফুলিশ' আখ্যা দিয়ে রেখেছি!

যাই হোক্, আমরা সমরেশের বাড়ী গিয়ে যখন উপস্থিত হলুম, তখনও সমরেশের বউর গোঙানী শোনা যাচ্ছিল।

আমার বন্ধুটি নিঃশ্বাস ফেলে সমরেশকে কি যেন ব'লতে গেল। কিন্তু তাকে কিছু ব'লতে না দিয়েই, সমরেশ তাড়াতাড়ি ব'ললে—শীগগীর একটা ট্যাক্সি ডেকে আনুন ত। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দেখুন কি কর্মের ভোগ, এই সবে মাত্র আট মাস।

এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে, আমাদের জালের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেললে। আমাদের যেন নড়বার চড়বার শক্তি রইল না। বিশেষ করে আমাদের কাঁধের গামছা দু'খানা নিয়ে, আমরা বড়ই বিব্রত হ'য়ে পড়লাম।

সমরেশের বউ তখনও গোঙাচ্ছে। আমার সম্বিৎ ফিরে এল। সমরেশের বউর প্রসব-বেদনা যেন নিজের বলে অনুভব করলুম।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—অমনি দুটো টাকা দিন ত, কিছু সিগারেটও নিয়ে আসি। কে জানে, যদি সারারাত হাসপাতালে

জাগতে হয়। সমরেশ টাকা আনতে ঘরের মধ্যে গেল, আমি বন্ধুকে চট্ করে বাসায় গিয়ে, তার এবং আমার জামা আনতে বললুম। আর গামছা দু'খানা রেখে আসতে বিশেষ ক'রে ব'লে দিলুম।

ইতিমধ্যে সমরেশ টাকা এনে দিতেই আমি সবেগে প্রস্থান করলুম।

আমি জানতুম এমত অবস্থায় যা চাইব, সাধ্যায়ত্ত হলে সমরেশ তার বউর জন্যে অনায়াসে তা দেবে।

ট্যাক্‌সি করে হাসপাতালে গেলুম। কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না, হাসপাতালের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে না উঠতেই, ডাক্তার পরম নির্বিকারভাবে বললেন—এখানে হবে না, সীট নেই।

বন্ধুটি সবিনয়ে বললে—দেখুন একেবারে ইলেভেন্‌থ্ আওয়ার উপস্থিত, এ অবস্থায়—।

ডাক্তারবাবু মুখ খিঁচিয়ে বললেন—তা আমি কি করব, অন্যত্র দেখুন।

বন্ধুটি বহু আবেদন নিবেদন ক'রল, পরে দু'একটা কড়া কথা শুনিয়ে তার বক্তব্য শেষ করল।

ডাক্তারবাবু একবার বন্ধুর দিকে চেয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাশের নার্সের সঙ্গে বোধ হয় কোনো জরুরী কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সেখান থেকে নেমে আমরা আর একটা হাসপাতালে গেলুম। পথের মাঝে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। সমরেশের বউর এত সব গোঙানী, মুহূর্তে চুপ হ'য়ে গেল। পিছনের সীটে বসে সমরেশ জিজ্ঞাসা করতেই, তার বউ ফিস্‌ফিস্ করে যা' বললে, সমরেশ তা আমাদের ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলে,—এখন ব্যথার নাম-গন্ধও নেই।

বন্ধুটি বললে—তবু একবার হাসপাতালে দেখান উচিত।

সৌভাগ্যের বিষয়, হাসপাতালে যেতেই রোগিনীকে পরীক্ষাগারে

নিয়ে যাওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ বাদে, রোগিনীকে ফিরিয়ে দিয়ে নার্স বললে—এটা ফল্‌স্‌ পেইন্‌, ডাক্তারবাবু বললেন আরও সাতদিন আপনারা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।

লম্বা সাতদিন ঘুমের প্রেসক্রিপ্‌শন্‌ করে দিয়ে নার্স অন্তর্ধান হলেন। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীতে উঠলুম। কারণ ইতিমধ্যে সমরেশের ঘরের অন্যান্য সকলেও এসে পড়বেন, আমাদেরও আর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না।

কিছুদূর যেতেই সমরেশের বউ একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে সমরেশের হাত চেপে ধরলে! 'কি হ'ল কি হ'ল' বলে আমরা হৈ হৈ করে উঠলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে 'ওঁয়া' 'ওঁয়া' করে সদ্য গাড়ীষ্ঠ শিশুটি জানিয়ে দিলে—সোনার বাংলার এমন স্বর্গসুখ ভোগ করিতে আমিও আসিলাম।

সমরেশ চীৎকার করে বললে—গাড়ী ঘোরাও হাসপাতালের দিকে।

বন্ধুটি ততোধিক গম্ভীরভাবে বললে—না, বাড়ীর দিকে। আমি এক্ষুণি একজন ভাল নার্স নিয়ে আসছি।

হাসপাতালের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুতপদে বাসার দিকে এগোলাম, পদব্রজে। কারণ ট্রামের পয়সা দিয়ে ইতিপূর্বে চা খেয়েছি।

কিন্তু আবার থামতে হল, এবং শ্রদ্ধায় মাথাটি আপনিই নুয়ে এল, ভোলানাথবাবুর বাড়ীর দিকে চেয়ে।

একেই বলে যোগাযোগ। সে এক বিচিত্র ঘটনা। এক রাত্রে এক নাগরকে নিয়ে এক রিক্সাওয়ালা ঢং ঢং করে নাচতে নাচতে যখন বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে পৌঁছল, তখন ঘড়িতে বাজে দশটা। নাগরবাবু নেমে পড়লেন রিক্সা থেকে। নেমেই রিক্সাওয়ালা ভাড়া নিয়ে লাগিয়ে দিল মহাহুলুস্থুল। এবং হুলুস্থুলের আঁচ পেয়েই

এক এক করে পথিকের দল তাদের গন্তব্যে যাবার বিষয়টি আপাতত মূলতুবী রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ন্যায্য ভাড়ার চার ভাগের একভাগ মাত্র দিয়ে নাগরবাবু প্রস্থানোদ্যত হলে রিক্সাওয়ালা তার পুরো ভাড়া চেয়ে অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

নাগরবাবুর মনে এতে কি ভাবের উদ্রেক হল জানি না। তিনি হঠাৎ ফিরে রিক্সাওয়ালার প্রসারিত হাতের উপর থক্ করে একটু থুতু ফেলে দিয়ে আবার নিশ্চিন্ত মনে রওনা হলেন।

রিক্সাওয়ালা এবার ক্ষিপ্ত হয়ে নাগরবাবুর পথ রোধ করে হিন্দুস্থানী ভাষার প্রথম বুলি—'তেরে—' দিয়ে সম্ভাষণ আরম্ভ করল।

এতে নাগরবাবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। তিনি রিক্সা-ওয়ালার গালে ঠাস করে এক চড় কসিয়ে দিয়ে তার বেয়াদপির সমুচিত শিক্ষা দিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে গাড়ীতে ভোলানাথবাবু এসে উপস্থিত। গাড়ী তাঁর আটকে গেল জনতার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে। তিনি গাড়ী থেকে নেমে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন।

আমি আর বন্ধুটি ঐ পথ দিয়েই যাচ্ছিলুম। আমরা সূচনা থেকেই ভিড়ের সূত্রপাত করেছিলাম। আমি যদিওবা চলে যেতে চেয়েছিলুম, বন্ধুটি কিছুতেই রাজী হল না।

ইতিমধ্যে ভোলানাথবাবুর আগমনে আবহাওয়াটা যেন আরও গম্ভীর হয়ে পড়ল। নাগরবাবু ভোলানাথবাবুর দিকে ফিরে মুখ খুললেন এবং ভোলানাথবাবু যথারীতি রুমাল দিয়ে নাক বন্ধ করলেন।

নাগরবাবু জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ল্‌লেন—দেখুন তো, হরামজাদাদের কি সাহস! আমাকে কিনা "তেরে" ব'লে গালাগাল দেয়!

ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত শুনে, ভোলানাথবাবু ব'ল্‌লেন—ঠিকই তো,

এ হারামজাদাদের এই ভাবেই শিক্ষা পাওয়া উচিত। বেশ করেছেন মশাই।

সমর্থন পেয়ে নাগরবাবুটির উৎসাহ চতুর্গুণ বেড়ে গেল, তারপর রিক্সাওয়ালা যতই কিছু ব'ল্‌তে যায়, তিনি ততই তাকে নানা ব্যাকরণ-অশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ ক'রে থামিয়ে দিতে লাগলেন।

কথায় কথায়, ভোলানাথবাবু নাগরবাবুর নাম ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন, এবং তিনি যে একটা কাজের মত কাজ ক'রেছেন, তা বুঝিয়ে দিলেন।

বন্ধুটি আর চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, দেখুন ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, দোষ—।

ভোলানাথবাবু বন্ধুর দিকে চেয়ে ব'ল্‌লেন—আপনারা বুঝি এই রিক্সাওয়ালার পক্ষে? বন্ধুটি কিছু বলার আগেই তিনি ব'ল্‌লেন—যত দোষ বুঝি এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটির?

আমি ও বন্ধুটি এবং আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন সমস্বরে ব'লে উঠ্‌লুম—নিশ্চয়ই। ভোলনাথবাবু একটু চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে, তারপর স্মিত হেসে বললেন, আপনাদের নাম? কোথায় থাকেন?

আমার গোড়া থেকেই এই লোকটার উপর একটা অশ্রদ্ধা জন্মে গেছিল। তাই আমি কোনো প্রশ্নের উত্তর দিলুম না। কিন্তু অনুভব করলুম, এর কণ্ঠস্বর এত বলিষ্ঠ ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ যে এঁর কথার উত্তর না দিয়েও থাকা যায় না। তাই ব'লব কিনা ভাব্‌ছি, এমন সময় বন্ধুটি আমাদের নাম ধাম সব গড়্‌ গড়্‌ করে বলে দিল।

তিনি আর কিছু না ব'লে তাঁর গাড়ীর ড্রাইভারকে কি যেন ব'ল্‌লেন। ড্রাইভার গাড়ী ঘুরিয়ে চ'লে গেল।

তারপর তিনি উপস্থিত সকলকে বিস্মিত ও চমকিত করে দিয়ে, বিপুল দেহ নিয়ে রিক্‌সায় চেপে ব'সে হুকুম করলেন—নে, চল্‌।

আমরা জনসাধারণ এই ভদ্রলোকটির এই অসাধারণ কাজ দেখে হতবাক্ হ'য়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি ক'রে একযোগে মন্তব্য করলুম—অদ্ভুত!

তারপর যে যার পথ ধরলুম। এবং যথাসময়ে যথারীতি ব্যাপারটার কথা ভুলেও গেলুম।

কিন্তু একদিন আমাদের ঠিকানায় দুই সমন নিয়ে পুলিশ এসে হাজির হ'ল। আমরা অবাক্ হ'য়ে প'ড়ে দেখি—ফৌজদারী মামলার সাক্ষীর সমন।

খোঁজ নিয়ে জানলুম, সেই নাগরবাবুটির উপরও ফৌজদারী কোর্ট থেকে জানিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—যেহেতু তিনি মিঠুয়া সিংকে অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছেন, সেই হেতু তিনি কেন Calcutta Police Actএর 68 IV 66 ধারা অনুসারে আদালতে অভিযুক্ত হইবেন না, তাহার কারণ দর্শান হউক।'

সাক্ষী দিতেই হ'ল। মামলার বাদী সেই রিক্সাওয়ালা মিঠুয়া সিং, তদ্‌বিরকারক ভোলানাথবাবু, সাক্ষী আমরা দু'জন, আসামী সেই নাগরবাবুটি।

ঘটনার বিবরণ হ'ল এই—যুধ্যমান রিক্সাওয়ালা ও নাগরবাবুর মাঝখানে অকস্মাৎ ভোলানাথবাবুর আবির্ভাব। তারপর মদমত্ত নাগরবাবুকে বাহবা দিয়ে, দৃশ্যের মাঝখানেই রিক্সাওয়ালার গাড়ীতে আরূঢ় হ'য়ে, প্রস্থান। অতঃপর থানায় গমন, ডায়রী, পরের দিন কোর্টে মামলা দায়ের। ব্যস্, সুরু হ'ল আর এক দৃশ্য।

তদ্‌বিরের জোরে সেই নাগরবাবুর পঁচিশ টাকা জরিমানা হ'ল, তা থেকে অর্ধেক রিক্সাওয়ালাকে দেওয়া হ'ল।

কোর্ট থেকে বের হ'য়ে বন্ধুটি ভোলানাথবাবুকে ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম করে ফেলল।

তিনি হেসে তাঁর গাড়ী দেখিয়ে দিলেন। আমরা ভালোমানুষটির

মত, তাতে চেপে বসলুম। তাঁর বাড়ী এসে যথারীতি মিষ্টিমুখ ক'রে মাঝে মাঝে তাঁর ওখানে নিঃসঙ্কোচে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে আমরা রেহাই পেলুম।

তার পর থেকে কতদিন তাঁর ওখানে গিয়েছি এবং ঘরের ছেলের মত অসঙ্কোচে আলাপ আলোচনা করেছি।

যেমন প্রশস্ত তাঁর বুক তেমনি প্রশস্ত তাঁর অন্তর। শিশুর মত সরল, আবার হিমালয়ের মত দৃঢ়, বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক রায়বাহাদুর খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেবার ৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে বাংলায় ইংরেজের পাশব দমননীতির প্রতিবাদে তিনি সেই খেতাব ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেন।

নিজে, নিজের স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, এই চারটি প্রাণী নিয়ে তাঁর সংসার।

অপর্যাপ্ত অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন পরহিতের জন্যে। সংসারের পরিজনরা এ ব্যাপারে অসহযোগিতা করেন না—বরঞ্চ সহযোগিতা করেন পুরোপুরি। অতএব পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার মন্দির এই ভোলানাথবাবুর সংসারটি।

তাঁর স্নেহধন্য, প্রীতিধন্য আমরা দু'জন, তাঁর আশীর্বাদে জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করে নিলুম প্রচুর ভাবে।

একদিন বন্ধুর কথার উত্তরে আমি বলেছিলুম—ওরকম লোক, তুমি ক'টাই বা দেখতে পাও? তার উত্তরে বন্ধুটি সেই পুরোনো উপমাটা দিয়ে বলেছিল—দ্যাখ, সূর্য বা চন্দ্র এরা একাই পৃথিবীর পক্ষে যথেষ্ট। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, এরা কখনো লাখে লাখে জন্মান না। আসল কথা এরা দু'একটি আছেন বলেই দুনিয়াটা টিকে আছে। তোর মাথা আর আমার মাথা—কাঁধের উপর এখনও বর্তমান আছে। না হলে কবে খেয়োখেয়ি করে ধ্বংস হয়ে যেতুম!

একদিন কথায় কথায় বন্ধুটি ভোলানাথবাবুকে জিজ্ঞেস

করেছিল—তিনি কেন উপযাচক হয়ে, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও একটা সামান্য রিক্সাওয়ালার পক্ষ নিয়েছিলেন। তার উত্তরে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন—তোমরা ভুল বুঝেছ। আমি ত রিক্সাওয়ালার পক্ষ নিইনি, ওই লোকটি রিক্সাওয়ালাকে অন্যায়ভাবে মেরে মানবাত্মাকে অপমান করেছিল। রিক্সা টানা মিঠুয়া সিংয়ের বৃত্তি। তাই বলে মিঠুয়া তো আর জানোয়ার হয়ে যায়নি। সেও তো মানুষ। তাই মানবাত্মার নিপীড়নে, আমি মানবাত্মার পক্ষ নিয়েছিলুম, রিক্সাওয়ালার নয়।

উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে, আমার বন্ধুটি কোনো কথা বলতে না পেরে, শুধু তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

আমিও ভাবলুম—এত মহৎ, এত উদার! অতএব এমত অবস্থায় যা করা উচিত, তাই করলুম। কারণ এমন সুযোগ আমি কদাচ হাত-ছাড়া করি না।

ভোলানাথবাবুর কাছে পঁচিশটি টাকা ধার চেয়ে বসলুম।

এতে তিনি অত্যন্ত খুশি হ'য়ে টাকা তো দিলেনই, উপরন্তু সেইদিনই আমাদের চালচুলার খবর নিয়ে, বলে দিলেন—তিনিই যা হোক আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

কিন্তু বন্ধুটি সেই যে টাকা চাইবামাত্র, আমার পিঠের উপর রাম-চিম্‌টি কেটে ধ'রেছে, তা জায়গাটা পুরোপুরি নীল না ক'রে ছাড়ল না।

বাসায় ফিরবার পথে বন্ধুটি একটি কথাও আমার সঙ্গে ব'লল না বা একবারও আমার দিকে ফিরেও চাইল না।

বাসায় এসে আসনপিড়ি হয়ে মুখখানাকে হাঁড়ির মতন করে ব'সে রইল এক ঠাঁয়, আমি প্রমাদ গণলুম।

সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা! বন্ধুর মুখ যত ফুল্‌তে লাগল, আমার মুখ তত চুপ্‌সে যেতে লাগল। এ যেন খাঁড়ার নীচে ব'সে আসন্ন মৃত্যুর জন্য দুরু দুরু অপেক্ষা করা। পড়বি তো পড় না

বাপু—ঝপ্ ক'রে ঘাড়ের উপর, ঘপ্ করে মুণ্ডুটা কেটে যা হোক্ একটা এদিক্ ওদিক্ হ'য়ে যাক্। এ ভাবে দগ্ধে মারার মানেটা কি ?

নাঃ, আর ব'সে থাকা যায় না। কিছু একটা বলাতেই হবে। অতএব বন্ধুর মুখ খোলাবার জন্যে আমিই মুখ খুললুম। টোকা মেরে বুঝ্‌তে চাইলুম, হাঁড়ি-মুখের ভেতর কি পরিমাণ আগুন ভর্তি আছে।

বুকের ঢিপ্‌ঢিপানিটা ঢেকে রেখে, মুখে একফালি হাসির রেখা টেনে ব'ললুম—ভোলানাথবাবুর বাড়ী কাল আর আমি যেতে পারব না, আমার একটু কাজ আছে—

আঙ্গুলের ফাঁকে দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট্‌টাতে ফুঁৎ ক'রে এক দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়াটা শূন্যের দিকে ছাড়তে ছাড়তে বন্ধুটি সেই হাঁড়ি-মুখ থেকে ব'ল্‌লে—সেখানে আর যেতে হবে না, যাওয়া হবে না, যাওয়া চল্‌তে পারে না।

বুকের ঢিপ্‌ঢিপানিটা যেন হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল।

ফ্যাকাসে মুখে ব'ললুম—কেন, কি হ'ল ?

বন্ধুটি ঠিক্ তেমনি ভাবেই ব'ল্‌লে—সে পথ তুই বন্ধ করেছিস, তুই পদ্মবনে মত্ত হস্তী।

আমি ব'ললুম—আহা-হা ! উনি—কত লোককেই তো—

বাধা দিয়ে বন্ধু ব'ললে—দেন বলেই উনি মহৎ, উনি উদার। আর অমনি সেই উদারতার সুযোগ নিয়ে ব'সবি ? নীচ স্বার্থ-পরতারও একটা সীমা থাকা উচিত ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

বলে হাতের সিগারেটের টুক্‌রাটাকে এমন জোরে ছুড়ে মারল বাইরে দেয়ালে,—যে মনে হ'ল আমার উপর তার যত রাগ, ঘৃণা, বিরক্তি, দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে ছিট্‌কে এসে আমার চোখে মুখে লাগল।

আমি যে আমি, আমারও যেন কেমন অপমান বোধ হ'তে

লাগল, তারপর থেকে বেশ কয়েক দিন ভেবেছি—কি করা যায়। ভাবতে ভাবতেই টাকা পঁচিশটা খরচ ক'রে ফেললুম।

বন্ধু সেই থেকে আমার সঙ্গে ভাসুর-ভাদ্রবৌ সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। একদিন মরিয়া হ'য়ে ব'লে ফেললুম—না হয় অন্য কারুর কাছ থেকে পঁচিশটা টাকা ধার করে এনে দিয়ে আসিগে ভোলানাথ-বাবুকে। তার উত্তরে শক্তিশেল হান্‌ল আমার বুকে। বন্ধুটি ব'ল্‌লে—হুঁ, না হ'লে ষোলকলা পূর্ণ হবে কেন! নিজেদের অপমান তো করেছিসই, এবার তার অপমানটাই শুধু বাকী আছে!

কি মুস্কিল! তা হ'লে ক'রবাটা কি! এ যেন হাতের তীর, একবার হাত ফস্‌কে বেরিয়ে গেলে, আর ফিরিয়ে আনার উপায় নেই। দুত্তোর ছাই! অতএব কি ক'রব, ভেবে না পেয়ে, কিছুই করিনি।

বাড়ীটা লক্ষ্য ক'রে ভোলানাথবাবুর উদ্দেশ্যে একটা প্রণাম পাঠিয়ে দিয়ে পথ ধরলুম।

ডান দিকের একটি হোটেলের গাড়ী বারান্দার দিকে হঠাৎ নজর পড়তে থম্‌কে দাঁড়ালুম। দেখি, গাড়ী থেকে নামছেন নীলকণ্ঠবাবু। নেমে মোটরের দুয়ারটা খুলে ধরেছেন। পরমুহূর্তে আমার চেতনাকে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে হাওয়া গাড়ী থেকে হাওয়ায় ভর করে ভূমিষ্ঠ হলেন শ্রীমতী মলয়া বিশ্বাস।

যে হোটেলের সামনে ওদের অবতরণ হ'ল, সেই হোটেলের নাম দিয়েছিলুম—'পিচ্ছিল' হোটেল। আর ঐ মেয়েটির নাম দিয়েছিলুম—বিশ্বাস করুন—শ্রীমতী ময়লা বিশ্বাস।

শ্রীমতী মলয়া ওরফে ময়লা বিশ্বাসের যেমন মেঘের মত চুল, তেমনি কালবৈশাখীর কালো মেঘের মত গায়ের রং, আর ভেতরটা—? সেটা আপনারাই বিচার করবেন। শ্রীমতী বিশ্বাস

মুখে হাতে পায়ে, এক কথায়, বস্ত্রাবরণ থেকে মুক্ত বহিরঙ্গটুকু পুরোদস্তুর চুনকাম করেছেন। তাকে দেখে, এত দুঃখের ভেতরও খট্ খট্ ক'রে হেসে উঠ্‌লুম। পরমুহূর্তে নীলকণ্ঠবাবুর দিকে নজর পড়তেই, হাসিটা মাঝপথে আট্‌কে গেল। তার বদলে আমার চোখ দিয়ে এক ঝলক্ আগুন বের হ'য়ে গেল।

নীলকণ্ঠবাবু, অর্থাৎ মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মাইতি। মেদিনীপুরের একটি বেটে খাটো জমিদার। তাছাড়া আছে প্রচুর ধান জমি, কলকাতায় আছে চা'লের আড়ত। আছে চা'লের কল, বাস সার্ভিস, আর আছে মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স।

শক্ত সমর্থ সুপুরুষ ধনশালী নীলকণ্ঠবাবু দানে ধ্যানে, সুকর্মে মহাপুরুষের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেন। তাঁকে মহাপুরুষের পদে অধিষ্ঠিত করবার পিছনে আছে আর একটি পুরুষের সৎপ্রচেষ্টা—তিনি হচ্ছেন নীলকণ্ঠবাবুর বন্ধু নামে খ্যাত—কলকাতায় তাঁর চা'লের আড়তের ম্যানেজার বঙ্কুবাবু।

বঙ্কুবাবু থাকেন কলকাতায়, নীলকণ্ঠবাবু থাকেন কখনো দেশে, কখনো কলকাতায়, কখনো যত্র তত্র।

বঙ্কুবাবুর সঙ্গে বন্ধুটির আলাপ ছিল।

সেই বঙ্কুবাবুই একদিন আলাপ করিয়ে দিলেন বন্ধুকে নীলকণ্ঠ-বাবুব সঙ্গে।

নীলকণ্ঠবাবু সম্বন্ধে বঙ্কুবাবু যে সংবাদ ও তথ্য পরিবেশন করলেন তা হ'ল এই—দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্রে বরঞ্চ কালির আঁচড় আছে, কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর চরিত্র—! তা একেবারে পবিত্র, শুভ্র, ঝক্ ঝকে, চক্‌চকে, ধব্‌ধবে, একেবারে ষ্টীমলণ্ড্রীর ধোয়া।

নেশা বলতে কিছু নেই, পানটি পর্যন্ত খান না। এমন কি যেখানে তাঁর মত লোকের পক্ষে দু'চারটে বদ খেয়াল থাকা কিছু-মাত্র দোষের ত নয়ই, উপরন্তু সকলে তাঁকে মাথায় তুলে নাচত, সেখানে তিনি কি সরল অনাড়ম্বর জীবনই না যাপন করছেন!

একমাত্র নেশাই বলুন আর খেয়ালই বলুন—তা হ'ল পরের দুঃখ কষ্ট বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়া। সেখানে তিনি স্থির থাকতে পারেন না। এদিকে বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী অথচ প্রাণটি কত কোমল! এ যেন মেঘের মত। মেঘের মধ্যে বজ্রও যেমন আছে তেমনি আছে জল। আগুন আর জল পাশাপাশি।

নীলকণ্ঠবাবুর এমনি একটি পরহিত সাধন ক্ষেত্র হ'ল, বাগমারীর আটত্রিশ নম্বর বস্তীর একটি ছোট্ট অপরিসর ঘর।

ঘরটিতে থাকেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত এক উদ্বাস্তু পরিবার। সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আঘাতে ছিট্‌কে গেছে এমন কত পরিবার! ধ্বংস হয়ে গেছে কত সুখের সংসার! তারই একটি বলি রামগোপাল মুখুজ্জে। সমূলে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ধন বিসর্জন দিয়ে মান, প্রাণ আর জন নিয়ে সপরিবারে মুখুজ্জে মশাই এলেন পশ্চিমবঙ্গে। এসে উঠলেন জীর্ণ পরিত্যক্ত একটি বস্তী-ঘরে। কিন্তু এলে কি হবে—কথায়ই বলে—তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে। মুখুজ্জে মশাই এখানে এসে দারিদ্র্যের সঙ্গে যখন প্রাণপণে লড়াই করছিলেন তখন অজ্ঞাতসারে তাকে আক্রমণ করে বসল যক্ষ্মা রোগ। সে আক্রমণ রোধ করবার মত সঙ্গতি ছিল না মুখুজ্জে মশাইর। অতএব কাবু হ'য়ে পড়তেই হ'ল, এবং একদিন যথারীতি স্ত্রী আর একমাত্র বয়স্থা মেয়ের মান, ভগবানের জিম্মায় রেখে নিজে প্রাণটি নিয়ে ভবনদী পার হ'য়ে গেলেন।

এমনি একটি হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থায়, মুখুজ্জে মশাইর বিধবা স্ত্রী এসে ধরলেন গ্রামসম্পর্কে ভাসুরপো বঙ্কুবাবুকে—কোনো ক্যাম্পে যদি তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন এই আশায়। বঙ্কুবাবু আশা দিলেন যথেষ্ট, তার উপরও ভরসা দিলেন প্রচুর। তাদের এ বিপদে সাহায্য করা তো তার পবিত্র কর্তব্য। অতএব তার পর দিনই বিপদ-তারণ দীনদয়াল নীলকণ্ঠবাবুর সেখানে

আবির্ভাব। পরহিতে নিবেদিতপ্রাণ নীলকণ্ঠবাবুর অন্তর কেঁদে উঠল।

অতএব যত না মুখুজ্জে মশাইর স্ত্রী চোখের জল ফেললেন তার চেয়ে অন্ততঃ এক আউন্স বেশী ফেললেন নীলকণ্ঠবাবু।

চোখের জল মুছে এবং মুখুজ্জে মশাইর স্ত্রীর চোখের জল শুকাবার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন—বঙ্কুর আপনি কাকীমা হন। আমাকেও আপনি তার মতই আপন ভাববেন। আমার মা নেই। আপনাকে পেয়ে আমি যেন সেই অভাবটা ভুলতে পারি।

সর্বহারা পরিবারের হারানো সবকিছুর কিছুটা পূরণ করতে চাইলেন নীলকণ্ঠবাবু।

মেয়েটির নাম গৌরী। গৌরীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—ভয় কি দিদি, আমিই তো আছি।

অভয় পেয়ে গৌরীর ভয় বাড়ল কি কমল, তা তার মুখ দেখে অবশ্য বোঝা গেল না।

একদিন বঙ্কুবাবুই এসে বন্ধুকে প্রস্তাব দিলেন, চলুন, আপনার সঙ্গে একজন মহৎ লোকের পরিচয় করিয়ে দিই।

তারপরই নীলকণ্ঠবাবুর পরিচয়ের গৌরচন্দ্রিকা শেষ করে বঙ্কুবাবু হেসে বললেন—চলুন মশাই—চলুন। একসঙ্গে পঞ্চাশ হাজারের কেস্ করতে পারাটাও অসম্ভব নয়।

বন্ধুটি ইনস্যুরেন্সের দালাল। বঙ্কুবাবু সেই ইঙ্গিতই দিলেন। আর ইনস্যুরেন্সের দালালের কাছে—এর চেয়ে সুখবর আর কিছুই হতে পারে না। বন্ধুটি চল্‌ল নীলকণ্ঠ সন্দর্শনে। সঙ্গ নিলুম আমি। পরিচয়ের ঘটনাস্থল বাগমারীর আটত্রিশ নম্বর বস্তীর সেই ছোট্ট ঘরখানা।

পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে নীলকণ্ঠবাবু ভাবে গদ্‌গদ হয়ে বন্ধুকে ওঁকারের মত জড়িয়ে ধরলেন এবং এইরকম একজন দেশকর্মীর

সঙ্গে তাঁর পরিচয় হওয়াতে উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে তিনি প্রথম আলাপেই বন্ধুকে 'তুমি' সম্বোধন করে একেবারে আপনজন করে নিলেন।

আর আমাকে? 'তুমি' বা 'তুই' বলা দূরে থাক্, ফিরেও তাকালেন না। তা না তাকালেও তেমন ক্ষতি নেই। বন্ধু প্রসাদ পেলে তার ছিটে ফোঁটা আমার কপালে এসে জুটবেই। কারণ গাছের যেমন শিকড়, গরুর যেমন লেজ, বন্ধুটির আমি তেমনি পশ্চাৎরক্ষী। অতএব বন্ধুর মাথায় কিছু বর্ষিত হলে, তার কিছু অংশ লেজ বেয়ে যে আসবেই এ একেবারে অবধারিত। কিন্তু তখন কি জানতুম, এই আলাপের জন্যই একদিন পা ছড়িয়ে বিলাপ করতে বসতে হবে!

যাই হোক্, বন্ধুটির হাব ভাব দেখে মনে হ'ল, সে মহাখুশি।

বন্ধুর অনেক দোষের মধ্যে এই আর একটি দোষ। সে কারুকেই অবিশ্বাস করতে পারত না। তার মতে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। কিন্তু আমার মতটা পুরোপুরি উল্টো। আমার মতে অবিশ্বাস করে বরঞ্চ একজন ভাল লোককে ভুল বুঝব, কিন্তু বিশ্বাস করে পরে পস্তাব না। কারণ একবার যাকে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা যায়, তার কাছ থেকে সামান্যতম অবিশ্বাসের আঘাত পেলেও—একটা রাজ্য হারাবার ব্যথা অনুভব করতে হয়।

কিন্তু আমার মতামতের ধার বন্ধুটি কোনোদিনই ধারেনি। অতএব আমিও তাকে ধার দেবার চেষ্টা করিনি।

বন্ধুটি এখন নিয়মিত ভক্তের খাতায় নাম লেখাল এবং নীলকণ্ঠ-বাবুর দর্শন আশায় মাঝে মাঝেই আটত্রিশ নম্বর বস্তীতে গমনাগমন করতে লাগল।

আমি অবশ্য আর ওধার মাড়াইনি। বুদ্ধি আমার যত কমই থাক, এটা বুঝেছিলুম—আমি সেখানে একেবারেই অবাঞ্ছিত।

একদিন বন্ধুটি ভক্তিভরাট গলায় বললে—ছাখ, ভোলানাথবাবুর

পর, আর একটিমাত্র লোকের দেখা পেলুম, যাকে সত্যই শ্রদ্ধা করা যায়। বলে চুপ করে গেল।

আমি বুঝলুম কার কথা সে বলছে। কিন্তু প্রকাশ করলুম না। কারণ বন্ধুর এই আত্মসমাহিত ভাব উপস্থিত হলেই, তার প্যাকেট থেকে আমার সিগারেট আত্মসাৎ করবার সুযোগ উপস্থিত হ'ত। তাই নীরবে একটি সিগারেট ধরালুম।

বন্ধুটি বললে—বলতে পারিস, কে দেয় এ বাজারে এক কথায় এক অনাথ পরিবারকে তিনশ টাকা দান করে?

আমি চোখ বুজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললুম—একমাত্র নীলকণ্ঠবাবু।

বন্ধুটি আবেগের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ তিনিই তো। শুধু কি তাই, যতদিন না মেয়েটিব বিয়ে হচ্ছে ততদিন মাসিক চল্লিশ টাকা করে ভাতার ব্যবস্থা পর্যন্ত।

এইটুকু বলেই বন্ধুটি আমার অমনোযোগ লক্ষ্য করে বললে—বুঝতে পেরেছিস তো, কাদের কথা বলছি?

আমি বললুম—পেরেছি। সেই আটত্রিশ নম্বর বস্তীর—

বন্ধুটি বললে—হ্যাঁ-হ্যাঁ।

আমি বললুম—সেদিন যে গেলুম, মেয়েটিকে তো দেখলুম না।

বন্ধুটি বললে—বোধ হয় কোন কাজে ব্যস্ত ছিল। তাছাড়া প্রথম দিনই আমাদের সামনে আসতে সঙ্কোচও বোধ করতে পারে।

আমি বললুম—আচ্ছা মেয়েটির বয়স?

বন্ধুটি বললে—এই আঠার উনিশ হবে।

আমি সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললুম—হুঁ।

বন্ধু আমার দিকে চাইতেই আমি বললুম—আমি ভাবছি মেয়েটির মায়ের কথা। একটু থেমে আবার বললুম—এমত অবস্থায় মেয়েটির বিয়ের কথা মায়ের মুখে আনাও উচিত নয়।

বন্ধুটি বললে—কেন? বলে আমার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চাইল।

আমি বললুম—তাহলেই তো নীলকণ্ঠবাবুর চল্লিশ টাকা ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে। তখন মায়ের অবস্থাটা কি হবে ?

বন্ধুটি স্বাভাবিকভাবে বললে—এতদূর যিনি করতে পেরেছেন তিনি একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করে দেবেন।

আমি বললুম—একটা কিছু ব্যবস্থা হলেই হয়।

বন্ধুটি বললে—তোর কি এতে সন্দেহ আছে নাকি ?

আমি জিভ কেটে বললুম—রাম বলো !

বন্ধুটি বললে—জানিস, এইরকম অনেক অনাথ পরিবারকেই তিনি নীরবে সাহায্য করে থাকেন।

ইত্যবসরে আমি আর একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে বললুম—সাধু, সাধু !

বন্ধুটি বললে—সত্যিই তিনি শ্রদ্ধার পাত্র।

আমি বললুম—এমনভাবে বারে বারে কথাটা বলছিস, যেন আমার তাতে সন্দেহ আছে।

বন্ধুটি বললে—আমাকে তিনি খুবই পছন্দ করেন। কিন্তু তোকে—

আমি বললুম—দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। তা না দেখারই কথা। না হলে বুঝিস্ এমন মহৎ লোকের কাছে দু'দশ টাকা ধার না চেয়ে ছাড়তুম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখেই বুঝেছিলেন, আমি একটি অকর্মণ্য, অপদার্থ।

তার কয়েক মাস বাদে একদিন সন্ধ্যার পর বন্ধু বাসায় এসে ধপ্ করে বসে পড়ল। আমি আড় চোখে চেয়ে বললুম—কি হল ?

বন্ধুটি বললে—সর্বনাশ হয়েছে।

আমি ঘুরে বসে বললুম—কি ব্যাপার ?

বন্ধুটি বললে—ওরা যেন কোথায় চলে গেছে।

আমি বললুম—কারা ?

বন্ধুটি বললে—বল্ দেখি এখন কি করি ? নীলকণ্ঠবাবু, এবার

যাবার সময় আমাকে বার বার করে বলে গিয়েছিলেন, যাতে গৌরীদের আমি দেখাশোনা করি। তা মাত্র এই ক'দিন যেতে পারিনি, এরই মধ্যে যে তাদের কি হল কে জানে? বল্ দেখি এখন নীলকণ্ঠবাবুকে কি বলি? বাসার আশেপাশে খোঁজ নিয়েছি, তারাও ঠিক আমার মতই অবাক হয়ে গেছে! কি যে করি বল্ না!

আমি বললুম—বলছি, আগে একটি সিগারেট বার কর।

বলবার এবং চাইবার এ একটা মস্ত সুযোগ।

বন্ধুটি নীরবে একটি সিগারেট দিল। আমি সেটাকে দেশলাইর উপর টোকা মারতে মারতে বললুম—তাজ্জব কি বাত্। তুমি আমার কাছে পরামর্শ চাইছ! আচ্ছা! বলে সিগারেটটা ধরালুম।

চোখটি বুজে একটা সুখটান দিয়ে বললুম—কিন্তু তুমি ত আমাকে অঙ্কশাস্ত্রের শূন্য বলেই মনে কর। যখন তোমার ডাইনে বসি, তখনই শুধু আমার মূল্য। বাঁয়ে গেলেই মূল্যহীন। পরিচয়টা পর্যন্ত ভুলে যেতে চাও। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আমাদের গলায় হাত বুলিয়ে কাজ গুছিয়ে নিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও। কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালেই পাঁজি। এটাই তোমাদের মূল নীতি। যে বলদটা সারাজীবন গলদঘর্ম হয়ে খেটে লাঙ্গল টেনে তোমার খোরাক যোগাড় করল, বুড়ো হলেই তাকে কসাইর কাছে বিক্রী করে দাও। যে বুকের রক্ত ঢেলে শক্ত করে গড়ল তোমার ইমারত, তোমার বাদসাহী তক্ত, পেটের রুটী চাইলে তাকেই চড়াও শূলে। শ্রমিক না হলে তোমার চলে না, কিন্তু শ্রমের মর্যাদা দিতে তোমরা নারাজ। তোমরা হলে আকের কল। আক থেকে রসটুকু নিঃশেষে নিঙড়ে নিয়ে ছোবড়া দিয়ে সেই রসই জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী কর!

এই পর্যন্ত বলে আমি বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখি, সেও আমার দিকে চেয়ে আছে। এতে আমার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। কারণ এতদিন ও-ই ছিল বক্তা আর আমি ছিলুম শ্রোতা। অবশ্য

কতকটা বাধ্য হয়েই। অতএব সুযোগ যখন পেয়েছি তখন প্রাণভরে শুনিয়েই দিই। আমি চোখ বুজে আবার আরম্ভ করলুম। বললুম—তোমাদের কথা আর কত বলব। তোমরা দেশের লোককে কাঙাল বানিয়ে কোনো এক বিশেষ দিনে কাঙালী ভোজন করিয়ে পূণ্য অর্জনের নামে নিজের ঐশ্বর্যের দেমাক্ দেখাও। কিন্তু এই প্রগতির যুগে 'ধনী গরীব' এই কথাটাই যে কোনো দেশের পক্ষে একটা গভীর কলঙ্কের বিষয়।

তারপর আমি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দৃঢ়স্বরে বললুম—কিন্তু সাবধান! আমরা আর ঘুমিয়ে নেই। আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি—এই অসাম্যের অভিশাপ। দুনিয়া থেকে 'ধনী গরীব' কথাটা আমরা মুছে ফেলব। সাবধান—আমরা আজ জেগেছি।

এতক্ষণ চোখ বন্ধ করেই ছিলুম। চোখ খুলে আমরা যে জেগেছি তার প্রমাণ দিতে গিয়ে দেখি, বন্ধুটি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। বুঝলুম, বন্ধুর আর আমার পরামর্শে প্রয়োজন নেই। আমিও তাকে পরামর্শ দিয়ে বিব্রত না ক'রে, কম্বলখানা বিছিয়ে লম্বা হ'য়ে পড়লুম। খানিক বাদে হো হো ক'রে হেসে উঠলুম। কারণ এতক্ষণ যে পাগলের মত এই অসংলগ্ন কথাগুলো আওড়ালুম, এগুলো বিভিন্ন সময়ে বন্ধুই আমাকে বলেছিল। সেই কথাগুলোই তোড়ের মুখে, উল্টে বন্ধুকেই শুনিয়ে দিলুম।

পরের দিন সকাল। রোজই সকালে সজাগ হয়ে চোখ বুজে আমি এই প্রার্থনাটা করে নিই—'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন (বন্ধুর) মন যুগিয়ে চলি।' কারণ পেটের যোগানটা যে নিছক বন্ধুর উপরই নির্ভর করে কিনা!

সেদিনও প্রার্থনাটা সেরে চোখ খুলতেই—'প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ হেরিনু, দিন যাবে মোর ভাল।' জানালায় মুখ দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন রামভক্ত—হিন্দুস্থানী!

পরে জানলুম রামের অনুচর হলেও, বর্তমানে শিবের

চ্যালাগিরিতে বহাল আছে। লোকটি নীলকণ্ঠবাবুর দরোয়ান। আমার চোখে চোখ পড়তেই হাত যোড় করে বললে—রাম রাম।

রাষ্ট্রভাষী লোক, অতএব আমিও উঠে বসে রাষ্ট্র ভাষায় বললুম—কেয়া খবরা হ্যায়? আমি কিছুদিন থেকেই আমাদের গলির মুখের হিন্দুস্থানী পানওয়ালার কাছ থেকে অবৈতনিক ভাবে রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা করছিলুম। যখনই পান কিনতে যাই তখনই দু চারটা পাঠ শিক্ষা করে আসি। এবং প্রাথমিক পর্ব প্রায় শেষ করে এনেছি, এখন তুলসীদাসের রামায়ণখানা পড়তে পারলেই সাহিত্য পাঠ সাঙ্গ হয়।

কিন্তু আমার ভাষণ শুনে বোধহয় লোকটি ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কারণ এইভাবে যদি রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্র হতে থাকে, তবে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে স্ব রাষ্ট্রের মধ্যেই একটা হুলুস্থুল বেঁধে যাবে! সেই কারণে অথবা আমাকে স্রেফ ডাউন দেবার জন্যেই বোধহয় বাংলা ভাষা শিক্ষার একটা মহড়া দেখিয়ে বললে—আপনা লোকের একটো চিঠ্ঠি আছে। বলে চিঠিখানা জানালা দিয়ে ফেলে দিল আমার কাছে।

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, আমার যারা আপন লোক এ দুনিয়ায় আছে, তারা যে আমাকে একখানা চিঠি দিয়েও ডেকে জিজ্ঞেস করবে না—এ একেবারে অবধারিত।

চিঠিখানার ঠিকানার উপর চোখ বুলিয়ে দেখলুম আমার অনুমান অভ্রান্ত। ফিরে দেখি বন্ধুটি একটানা ঘুমন্ত নিঃশ্বাস ফেলছে। আমি চিঠিখানা তার গায়ের উপর ছুড়ে দিয়ে বললুম—এই নাও তোমার আপনা লোকের চিঠ্ঠি। চিঠিখানা গায়ে পড়তেই ধড়মড় করে উঠে বসে চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করল। পড়তে পড়তে দেখলুম বন্ধুর মুখের উপর দিয়ে দ্রুত কয়েকটা রেখার পরিবর্তন হ'য়ে গেল। তা দুশ্চিন্তার, আশঙ্কার এবং অসহায়তার। অবাক হলুম, ঝুঁকে পড়ে বললুম—কি ব্যাপার?

আমাকে কিছু না বলে সে উঠে গিয়ে হিন্দুস্থানীটিকে বললে—আচ্ছা, তোম্ যাও।

লোকটি চলে গেল।

বন্ধুটি বিছানার উপর ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে খানিক বসে রইল। তারপর মাথা উঠিয়ে ফ্যাকাসে মুখে বললে—যা আশঙ্কা করেছিলুম তাই হয়েছে।

আমি গম্ভীর ভাবে বললুম—ব্যাপারটা না জানা পর্যন্ত, আমার পক্ষে কোনোরূপ সহানুভূতি দেখানো সম্ভব নয়। অথচ তোমাকে এমন অসহায় দেখাচ্ছে যে, অবিলম্বে আমার একটা কিছু করা বা বলা উচিত। অতএব ঘটনাটা কি, খুলেই বল।

বন্ধুটি খানিকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে বললে—পড়ে ছ্যাখ। আমি ব্যগ্র হয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলুম, সাগ্রহে চিঠিখানা পড়লুম। একবার নয়, দু'বার, তিনবার করে পড়লুম। কিন্তু ফাঁসীর হুকুম তার ভেতর কোথাও খুঁজে পেলুম না। আমি শান্ত ভাবে বললুম—এতে হয়েছে কি? নীলকণ্ঠবাবু তোকে দেখা করতে বলেছেন, দেখা করবি। তাতে তোর হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হবার কি হল?

বন্ধুটি বললে—তোর ঘটে যদি অত বুদ্ধিই থাকত, তবে তো আর দুঃখেরই কিছু ছিল না।

আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে বললুম—ভগবানকে ধন্যবাদ, যে আমাকে বুদ্ধি পদার্থটি দেননি। তাহলেই যত রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে এই ছোট্ট মাথাটার ভেতর ভীড় জমাত। জানিস তো যার মাথা নেই তার মাথা ব্যথাও নেই। ছ্যাখ, অজ্ঞানতার একটা ভাল দিকও আছে। দেখিস না, অজ্ঞান করে কত বড় বড় কঠিন অস্ত্রোপচারগুলো নির্বিঘ্নে করে ফেলে। সে কথা যাক্—এখন খুলেই বল্ না—চিঠিখানার এই লাইন ক'টার ভেতরে, কোথায় তোর মৃত্যুবাণ আত্মগোপন করে আছে।

বন্ধুটি বিরক্তির সঙ্গে বললে—ছ্যাখ, তুই বড় ধান ভান্‌তে শিবের গীত সুরু করিস! এখন শোন, দেখা হ'লেই তো নীলকণ্ঠবাবু গৌরী ওদের কথা জিজ্ঞেস করবেন, তখন কি বলব?

আমি বললুম—বলবি, বিনা বিজ্ঞাপনে তারা যেন কোথায় চলে গেছে।

বন্ধুটি বললে—বল্‌লেই হ'ল! আমার উপর একটা দায়িত্ব—

আমি বাধা দিয়ে বললুম—তুই কি সেই বাড়ীর দরোয়ান নাকি যে চব্বিশ ঘণ্টা দুয়ারে খাড়া থেকে পাহারা দিবি? কার পেটে কখন কি বুদ্ধি উদ্‌গার দেবে, তুই তার কি খবর রাখিস্‌রে?

বন্ধুটি বললে—কথাটা যত সোজা করে বল্‌লি, তত সোজা নয়, একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তো?

আমি হাল ছেড়ে দিয়ে বললুম—রাজ্যের যত দায়িত্ব মাথায় চাপিয়ে, তুই যদি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়িস তো, আমি তার কি করতে পারি বল্‌?

বন্ধুটি বললে—তুই বুঝিস না, একজন নিঃস্বার্থভাবে দান করে একটা পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখলেন, আর আমি যে তাদের খোঁজ-খবরটুকু রাখব, তাও আমার দ্বারা হ'ল না! এটা যে আমার পক্ষে কত বড় লজ্জার বিষয় তা ব'লে বোঝাতে পারব না। যাক্‌, তুইও যাবি কিন্তু আমার সঙ্গে।

আমি অবাক হ'য়ে বললুম—আমি! বলিস কি?

বন্ধুটি বললে—হ্যাঁ।

আমি বললুম—কেন? তোর বডিগার্ড হ'য়ে না কি?

বন্ধুটি বলল—না—না এমনি। বাড়ীটা খুঁজে বের করতে হবে ত?

আমি বললুম—যাক্‌ বাঁচালি বাবা। আমি ত বাপু ভেবেছিলুম—ভয়েতে তোর আত্মারাম খাঁচা-ছাড়াই বুঝি হ'য়ে গেল! কি

জানি, নীলকণ্ঠবাবু যদি তোকে একটা চড় চাপড়ই মেরে বসেন! কিন্তু তুই কি আর তাঁর বাড়ীতে যাসনি কখনো?

বন্ধুটি বললে—না।

আমি বললুম—সে কিরে! তাহলে তোদের দেখাশোনা হ'ত কোথায়?

বন্ধুটি বললে—প্রায়ই সেই গৌরীদের বাড়ীতে, না হয় বঙ্কুবাবুর ওখানে। যাক্, সন্ধ্যার সময় বাসায় থাকিস কিন্তু।

সন্ধ্যার সময় দুজনে নীলকণ্ঠ আলয় সেই কৈলাস ধামের উদ্দেশে যাত্রা করলুম।

বক্ষ করে দুরু দুরু, মোদের যাত্রা হ'ল সুরু।

নীলকণ্ঠবাবুর আবাস স্থানটি দেখবার একটা কৌতূহল মনে মনে আমারও ছিল। এমন নির্বিকার পরমব্রহ্ম সদানন্দ মহাপুরুষের বাড়ী। আমার কল্পনায় সেটা সাধারণ বাড়ী নয়। মৃগচর্ম, কমণ্ডলু, চিম্‌টে, ত্রিশূল সম্বল লম্বোদর স্বামীর আশ্রম না হোক, অন্ততঃ একটা পবিত্রতার প্রতিমূর্তি তো নিশ্চয়ই।

যাক্, যথাসময়ে আমরা পাথুরিয়াঘাটার একটা সরু গলির ভেতর একখানা দোতলা বাড়ী আবিষ্কার করলুম। বন্ধুর পিছন পিছন গিয়ে দরোয়ান-নির্দিষ্ট বসবার ঘরে গিয়ে বসলুম। কিছু পরেই স্মিত মুখে নীলকণ্ঠবাবুর প্রবেশ। পিছনে পোঁ-ধরা বঙ্কুবাবু। কুশল প্রশ্ন বিনিময় অনুষ্ঠান শেষ হ'ল।

কিন্তু নীলকণ্ঠবাবুর দর্শনে বন্ধুটি যেমন ঘেমে উঠল, আমার দর্শনে তেমনি নীলকণ্ঠবাবু বিরক্ত হ'লেন। বন্ধুকে বললেন—আবার একেও এনেছ দেখছি।

আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলুম। কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম—আপনার সঙ্গলাভের লোভ যে কিছুতেই ছাড়তে পারলুম না!

নীলকণ্ঠবাবু ভস্মাচ্ছাদিত হাসি হেসে বললেন—তা বেশ করেছ, বস, বস।

তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন—হ্যাঁ, ওদের খবর কি? ওরা কেমন আছে?

বন্ধুটি অপরাধীর মত বললে—আমাকে ক্ষমা করুন নীলকণ্ঠবাবু। আমি এই ছ'মাস ধরে প্রায় রোজই একবার করে ওদের ওখানে গিয়েছি। কিন্তু মাত্র এই সাতদিন যেতে পারিনি। আর এরই মধ্যে যে ওরা কোথায় গেল, তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না।

নীলকণ্ঠবাবু গম্ভীর ভাবে চেয়ে রইলেন বন্ধুর দিকে। তারপর বললেন—সামান্য কাজটাও যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয়! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! যাক্ তোমাকে এখন একটা কাজের ভার দিচ্ছি—সেটা করতে হবে।

বন্ধুটি অধীর আগ্রহে বললে—বলুন, বলুন, আমি নিশ্চয়ই করব।

এমন ভাবে ব্যগ্রতা দেখাল, যেন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার একটা সুযোগ পেল।

নীলকণ্ঠবাবু কণ্ঠস্বরে যতদূর সম্ভব দৃঢ়তা মিশিয়ে বললেন—তোমার বিয়ে করতে হবে। আজই, এক্ষুণি।

এ আদেশ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত আমাদের মাথায় এসে পড়ল। বন্ধুতো লাফিয়ে উঠল, আমিও চমকালুম। চমকালুম, কারণ বন্ধুর বিয়ে মানেই আমার কপালে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘনিয়ে আসা।

বন্ধুটি বললে—সেকি! আমি! না না, অসম্ভব। আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের ভেতর আব একজনকে কিছুতেই জড়াতে পারব না।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন—একটা মেয়ের দায়িত্ব নিতে যারা ভয় পায় তাদের মত অপদার্থ এ পৃথিবীতে আর নেই! যাক সে কথা, তুমি এই মেয়েটিকে বিয়ে করে কন্যা দায় থেকে উদ্ধার কর। তোমার যত দায়, সে আমার, তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। এত কথা যে আমাকে ব'লতে হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।

আমি ভেবেছিলুম—আমার এক কথাই যথেষ্ট। তবু যখন বলতেই হল, তখন শুনে রাখ আমি সব দিক্ দিয়ে প্রস্তুত হয়েই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। মেয়েও এখানেই আছে, পুরুতও এনেছি। বলে হাঁক দিলেন—কই ঠাকুর মশাই ?

হাঁক দিতেই দরজার কাছে একজন গো-বেচারী গোছের ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়াল। সংক্ষেপে বললে—এজ্ঞে, লগ্ন উপস্থিত।

পরে অবশ্য জেনেছি ওটি নীলকণ্ঠবাবুরই ভাত-রাঁধা বামুন।

নীলকণ্ঠবাবু উঠলেন এবং আমার দিকে চেয়ে বললেন—তুমিও চল। কারণ তুমিই হচ্ছ এখন একমাত্র বরকর্তা।

বরকর্তা সাজবার লোভ আমার ছিল না। বরঞ্চ বরযাত্রী হবার লোভ ছিল। ঝরি নেই ঝক্কি নেই—শুধু ফোকটে বেশ পরিমাণ চর্ব্য-চোষ্য আপ্যায়ন লাভ। বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখি, তার মুখে যেন কে ছাই লেপে দিয়েছে !

বন্ধুটি আমার দিকে করুণ ভাবে চাইল। কিন্তু উঁহুঁ। আমি একেবারে নীরব রইলুম। কারণ এক্ষেত্রে নিষেধ করা বা সম্মতি দেওয়া মানেই সেই ঝক্কি পোয়ানো। অতএব নীলকণ্ঠবাবুর প্রতি বন্ধুর অচলা ভক্তিই জয়ী হল। অগত্যা বন্ধুটি উঠল এবং নীলকণ্ঠবাবুর পিছন পিছন রওনা হল।

আমিও উঠলুম এবং বরযাত্রীর ভূমিকা নেব কি বরকর্তা সাজব, তা চিন্তা করতে করতে, অগ্রসর হলুম। ক্রমে আমরা ছাদের উপর এসে উপস্থিত হলুম। সেখানে দেখি, একটা কোণের দিকে একটা মোমবাতি জ্বলছে, বুঝলুম সেটিই বিয়ের আসর। যাহোক্ একটা আসন পাতা ছিল। সামনে তার একটি মঙ্গলঘট। এ ছাড়া বিয়ের আসরে অন্য কোনো উপকরণ ছিল না। বন্ধুটিকে সেই আসনে বসিয়ে দেওয়া হল। পুরুত ঠাকুর অমনি ঝাঁ করে কয়েকটা সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে বললে—মেয়ে নিয়ে আসুন।

সবই যেন ভানুমতীর ভেল্কীর মত ঘটে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা একটি মেয়েকে ধরে সভাস্থলে নিয়ে এলেন।

আমার বন্ধু মেয়েটিকে দেখেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল, বললে—আরে! এ যে গৌরী! তোমরা এখানে?

পিছন থেকে জবাব দিলেন নীলকণ্ঠবাবু—হ্যাঁ, ওরা এখানে। আর এই গৌরীকেই তোমার বিয়ে করতে হবে।

গৌরীর দিকে চেয়ে আমি চম্‌কে উঠলুম! চেয়ে দেখি বন্ধুও গৌরীর আপাদমস্তক বারকয়েক দেখে, আসন থেকে নেমে দাঁড়াল।

নীলকণ্ঠবাবু বললেন—ওকি! নামলে যে!

বন্ধুটি দৃঢ় স্বরে বললে—না।

নীলকণ্ঠবাবু ধীর ভাবে বললেন—আমি সমস্ত আটঘাট বেঁধেই কাজ করে থাকি। নীচে যাবার গেট বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব তুমি ঐ আসনে গিয়ে বস।

বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখি তার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে!

নীলকণ্ঠবাবু স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললেন—এই আট ন'মাস ধরে তুমি ওদের বাড়ী যাতায়াত করছ। বুঝতেই তো পারছ, আজ যদি তুমি বিয়ে না কর, তাহলে তোমার নামে আমি কেস্ করব।

বন্ধুটি গর্জন করে উঠল—স্কাউণ্ড্রেল! তুমি করবে পাপ, আর তার ফল ভোগ করব আমি? না—কক্ষণো না!

নীলকণ্ঠবাবু তার বুক লক্ষ্য করে রিভলবার তাগ্ করে আদেশের সুরে বললেন—আসনে গিয়ে বস।

বন্ধুটি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—রিভলবারের ভয় দেখাচ্ছেন নীলকণ্ঠবাবু! ওর চিহ্ন খুঁজলে আমার শরীরে অনেক দেখতে পাবেন। আপনি শুনে রাখুন, কোনো শক্তিই আদর্শের বিরুদ্ধে আমার মাথা নোয়াতে পারবে না। সয়তান! আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়ে দেব!

বলে নীলকণ্ঠবাবুর চোয়ালের উপর এক প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বসল।

আমি এতক্ষণ যেন জড়পিণ্ডের মত হয়ে গিয়েছিলুম। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে এল। আমি চট্ করে যুধ্যমান ওদের দুজনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং নীলকণ্ঠবাবুর দিকে চেয়ে বললুম—আপনি একটা মস্ত বড় ভুল করেছেন। আমি ওকে যতদূর জানি, তাতে ঐ রিভলবার বা রাইফেল দেখিয়ে কিচ্ছু করাতে পারবেন না। কারণ ও একেবারে বৃটিশ মেশিনগান ফেরত। আর দেখছেন তো ও কেমন রুচিবাদী। অতএব ওকে নিয়ে আর সময় নষ্ট না করে, আমিই আপনাদের সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। আমিই এই মেয়েটির ভার নিলুম।

নীলকণ্ঠবাবু আমার দিকে কুটিল ভাবে চেয়ে বললেন—তুমি?

আমি বললুম—হ্যাঁ, আমার খাওয়া পরা থাকা জীবন ধারণের মধ্যে রুচির কোনো বালাই নেই, নীতির কোনো নামগন্ধ নেই। অতএব আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি, এ যাতে সমাজে সসম্মানে স্ত্রীর অধিকার পায়, তার সুব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব।

নীলকণ্ঠবাবু আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন—বেশ, তুমিই গিয়ে বস ওই আসনে।

আমি হাতযোড় করে বললুম—ঐটি শুধু মাফ্ চাচ্ছি। আজকে নয়, কাল ঠিক এমনি সময়ে আমি আসব। আপনারা প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। এই একটা দিনের জন্যে যদি চান তো—ষ্ট্যাম্প্ কাগজে সই করে দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আজকে কিছুতেই নয়। কারণ আমি চাই—যথা নিয়মে বিয়ে করতে। তার ভেতর কোনো ফাঁক থাকবে না—ফাঁকি থাকবে না।

তারপর গৌরীর দিকে ফিরে বললুম—আপনি ঘাবড়াবেন না। এরা আপনাদের বহুদিনের পরিচিত। আমি নূতন। অপদার্থ বলেই আমাকে সকলে জানে, তাহলেও এ বিষয়ে আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

কিন্তু এত বড় একটা আশার বাণী শোনাবার পরও গৌরীর মুখের কোনো পরিবর্তন হ'ল না। সে যেমন কাঠের মত দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল।

আর তার মা? কখন যে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন—তা এই ডামাডোলের ভেতর কেউ লক্ষ্যই করেনি।

নীলকণ্ঠবাবু অতি বিচক্ষণ লোক। সত্যই তিনি আটঘাট বেঁধে কাজ করে থাকেন। ঠিক ঐ একই কারণে বন্ধুটিকে গৌরীদের বাড়ী খবরদারীর কাজে নিযুক্ত করে নিজে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন।

বন্ধুবাবুকে ইঙ্গিত করতেই তিনি নীচে গিয়ে একখানা ষ্ট্যাম্প্ কাগজ নিয়ে এলেন। নীলকণ্ঠবাবু সেখানা হাতে নিয়ে বললেন—আচ্ছা, তোমার কথা মতই কাজ হোক। এখানে সই কর।

আমি দেশের এবং এখানের ঠিকানা লিখে আমার নামটা পুরো সই করে দিলুম।

বাসায় ফিরবার পথেই বুঝেছিলুম—বন্ধুর আজ উপবাস। অতএব বাসায় এসে আমি পেট পুরে খেলুম। বন্ধুটি এক ঠাঁয় বিছানার উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে রইল। আমি সতৃষ্ণ নয়নে তার সিগারেট প্যাকেটটার দিকে তাকাতে লাগলুম। কিন্তু কোনো আশা দেখলুম না। বন্ধুটির ভাবোচ্ছ্বাস উপস্থিত হলে আবেগের প্রাবল্যে সিগারেট প্যাকেটটি পাশে রেখে দেয়। কিন্তু কোনো গভীর মনঃকষ্টের কারণ ঘটলেই যেমন উপোস দিয়ে চিত্তশুদ্ধি করে নেয়, তেমনি যোগাসনের মত বসে হাতের মুঠোর ভেতর সিগারেট প্যাকেটটা শক্ত করে ধরে রাখে এবং একটার পর একটা ধরাতে থাকে। অতএব নিরাশ হয়ে পকেট খুঁজে একটা বিড়ি বের করে ধরালুম। বন্ধুটি খানিক বাদে গম্ভীরভাবে বললে—স্কাউণ্ড্রেল!

বন্ধুর মুখ ফুটেছে দেখে সাহস পেয়ে বললুম—আচ্ছা একটা কথা বলবি?

বন্ধুটি বললে—কি ?

আমি বললুম—তোর সামনে কি মেয়েটা সব সময় বের হত ?

বন্ধুটি বললে—আগে হত, কিন্তু এই গত তিনচার মাস ধরে আমার সামনে একবারও আসেনি। আমি ওর মায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলেই চলে আসতুম। জিজ্ঞেস করলে ওর মা বলতেন ওর নাকি কি অসুখ করেছে। দু'একদিন ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখেছি, ও একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমি ভেবেছি মেয়েদের ত কতরকমই অসুখ বিসুখ আছে, এও হয়তো তাই! কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার আমার কল্পনায়ই আসেনি।

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললুম—হুঁ।

বন্ধুটি বললে—কিন্তু একি করলি তুই? কথা দিয়ে এলি কেন? আর শুধু কথা দেওয়া তো নয়। একেবারে সই করা পর্যন্ত!

আমি বললুম—যেই কথা সেই কাজ, হাতে নাতে প্রমাণ করে দেব, দেখবি।

বন্ধুটি বললে—কি করবি ?

আমি বললুম—বিয়ে করব।

বন্ধুটি বললে—তুই ?

আমি বললুম—তার মানে ? আমার বিয়েটা কি তবে ও-পাড়ার জগাই এসে করে দেবে নাকি ?

বন্ধুটি বললে—বলিস্ কি ?

আমি বললুম—কি করব বল্ ? তোর আর নীলকণ্ঠবাবুর মধ্যে লেগে গেল নীতির লড়াই। আর মেয়েটা সেই পাঁকের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। তখন বাধ্য হয়েই আমাকে সেই পঙ্ক উদ্ধারে নামতে হল।

বন্ধুটি বললে—কিন্তু তুই বিয়ে করলে তো ও এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

আমি বললুম—ছাখ, ও মরবেই। আমি বিয়ে করলেও মরবে

না করলেও মরবে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে ওর মৃত্যু হয়েছে বহুদিন আগেই। আমি শুধু ওর মরণটাকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিতে চাই। সমাজ জানবে, জগৎ জানবে, অমুকের গর্ভবতী স্ত্রী অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছে!

বন্ধুটি বল্‌লে—ভ্যাখ্, তুই যতখানি এগিয়েছিস্, আমিও তা পারতুম,—যদি মেয়েটি বা তার মা এসে আমাকে ব'লতেন।

আমি বাধা দিয়ে বললুম—সে আমি জানি এবং বিশ্বাস করি বন্ধু।

বন্ধুটি বললে—কিন্তু রিভল্‌বার দেখিয়ে একটা 'ভিলেইন্' আমাকে বশীভূত করবে! আমার মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। অন্তরাত্মা সহসা যেন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগ বলতে লাগল—একটা মেয়ের জীবন তুমি ইচ্ছে করলেই বাঁচাতে পার। বাঁচানো উচিত। কিন্তু আর ভাগ তারস্বরে চেঁচিয়ে বলে উঠল—কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে নয়। যাক্ অমন দু'দশটা জীবন নষ্ট হয়ে। তথাপি এই অন্যায়ের উদ্ধত মাথাটা আজ পায়ের তলায় ভেঙ্গে পিষে দিতে পারলে, ওরকম আরও শত শত মেয়ের জীবন রক্ষা পাবে। অতএব তুমি মাথা খাড়া করে দাঁড়াও ওই অন্যায়ের টুটিটা কামড়ে ধরবার জন্যে। আমি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলুম।

পরদিন উপোস থেকে যথারীতি শুভ-বিবাহের জন্যে প্রস্তুত হলুম। সন্ধ্যার সময় সাজ পোষাক পরে বন্ধুকে বললুম—এ বিয়ের বর ও যাত্রী দুটোই আমি। এ বিয়েতে বাজবে না মঙ্গল শাঁখ, ঝাঁক বেঁধে পুরললনারা উলু দিয়ে করবে না কোনো মাঙ্গলিক আচরণ, শুধু এই অশুভ পরিবেশের মধ্য থেকে যেন উদ্ধার করে আনতে পারি সেই মুমূর্ষু দেহটাকে ; এই শুভ কামনাটাই অন্ততঃ ভগবানের কাছে করিস্। এই বলে আমি বেরিয়ে গেলুম। বন্ধুটি একটা কথাও বলল না। যেমন চুপ করে ছিল তেমনিই রইল।

যাই হোক গোধূলি-লগ্নে নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হলুম। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে পারলুম না। দরোয়ান আমার

হাতে একখানা চিঠি দিয়ে যা বললে তার ভাবার্থগুলো আমার মগজে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখটা অন্ধকার হয়ে এল। পিছন ফিরে দেখলুম, যে পথ দিয়ে এসেছি সেই পথটা যেন অন্ধকারে লেপ্‌টে গেছে। ঝিম্ মেরে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত পথ ধরলুম। হাঁটতে হাঁটতে কখন যে গঙ্গার ধারে এসে পড়েছি খেয়াল নেই। খেয়াল হল হাওড়ার পুলটা দেখে। পুলটার ধার ঘেঁষে একদম গঙ্গার গায় গিয়ে দাঁড়ালুম। আজ্‌লা ভরে খানিকটা জল চোখে মুখে ঘাড়ে দিলুম। বেশ কয়েকবার পায়চারী করলুম। তারপর একটা জায়গায় ধপ্ করে বসে পড়লুম।

সামনে গঙ্গা, পিছনে গাড়ী ঘোড়ার শব্দ-বিক্ষুব্ধ কর্মব্যস্ত কলকাতা সহর। তরঙ্গাকুল গঙ্গার বক্ষে চলেছে নৌকা, লঞ্চ, ষ্টীমার, চলেছে জাহাজ। নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখলুম—একই আলোড়ন; শুনতে পেলুম যেন একই শব্দ।

বেশ কিছু রাত করে বাসায় ফিরে এলুম। এসে বিছানার উপর যুৎ হয়ে বসে চিঠিখানা পড়লুম।

বন্ধুটিও দেখি আমার জন্যে উদ্‌গ্রীব অপেক্ষা করে জেগে বসে আছে। আমার ভাবগতি দেখে উৎকণ্ঠার সঙ্গে বল্‌লে—কিরে, বিয়ে হ'ল? আমি বল্‌লুম—হুঁ। তবে আমার সঙ্গে নয়, কড়িকাঠের সঙ্গে।

বলে চিঠিখানা ছুড়ে দিলুম বন্ধুর দিকে।

বন্ধুটি পড়ল—

অপরিচিত বন্ধু—

> আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসে আপনি আপনার উদারতারই পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু সমস্যার তো এখানেই শেষ নয়, বাকী সারাটা জীবন ও আমাদের সন্তানদের জীবনের এক বিরাট ক্ষেত্র তার জন্যে পড়ে রয়েছে। অতএব সকল সমস্যার সমাধান আমিই করে দিয়ে গেলুম। আপনার মহত্ত্বকে ধন্যবাদ, আপনাকে জানাই অশেষ প্রণাম।—ইতি।
>
> গৌরী

বন্ধুটি পড়া শেষ করে মুখ তুলে ব'ল্লে—মানে ?

আমি ব'ললুম—মানেটা এমন কিছু জটিল নয়। কাল রাত প্রায় তিনটার সময় নীলকণ্ঠবাবু বাথ্‌রুমে যাবার পথে দেখেন মেয়েটি গলায় কাপড় বেঁধে কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুল্‌ছে।

বন্ধুটি কিছু না বলে মাথা নীচু করে রইল।

আমি ব'ললুম—মরলি তো মরলি, একটা দিন পরে মরলে কি তোর যম দুয়ারে কাঁটা পড়ত? যাহোক জীবনে যাওবা একটা 'সিভাল্‌রী' দেখাবার 'চান্স' পেলুম তো, মেয়েটা মরেই তার মাথাটা খেয়ে বসল। আমার যেমন বরাত। অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে, হুঁ!

বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে ব'ললুম—যাক্ এখন বুঝলি তো, এইসব তথাকথিত মুখোসধারী মহাপুরুষদের স্মিত হাসির আড়ালে সর্বদাই একটা লোলুপ জিহ্বা লক্‌লক্ করতে থাকে। সে জিহ্বা যেখানে যা কিছু সুন্দর দেখে, তাকেই ধরে গপ্ করে খেয়ে ফেলে। এদের পেশা—ঝোপ বুঝে কোপ মারা, নেশা—স্ত্রী দেহ, আশা—উন্মত্ত উপভোগ, বাসা—কুৎসিত নরকে। ইদম্ নীলকণ্ঠবাবুর চরিতম্ সমাপ্তম্!

ওই ফুটপাথে চেয়ে দেখি নীলকণ্ঠবাবু ততক্ষণে সেই আধো-আলো আধো-ছায়া নারীমূর্তিটিকে নিয়ে হোটেলের ভেতর অদৃশ্য হয়েছেন। আমি চেয়ে চেয়ে ভাবলুম—নীলকণ্ঠ নামের সার্থকতা সত্যই বজায় রেখেছেন। অমৃত গরল যিনি সমভাবে গ্রহণ করতে পারেন তিনিই তো নীলকণ্ঠ! সাবাস্!

আবার শুরু হল চলার পালা! কিন্তু পাশে ধপ্ করে শব্দ হ'তেই ফিরে দেখি, একটি লোক ফুটপাথের উপর সাষ্টাঙ্গে লম্বমান হয়ে পড়েছে। ধরে তুলতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে আনলুম। মুখ দিয়ে আমার আপনাআপনি বের হয়ে গেল—বেশ হয়েছে!

কারণ এই সেই লোকটি, যে নাকি একদিন কলা খেয়ে খোসাগুলো রাস্তায় ফেল্‌তে ফেল্‌তে যাচ্ছিল, এবং আমার বন্ধুটি সবিনয়ে একে নাগরিক জ্ঞান শেখাতে গিয়ে এর মুখ থেকে যা শুনল, তাতে বন্ধুর উর্ধ্বতন এবং অধস্তন চৌদ্দপুরুষ গড়্‌গড়্‌ করে উদ্ধার হয়ে গেল।

কদলী ভক্ষণকারীর যুক্তি ছিল এই—যেহেতু সে কারও বাবার পয়সায় কলা খাচ্ছে না বা খোসাও কারও বাবার রাস্তায় ফেলছে না, সেহেতু এ ব্যাপারে অপর লোকের নাক গলাতে যাওয়া মানেই সেই ধৃষ্টতার পরিচয়। অতএব সে ফুটপাথের উপর খোসা ফেলবে, ফেলবে, আলবৎ ফেলবে!

সেই লোকটাই যখন আজ কলার খোসায় পা পিছলে পপাত ফুটপাথের উপর হল, তখন তার নাক দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখেও বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে না হেসে থাকতে পারলুম না।

লোকটির দিকে আর একবার চেয়ে, হৃষ্ট মনে পা বাড়ালুম।

কিছু দূর যেতেই দেখি, আমাদের পাড়ার জগদীশবাবু, পেছনে সাঙ্গপাঙ্গর সুদীর্ঘ লেজ বহন করে বীরপদে আসছেন। মান্যবর জগদীশকুমার ভঞ্জ। ইনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের হর্তা-কর্তাদের মধ্যে একজন। মুখোমুখি হতেই আমি একমুখ হাসি নিয়ে নমস্কার করলুম। কিন্তু জগদীশবাবু দ্রুতবেগে ঘাড়টা ফিরিয়ে নিয়ে আমার মত লোকের সঙ্গে তার যে পরিচয় থাকতেই পারে না, এটা প্রমাণ করে দিলেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা অপাঙ্গে আমার দিকে চেয়ে একটু মুচ্‌কি হাসল। চোখে না দেখলেও অনুভব করলুম, আমার মুখের হাসিটা রং-চটা বাক্‌সের মত হয়ে গেছে।

অথচ এঁর ভোটের সময় আমি কত না মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি! এর আঙ্গুলের দাগ খুঁজলে, এখনও আমার পিঠে

ছু'চারটা পাওয়া যাবে। কারণ আমার একনিষ্ঠ কাজ দেখে হৃষ্ট হয়ে ইনি আমার পিঠের উপর এত চাপড় মেরেছিলেন যে, সেই ব্যথা সারতে আমাকে একটানা তিন দিন বরিক্ কম্প্রেস্ করতে হয়েছিল। কিন্তু আরও অন্ততঃ পাঁচটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। নূতন ইলেকসন্ না আসা পর্যন্ত এর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলুম—'যতদিন না জগদীশবাবুর নাকের ডগার উপর বামপন্থী প্রার্থীর পোষ্টার মারতে পারব, ততদিন—বলে থেমে গেলুম। কারণ হাতের বিড়িটি লক্ষ্য করে বলতে গিয়েছিলুম—'ততদিন আর বিড়ি খাব না'। কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি—এ প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারব না। তখন ভীষ্মের কথাটা মনে পড়ে গেল—তাই তাড়াতাড়ি পাদপূরণ করে বললুল—ততদিন আমি আর বিয়ে করব না। এই প্রতিজ্ঞাটা বজায় রাখতে আমার নিজের আর কোনো কস্রৎ করতে হবে না—কারণ বাংলা দেশে এমন কোনো বাপ জন্মান নি যিনি নাকি হাতে ধরে আমার হাতে তার মেয়েকে সঁপে দেবেন।

বন্ধুটি কিন্তু গোড়াতেই বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। সে বলেছিল— ছাখ্ এরা নেতা নয়, অভিনেতা। এদের অভিনয় এত নিখুঁত যে উঁচুদরের মঞ্চ-খ্যাত তারকারা পর্যন্ত এদের শিষ্য হবারও উপযুক্ত নয়। এদের মেক্ আপ্ নিখুঁত, বাচন ভঙ্গী নিখুঁত। চলন বলন— এমন কি হাসবার কায়দাটি পর্যন্ত আর্টিষ্টিক্। তাই এই সব প্রাসাদবাসীরা যখন সুদৃশ্য গাড়ী থেকে নেমে খদ্দরের নামাবলীর আড়ালে ভুঁড়ীটি ঢেকে বক্তৃতার মঞ্চে এসে দাঁড়ান, তখন সরল জনতার মধ্যে আহা-হা পড়ে যায়। যখন এরা বুভুক্ষু জনতার দুঃখে বিগলিত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেন—তখন জনতা আত্মহারা হয়ে মাথায় তুলে নাচতে সুরু করে। তারপর জননেতা জনতার কাঁধে পা দিয়ে, তখ্তে গিয়ে বসলেন। অতঃপর তখ্তের দৌলতে যা কিছু পেলেন তা দু'হাতে খদ্দরের নামাবলীর আড়ালে ভুঁড়ীর

মধ্যে চালান করে দিলেন। উপ্‌ছে যা পড়ল তা তার পারিষদবর্গ ভাগ করে নিলেন। আর জনসাধারণ? তারা শুধু 'হা' করে তাকিয়ে রইল।

অতএব এব্যাপারে আমাকে আর টানবি না। কারণ আমি স্থির জানি, যতদিন না জনসাধারণ নিজেদের নেতৃত্ব নিজেরাই গ্রহণ করছে ততদিন ভুঁড়ীও থাকবে, শুকনো পেটও থাকবে।

আমি আড় হয়ে পড়লুম, এবং জগদীশবাবুর মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে ফেললুম।

কারণ দৈনিক রাহা খরচ নগদ পনর টাকা, পেট চুক্তি খাওয়া, তার উপরও ভোটের সময় এক-একটা ফল্‌স ভোট দেওয়াতে পারলে দশ দশ টাকা উপরি লাভ। এ সুযোগ আমি কোনোমতেই হাত-ছাড়া করতে পারি না। বন্ধুকে তো আর এত সব বলা যায় না! যদিও আমি নিশ্চিত জানতুম যে ভোটের ক'দিন আগে থেকেই বন্ধুর আহার নিদ্রা ত্যাগ হবে। তবে সেটা জগদীশবাবুর জন্যে নয়। তার বিপক্ষ প্রার্থীর জন্যে। শুধু জগদীশবাবুর পক্ষ সমর্থনে আমারও যে একটা জোরালো যুক্তি আছে সেই জন্যেই জগদীশবাবুর অত গুণগান করলুম।

কিন্তু ভোটান্তে রাত্রে বন্ধুর সঙ্গে বেশ মনান্তর হয়ে গেল।

রাত্রে বিপক্ষ দুই শিবির থেকে গলদঘর্ম হয়ে আমরা দুই বন্ধু যখন আমাদের একই বাসাবিবরে ঢুকলুম, তখন দুজনেই অবসন্ন, ক্লান্ত। তবে মনের দিক দিয়ে আমি ছিলুম বড় ভরপুর। পকেট গরম, কারণ তিনটা ফল্‌স্ ভোট দিয়ে পেয়েছিলুম তিরিশ টাকা আর দৈনিক ভাতা পনর টাকা। সাকুল্যে পঁয়তাল্লিশ টাকা পকেটে সগৌরবে বিরাজ করছে। বেশ কয়েক দিন বুক ঠুকে চলা যাবে। মনের খুশিতে ইলেকসন বাবদ পাওয়া একটা সিগারেট ধরালুম।

দেখি, বন্ধু আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি তার দিকেও একটা ছুড়ে দিলুম।

বন্ধু সেটাকে একটুকরো কাগজ দিয়ে দুই আঙুলে ধরে, বাইরে ফেলে দিল। স্পর্শ দোষ এড়িয়ে যেমন কোনো নোংরা জিনিস ফেলে, সেই রকম আর কি! আমি ফোঁস করে উঠলুম। বললুম—ওকি! ফেলে দিলি?

বন্ধুটি বললে—তোর ছোঁয়া কোনো জিনিস আজ আমি খাব না।

আমি বললুম—কেন?

বন্ধুটি বললে—তুই আজ অস্পৃশ্য।

আমি তক্ষুণি সুর করে বলতে শুরু করলুম—কে বলে মেথর তোমা অস্পৃশ্য অশুচি—

বন্ধুটি বললে—থাম্! মেথর কি বলছিস? মেথরের সঙ্গে তোর তুলনা দিয়ে মানুষকে অপমান করিস না। বরঞ্চ সিঁদেল চোরের সঙ্গে তুলনা দিতে পারিস। যদিও তারা তোর চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তারা চোর ছাপ মেরেই সমাজের ভেতর চলাফেরা করে থাকে। কিন্তু তুই—তোরা—? আমি আর প্রসঙ্গ বাড়তে দিলুম না। কারণ এ পাঁক যত ঘাটবে তত কেবল দুর্গন্ধই বেরুতে থাকবে। তাই চাপা দেবার জন্যে বললুম—আচ্ছা-আচ্ছা, দাঁড়া-দাঁড়া—পাপ ক্ষয় করবার ব্যবস্থা করছি।

বন্ধুটি বললে—কি করবি?

আমি বললুম—কাল প্রত্যুষেই গঙ্গা স্নান করে তিনবার রাম নাম জপ করব। ব্যস্, সব পাপ লেজ তুলে পালাবে। "একবার রাম নামে সব পাপ হরে—।"

পেট ভরাই ছিল। অতএব বন্ধুর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে পড়লুম।

বন্ধুটিও একটা মস্ত বড় 'হুম্' শব্দ করে ঠাণ্ডা হয়ে রইল। মান্যবর জগদীশকুমার ভঞ্জ মহাশয় জোরে জোরে পা ফেলে চলে যাচ্ছেন। ঐ পায়ের জোর তো আমরাই বাড়িয়ে দিয়েছি। মনে মনে তাকে খঞ্জ হবার অভিশাপ দিয়ে পথ ধরলুম।

ডান ফুটপাথে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া ওয়াচ কোম্পানীর' মালিক নারায়ণবাবুর দিকে চেয়ে একটা কথা মনের মাঝে ঝিলিক্ দিয়ে গেল। বন্ধুটি ঐ নারায়ণবাবুর কাছ থেকে একটি সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড রিষ্টওয়াচ কিনেছিল।

বন্ধুটি বহুদিন ধরেই একটি ঘড়ি ঘড়ি করে ঘোরাঘুরি করছিল। কিন্তু কেনা হয় নি। কারণ বন্ধুটির ধারণা ছিল—অনেক সময় নূতন দামী ঘড়িও সঠিক সময় নির্ধারণে মাথা বেঠিক করে বসে। আর যতই কেন চিকিৎসা করানো হোক্ এই মাথা-পাগলা রোগ নাকি অনেক ঘড়ির সারতেই চায় না।

আমি বলতুম—যে ঘড়ি দ্রুত চলে, তার নাম হওয়া উচিত—ঘোড়া, আর যে ঘড়ি আস্তে চলে, তাকে বলা উচিত—গাধা। কিন্তু যে ঘড়ি দ্রুতও চলে, আস্তেও চলে, আগেও চলে, পিছেও চলে—যার গতির কোনো স্থিরতা নেই, মতির কোনো ঠিক নেই। সে যা বলবে, তাতে শুধু বিভ্রান্তই হওয়া চলে, যথার্থতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না, তাকে কি বলা উচিত? মানুষ।

অতএব গাঁটের পয়সা খরচ করে এ হেন একটি যন্ত্রণা না কিনে, বিনে পয়সায় পরের ঘড়ির সময় দেখে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। এতে যার ঘড়ি আছে, সেও খুশি হয়, আমারও কাজ চলে যায়। কিন্তু প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করে, বন্ধুটি নারায়ণবাবুর শরণাপন্ন হ'ল।

তারপর বন্ধুটি ও নারায়ণবাবু বহু বুদ্ধি খরচ করে, বহু আলাপ আলোচনার পর একটা সিদ্ধান্তে এসে যে যুক্ত বিবৃতি ছাড়ল, তা হ'ল এই—যেমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সমাজের নিম্নশ্রেণী থেকে দু'একটি পদ্মফুল আত্মপ্রকাশ করে, সমাজের নৈকষ্য অভিজাত শ্রেণীর পোকায় কাটা গোলাপফুলকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, চড়্‌চড়্ করে উন্নতি করে যায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, কর্মে, দানে, ধর্মে, সর্ববিষয়ে সে উচ্চস্তরে উন্নীত হ'য়ে, সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে,

তেমনি অনেক সময় দেখা যায় যে এক অখ্যাত কোম্পানীর সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড ঘড়ি হয়েও বিখ্যাত কোম্পানীর দামী ঘড়িকে টেক্কা মেরে বসে।

অতএব লাগ্ লাগ্ ভাগ্য, বন্ধুর কপালে লাগ্। নারায়ণবাবু, পট্ করে একটি ঘড়ি বের করে, বন্ধুটির হাতে দিয়ে বললেন—কি দেখছেন এটা ?

বন্ধুটি বললে—একটি ঘড়ি।

নারায়ণবাবু বললেন—উহুঁ, শুধু ঘড়ি বললে ভুল বলা হ'ল, কারণ এতে পনরটি জুয়েল ছাড়াও, যে সমস্ত মজবুত যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট আছে, তাতে ঘড়িটিই একটি আস্ত জুয়েলে পরিণত হয়েছে। হোক্ না সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড, তবু এর সময় জ্ঞান অতিশয় টন্‌টনে। এক বছরের মধ্যে একে তেল মাখাবার দরকার হবে না, সে কাজটা আমিই সেরে দিয়েছি। অতএব নিশ্চিন্ত মনে এটি আপনি মণিবন্ধে বন্ধন করতে পারেন।

ঘড়িটির নাম পড়তে চেষ্টা করে দেখলুম—লেখা আছে 'সির্‌দার' (Sirdar).

নাক কুঁচ্‌কে বন্ধুর দিকে চাইলুম। দেখি বন্ধু ঘড়িটি কানের কাছে ধরে তার প্রাণস্পন্দন পরীক্ষা করছে। নারায়ণবাবু বন্ধুর দ্বিধা কাটাবার জন্যে পুনরায় দ্বিধাহীন ভাবে বললেন—আমি বলছি, আপনি নিয়ে যান। এ একটি জুয়েল।

বন্ধুটি কানের কাছে শুনল—টিক্, টিক্, ঠিক্, ঠিক্।

অতঃপর পঁয়ত্রিশ মুদ্রার বিনিময়ে ঘড়িটি বন্ধুর কব্‌জিতে এসে উঠল। আসবার সময় নারায়ণবাবু বলে দিলেন—যদি কিছু খারাপ হয় তো চিন্তার কিছু নেই, আমি তো আছিই।

বন্ধুটি খুব খুশি, আমিও খুশি, কারণ মাঝে মাঝে ঘড়িটি হাতে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়ি। সেদিন জামার হাতাটাকে কণ্ঠা পর্যন্ত উঠিয়েও স্বস্তি পাই না। ইচ্ছে হয়, হাতাটা বাদ দিয়েই জামাটা পরি।

সাধারণতঃ সিনিয়র যাত্রী জুনিয়রদের গাড়ীতে উঠতে সাহায্য তো করেই না, উপরন্তু পাশের কামরায় স্থানের প্রাচুর্য ও স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখিয়ে বিদায় করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু একবার গুঁতোগুঁতি করে কোনোমতে উঠে দাঁড়াতে পারলেই কিছুক্ষণের মধ্যে বন্ধু জুটে যায়। ভাব জমানোর সূত্রটি সামান্য —আপনি কোথায় যাবেন ?

উপবিষ্ট যাত্রীটি উত্তর করলে—এলাহাবাদ। এবার পাল্টা প্রশ্ন—আপনি ?

উত্তর—মোগলসরাই।

উপবিষ্ট যাত্রী—তাহলে তো অনেকটা পথই একসঙ্গে যাওয়া যাবে, কি বলেন ? ভালই হ'ল, আহা-হা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

যেন ইচ্ছে করেই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তাই এই দরদভরা অনুযোগ।

উপবিষ্ট যাত্রীটি ততক্ষণে ডাইনে বায় ঘাড় ফিরিয়ে একটু চেপে বসে বল্‌লে—বসুন, বসুন। হলই বা না হয় একটু কষ্ট! তাই বলে আপনি—

তারপর পাশের লোকটির দিকে চেয়ে ব'ল্‌লে—দাদা, একটু কাইণ্ড্‌লি—

দেখা গেল, সেই যাত্রীটিও দয়া করতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করল না, যা নাকি কামরায় উঠবার আগে কল্পনাও করা যায়নি।

তারপর ধন্যবাদান্তে যুৎসই হয়ে বসে সুরু করা যাক্‌ রাজনীতি আলোচনা, ব্যস্‌। কিছু সময়ের মধ্যেই আসর জমে দস্তুরমত গুল্‌জার হয়ে উঠল।

এর ভেতর যে যত বেশী গুলপট্টি ঝাড়তে পারবে, তার তত কদর। সে তখন 'ফুরার' হয়ে বসে।

পাশের যাত্রীটির সঙ্গেই মাখামাখিটা বেশী হয়ে থাকে। উভয়ে উভয়ের কাছে কত যে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, তা বলে শেষ করা

যায় না। তখন এর পুঁটুলি ওর পুঁটুলির ভেতর, এর বালিশে ওর মাথা, দুজনে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। উভয়ের মত, পথ, স্বার্থ অভিন্ন হয়ে যায়। তখন একজনের বিপদে অপরে বুক পেতে দিতে মুহূর্ত বিলম্ব করে না।

এই প্রসঙ্গে বন্ধুটি বলেছিল—এই রকম পথের সাথী দু' একটি জুটেই যায়, এবং এদের কাছ থেকে যে আন্তরিকতা, উদারতা, সাহায্য ও ভালবাসা পাওয়া যায়, বাইরের পৃথিবীতে এলে তা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্ধুটি বলেছিল—অপরিচয় এখানে দূরত্ব সৃষ্টি করে না, ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছে, নিজের পোঁটলা-পুঁটুলি বেছে নিয়ে, নেমে যাবার সময় শুধু একটি ক্ষুদ্র নমস্কারের ভেতর দিয়েই দীর্ঘ যাত্রাপথের দেনা-পাওনার ইতি করে দিয়ে যায়। এই সত্যটাই যেন প্রমাণিত করে যায়—যা কিছু পেলুম, যা কিছু দিলুম, সবই এখানে রেখে গেলুম। সঙ্গে কিছুই নিলুম না, নিতে পারলুম না, কারণ নেওয়া যায় না।

যাচ্ছিলুম জব্বলপুর। যুদ্ধের দৌলতে অনেক যদু-মধুই দু'পয়সা কামিয়ে কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে বসেছেন। যার দাম ছিল না চার পয়সা তার দাম হয়ে গেল এক লাখ টাকা। আর চাকরি তো যে সে করছে। বিদ্যার কোনো বালাই নেই; শুধু বুক ফুলিয়ে লাইনে গিয়ে দাঁড়াও। সাহেব এসে বুকে টোকা মেরে বলবেন—আও। ডাকটার মধ্যেই অর্থ সুস্পষ্ট—তোমাকে ফেইথফুল ডগ্ হতে হবে। তারা যে এই দুশ বছর ধরে আমাদের বুকের উপর চেপে বসে আমাদের কৃতার্থ করেছেন সেই সত্যটা তোমার উপলব্ধি করতে হবে আর তোমাদেরই স্বার্থে মনিবকে বাঁচাতে গিয়ে তোমার নগন্য প্রাণটি বিসর্জন দিতে হবে।

আমার সবেমাত্র চোখ ফুটেছে। আয়ের কালো পথটা তখনো ভাল দেখতে পাইনি, তাই আমিও একদিন লাইনে দাঁড়িয়ে পল্টনে বহাল হয়ে গেলুম। তবে রক্ষা এই, আমার হাতে

অসির বদলে মসি দেওয়া হল। আমাকে মিলিটারী একাউন্টস্ ক্লার্ক হিসাবে নিযুক্ত করা হ'ল। কর্মস্থল জব্বলপুর। অতএব সরকারী ব্যয়ে রেলওয়ে ইন্টার ক্লাশের পাস নিয়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। বোম্বেমেলের কাছে গিয়ে দেখি সে এক মহাহুলুস্থুল ব্যাপার। সবাই উঠতে চেষ্টা করছে। কেউ জানলা টপ্‌কে, কেউ দরজা দিয়ে, স্ত্রী পুরুষ ভেদাভেদ নেই, চীৎকার হৈ হুল্লোড়ের বিরাম নেই! কে কাকে কি বলছে কিছুই বোঝবার উপায় নেই! এর বাক্স ওর ঘাড়ে, ওর পা এর মাথায়, একটা তালগোল ব্যাপার। মাঝে মাঝে সব ছাপিয়ে চীৎকার উঠছে—জল—জল—পানি—পানি। জল নিয়ে জলধর দাঁড়িয়েই আছে। অমনি এক গ্লাস জল এগিয়ে দিচ্ছে আর চারটি করে পয়সা তার হাতে এসে যাচ্ছে। মোটের উপর যুদ্ধ যদি কোথাও বেধে থাকে তো এইখানেই। ইন্টার ক্লাশে ঠেলাঠেলিটা অপেক্ষাকৃত কম। অতএব অল্প আয়েসেই পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি নিয়ে উঠলুম। উঠে দেখি সীট্ যে ক'খানা ছিল সবই ভর্তি। একখানা সীটে একটি ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যুবক তাঁর বিছানা বিছিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বিনীত ভাবে বললুম—দাদা একটু যদি—

খেঁকিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক—এ সীট্ রিজার্ভ করা। অন্যত্র দেখুন।

অতএব দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া অন্য উপায় দেখলুম না। গাড়ী ছেড়ে দিল। একটুখানি যাবার পরই ভদ্রলোকটি বললেন—বসুন। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন!

কোথায় বসব ইতস্ততঃ করছিলুম।

ভদ্রলোকটি তড়াক্ করে উঠে বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে বললেন—বসুন। তারপর কোথায় যাবেন?

আমি বসতে বসতে বললুম—জব্বলপুর।

ভদ্রলোকটি বললেন—ভালই হল। আমি যাচ্ছি গয়া বেড়াতে। আবার চার-পাঁচদিন পরেই কলকাতা ফিরছি। দাঁড়ান, আগে শোবার ব্যবস্থাটা করে নিই। বলেই তাঁর বিছানাটা গুটিয়ে একলাফে গিয়ে বাঙ্কের উপর চড়ে বসলেন। আমাকে বললেন—এইবেলা চট্ করে বিছানাটা পেতে নিন। না হলে নেক্স্ট্ স্টেশনেই বেদখল হয়ে যাবে।

আমি বললুম—তাহলে এটা আপনার রিজার্ভ করা নয়!

ভদ্রলোকটি হো হো করে হেসে উঠলেন—রিজার্ভ না কচু! ও না বললে কি আর রক্ষে ছিল? নিন নিন, লম্বা হয়ে পড়ুন।

ক্ষণপূর্বের ব্যবহারের সঙ্গে এখনকার ব্যবহারের কি আকাশ-পাতাল তফাৎ!

তারপর যত স্টেশনে গাড়ী থামতে লাগল খাবারের ঠোঙাও তত আসতে লাগল। আমার সঙ্গে অবশ্য খানকয়েক আটার রুটি ছিল। সে ক'খানা বের করতেই হাত থেকে ছো মেরে নিয়ে বাইরের দিকে ছুড়ে মারলেন। বললেন—ধ্যেৎ, এই রুটি খেয়ে শেষে জল খেয়ে খেয়ে মরবেন নাকি! পরমাত্মীয়ের পরম দরদ ভরা কণ্ঠ।

শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। যখন উঠলুম তখন দেখলুম বাঙ্ক খালি। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট ষ্টেশনে কখন যেন নেমে গেছেন। উঠে বসলুম, দেখি শিয়রের কাছে এক ঠোঙা খাবার আর একটা 'দেশ' পত্রিকা রেখে গেছেন। 'দেশ' পত্রিকার উপরে লিখে রেখে গেছেন—'পথের সাথী, পথের স্মৃতি রেখে গেলুম।' নীচে নাম ও কলকাতার ঠিকানা লেখা।

মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল!

তারপর বহুদিন গেছে। আমিও চাকরি ছেড়ে-ছুড়ে কত কি করলুম! কতভাবেই না কাটালুম!

সেই যুদ্ধও শেষ হয়ে গেছে, সেই ইংরেজও এদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু সেই পথের সাথীর দেওয়া 'দেশ' পত্রিকাটি আমি

হারাইনি। সেদিন হঠাৎ খেয়াল হতেই 'দেশ' পত্রিকায় লেখা ঠিকানা অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম। মস্ত বড়লোকের ছেলে। মস্ত বড় বাড়ী। আর দেখলুম মস্ত বড় অন্তর তাঁর। এত দিন পরও আমাকে ঠিক মনে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গেই আজ বিকেল চারটের সময় দেখা করার কথা। তাই বিকেল হতেই বন্ধুকে বললুম—কটা বাজেরে?

বন্ধুটি বললে—তোর ক'টা চাই?

আমি বললুম—এই তিনটা হলেই চলবে। চারটার মধ্যে কালীঘাট যেতে হবে। না গেলে খুব ক্ষতি হবে।

বন্ধুটি বললে—না গেলে ক্ষতি হবে! বাব্বা! কালীঘাটে কোনো রাজত্ব খালি আছে বলে ত শুনিনি?

আমি রেগে গিয়ে বললুম—বাপু বলবি ত বল্—না হলে তোর ঐ সিরদার ঘড়ি ছাড়াও জগতে আরো অনেক ঘড়ি আছে।

বন্ধুটি বললে—কিন্তু এমন একটি আস্ত জুয়েল কোথাও পাবি না। নারায়ণবাবু বলেছেন—একে ঘড়ি না বলে একটি রত্নপিণ্ডও বলা যেতে পারে।

বলে সেই পিণ্ডটি দেয়াল থেকে নামিয়ে চোখের সামনে ধরতেই বন্ধুটির হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার উপক্রম হল।

আমি বললুম -কি হলরে? কটা বাজে?

বন্ধুটি কিছু না বলে ঘড়িটি কানের কাছে বার কয়েক নাড়াচাড়া করে বললে—বারোটা বেজে গেছে! হাতে নিয়ে দেখলুম—ঠিক কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বেজে রয়েছে। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি কলে বিকেলের জল এসেছে।

বন্ধুটি তক্ষুণি ছুটল নারায়ণবাবুর কাছে। নারায়ণবাবু নাড়ী পরীক্ষা করে, টিপেটুপে রায় দিলেন—ঘড়ির লিভার খারাপ হয়ে গেছে।

তারপর থেকে কখনো বা লিভার খারাপ হয়ে, কখনো বা

হেয়ার স্প্রিং কেটে হার্টফেল্ করে, পর্যায়ক্রমে নারায়ণবাবুর ঘড়ি-হাসপাতালে দশদিন পনরদিন থেকে যেতে লাগল। মোটকথা ঘড়িটি বন্ধু একাদিক্রমে সাতদিন হাতে দিয়ে দেখেনি।

শেষ পর্যন্ত ঘড়িটির একটা ক্রনিক ব্যামোতে দাঁড়িয়ে গেল। যতই দম দেওয়া যেত, কিছুতেই দম থাকত না। বন্ধুকে দেখতুম যখনি ঘড়িটি কাছে থাকত, তখনি রুগ্ন প্রিয়জনের মতই তার শুশ্রূষা করত। দিনে তিন চারবার করে দম দিত, এবং অন্ততঃ পাঁচবার অন্য ঘড়ি দেখে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে সময় মিলিয়ে নিত। আমি একদিন রেগে মেগে বললুম—স্থাখ, ওই যন্ত্রণাটাকে বিদায় করে দে বাপু।

বন্ধুটি কাতরভাবে বললে—পঁয়ত্রিশ টাকার ঘড়িতে পঁয়তাল্লিশ টাকা খরচ করে বড় মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি!

আজ নারায়ণবাবুর দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললুম—তখন কি জানতুম ঘড়ির মত বন্ধুর দমও এত শীগ্গীর ফুরিয়ে এসেছে!

বেশীক্ষণ দাঁড়ালুম না। পা চালিয়ে দিলুম।

হোচট্ খেয়ে পড়তেই গতিতে ছেদ পড়ল। ধূলো ঝেড়ে উঠে দেখলুম, খ্যাতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী মিঃ বোনার সাহেবের বাড়ীর দরজাতেই পড়েছি।

মিঃ বোনার—অর্থাৎ আদি পৈতৃক নাম ছিল শ্রীমান সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু দিন এগোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীমান থেকে শ্রীযুক্তে পৌঁছলেন। তারপর আরও কিছুদিন পর, বেশ কয়েকটা ধাপ লাফিয়ে পার হয়ে যে সমাজে এসে পড়লেন, সেখানে শ্রীযুক্ত এবং সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে শুধু অচল হয়েই পড়ল, তা নয়, রীতিমত গভীর লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অতএব মিঃ এস্. এন্.

ব্যানার্জী রূপে তিনি নিজেকে পরিচিত করালেন। তারপর? তারপর আরও কিছুদিন বাদে, যুদ্ধের কল্যাণে সাহেব-সুবার সঙ্গে হামেশা দহরম্-মহরম্ থাকায়, ধর্মে এবং কর্মে, মনে এবং প্রাণে সাহেবী রূপ নিয়ে, তিনি একদম মিঃ বোনার সাহেব হয়ে বসলেন। বর্তমানের বোনার সাহেবকে দেখে, অতীতের শ্রীমান সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুঁজে বের করতে দস্তুরমত ঐতিহাসিক গবেষণার প্রয়োজন হবে। তবে সুখের বিষয়, এরূপ গবেষণা করবার মাথা-ব্যথা বোধ হয় কারও হবে না। কারণ এ সমাজের পরিচয় এবং প্রয়োজন লেজে,—মাথা এবং দেহের খোঁজের দরকার হয় না। অন্তরের খোঁজ নেওয়াটা এখানে নিতান্তই সেন্টিমেণ্ট।

এই বোনার সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় বড়ই বিচিত্র ঘটনার মধ্যে। সেদিনটা মনে থাকবার আর একটা বিশেষ কারণ হ'ল—বন্ধুর সঙ্গে আমার যাকে বলে ঠাণ্ডা লড়াই চল্‌ছিল।

ঘটনাটা এই—সেদিন যেমন পড়েছিল গুমোট গরম, তার উপর আকাশটা ছিল মেঘে ঢেকে গোম্‌ড়ামুখো হয়ে।

আমি প্রাত্যহিক দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়ার উপকরণ প্রস্তুত করবার জন্যে স্টোভটির আরাধনা করতে গিয়ে হঠাৎ একটা খেয়াল জাগল—খিঁচুড়ী খাব।

বন্ধুটি আমার এই উদ্ভট অভিপ্রায় শুনে একদম খিঁচিয়ে উঠ্‌ল। বললে—একেই গরম, তার উপর আবার গরম খাদ্য খিঁচুড়ী! গর্দভ কোথাকার!

আমি বললুম—তাই তো ভাল, একেবারে গরমাগরম।

বন্ধুটি বললে—তোর মাথা। ওসব নয়, স্রেফ্ ভাতে জল ঢেলে লেবু দিয়ে খাওয়া হবে।

বলে এমন ভাবে সিগারেটের ধোঁয়াটা ছাড়ল, যেন জজ সাহেবের রায় হয়ে গেল। এর আর নড়চড় নেই।

আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগল।

আমি বললুম—ঠিক হ্যায়, তোমার জন্মে ভাতে জল, আমার জন্মে খিঁচুড়ী।

বন্ধুটি বললে—কিন্তু কেরোসিন তেলের একটা বাজেট্ আছে, আশা করি সেটা ভুলে যাসনি।

অর্থাৎ রোজকার জন্মে স্টোভে জ্বালাতে কেরোসিনের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিল, এবং আমরা উভয়েই আমাদের স্থিরীকৃত বাজেটের বাইরে যাব না, এই রকম একটা চুক্তি করেছিলুম। অবশ্য এটা আমাদের গৃহস্থালীর গোপন কথা। থাক্, ঘরের কথা পরকে বলে লাভ নেই। .মোটের উপর আমি মনে মনে তিক্ত হ'য়ে মুখটা হাঁড়ির মত করে, ভাতের হাঁড়িটা স্টোভের উপর চাপাতে যাব, ঠিক এমনি সময় একখানা ঝক্ঝকে বৃহৎ মোটর গাড়ী এসে আমাদের ঘরের সামনে সশব্দে থেমে গেল। সবান্ধব আমি তুয়ারের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেলুম! আমাদের তুয়ারে মোটর! আর যে-সে মোটর নয়, একখানা সুদৃশ্য 'বুইক্'!

আমি একবার গাড়ীখানার দিকে, একবার আমাদের ঘরখানার দিকে তাকাতে লাগলুম। দেখলুম—গাড়ীখানা আমাদের জীর্ণ ঘরের সামনে থাকাতে, আমাদের ঘরখানা যেন অজীর্ণ রুগীর' মত হয়ে গেছে।

ভাবলুম—বাড়ী ভুল করেছে। কিন্তু তা নয়, মোটর আরোহী গাড়ীতে বসেই গলা বাড়িয়ে আমার বন্ধুর নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—এই ঘর কি না।

আমাদের কাছ থেকে সম্মতি পেয়ে, ভদ্রলোক এবারে নেমে এলেন, এবং জুতো সুদ্ধ মচ্ মচ্ করে, ঘরের মধ্যে এসে সবিনয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালেন।

বন্ধুটি ততক্ষণে ছেড়া মাতুরটার উপর পাতবার জন্মে তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে আমার একমাত্র পোশাকী জামাটা পেয়ে, তাই বিছিয়ে দিয়ে ভদ্রলোককে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভদ্রলোকটি হেসে বললেন—না না ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হবেন না! বলতে বলতে মুখে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমার জামাটার উপরই চেপে বসলেন।

আমি না পারি কিছু বলতে, না পারি সইতে। রাগে মনে মনে ভদ্রলোকের আদ্যশ্রাদ্ধ থেকে মায় সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা করে, ভাতের হাঁড়িতে মন দিলুম।

তারপর পরিচয়ের পালা আরম্ভ হতেই ভদ্রলোকটি বেশী কিছু না বলে, একখানা কার্ড বের করে বন্ধুটির হাতে দিয়ে স্মিত মুখে চেয়ে রইলেন।

ঝুঁকে পড়ে দেখলুম—লেখা আছে—মিঃ বোনার, মার্চেন্ট।

বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোকটির মুখের দিকে তাকালুম। নাঃ, ভুল হয়নি। বাঙ্গালীই বটে! ঐ তো ধুতি চাদর পরে এসেছেন। মাথায় দেশভক্তির নিদর্শন স্বরূপ খদ্দরের টুপি। চেহারার ভেতর রয়েছে একটা শ্যামল শ্রী—বাঙ্গালীত্বের অকাট্য প্রমাণ। অথচ নাম মিঃ বোনার! মস্ত ধাঁধায় পড়লুম। ভাবলুম—এ্যাংলো নাকি!

বন্ধুটি ভদ্রলোকটিকে বললে—তা আমাকে চিনলেন কি করে?

বোনার বললেন—ভোলানাথবাবুর কাছে আপনার সব খবর পেলুম।

বন্ধুটি সাগ্রহে বললে—ভোলানাথবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নাকি?

বোনার বললেন—বিলক্ষণ! অমন মহৎ লোক!

ভদ্রলোকটি ভোলানাথবাবুর পরিচিত! অতএব বন্ধুটি গদ্‌গদ্‌ হ'য়ে উঠল। বন্ধুটি ব'ললে—তা বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

বোনার ব'ললেন—ভোলানাথবাবু আপনার খুব প্রশংসা করলেন।

বন্ধুটি বললে—তিনি আমাকে স্নেহ করেন বলেই হয় তো করেছেন—না হলে প্রশংসার যোগ্য আমি মোটেই নই।

বোনার সাহেব হেসে বললেন—তাই বটে! আরে মশাই, সব খোঁজ খবর না নিয়েই কি আমি এসেছি? সেদিন দেশের বর্তমান রাজনীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করছিলুম। সেই কথা প্রসঙ্গেই আপনার কথা তিনি বললেন।

বন্ধুটি বললে—ভাল কথা! এখন আমার কাছে—বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোনারের দিকে।

বোনার বললেন—হ্যাঁ, বলছি। শুনলুম আপনি নাকি বহু কারাগাব-ফেরত। জীবনটাই বাজনীতি নিয়ে—

বন্ধুটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে—হ্যাঁ, দেশসেবার একটু সৌভাগ্য হয়েছিল বৈ কি! তা বিশেষ কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। যাক্ সে কথা—

বোনার হেসে বললেন—সে কথাটাকে তো যেতে দিলে চলবে না, সেইটাই তো আসল কথা। বলে হেঃ হেঃ করে হাসলেন খানিক। তারপর গদ্গদ্ কণ্ঠে বলতে আরম্ভ কবলেন—আপনাদের মত লক্ষ লক্ষ লোকেব আত্মত্যাগেব ফলেই আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে! একথা ভুল্লে চলবে না যে এই স্বাধীনতার মূল্য দিতে গিয়ে ভাবতের, বিশেষ করে বাংলার কত সংসাব ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ তাদের কথা ·····ইত্যাদি ইত্যাদি নাতিদীর্ঘ এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে উপসংহারে তিনি এই বলে শেষ করলেন—আপনারা মশাই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, আপনারা নমস্য।

বক্তৃতা শেষ হবাব পবও প্রায় আধ মিনিট লাগল বোনারের আবেগ সাম্লাতে।

বোনার রূপোর সিগারেট কেস্ খুলে বন্ধুব সামনে ধরলেন। বন্ধু তা থেকে একটি তুলে নিল। অপর একটি বোনার ধরালেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন—আজ একটা

ব্যাপারের জন্যে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেছি। দেখুন, আমি একজন মার্চেন্ট। ফরেইনের সঙ্গেই আমার এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট চলে। যুদ্ধের সময় অবশ্যি লোহার সঙ্গে অষুধও ছিল। এখন শুধু লোহাটাই রেখেছি। যাই হোক্, এখন যে জন্যে এসেছি সেই কথাটাই বলি। আপনি তো রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত, তাই বলছিলুম—যদি পারমিটের ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য করেন—অবশ্য পারিশ্রমিক বাবদ যা চাইবেন—হেঃ হেঃ হেঃ—বক্তব্যের বাকী অংশটা হাসির ভেতর দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন মিঃ বোনার।

আমি হাঁড়ির ভেতরটা দেখবার জন্যে ঢাকনাটা একটু সরাতে গিয়েছিলুম, কিন্তু একথা শোনা মাত্র হাতটা আমার কেঁপে উঠল, ঢাকনাটা সশব্দে নীচে পড়ে গেল। আমি শঙ্কিত হয়ে বন্ধুর দিকে তাকালুম!

বন্ধুটির মুখের ভাব অত্যন্ত কঠিন দেখাল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই সাম্‌লে নিয়ে বললে—দেখুন, রাজনৈতিক কারণে জেলে যাওয়াটা একটা কোয়ালিফিকেশন হতে পারে, কিন্তু সকলে সেই কোয়ালিফিকেশনের সদ্‌ব্যবহার করতে জানে না, এমন নির্বোধেরও অভাব নেই। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছি আমি নিজে। অতএব জেলে গেলেই পারমিট দেবার ক্ষমতা থাকে না এটা আপনি জেনে রাখুন। তবে আপনি যখন ভোলানাথবাবুর পরিচিতি নিয়ে এসেছেন, তখন আপনাকে একেবারে নিরাশ করব না। আমি এমন একজন লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে পারি, যিনি এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

বোনার সাগ্রহে বললেন—ঠিক আছে, তাই দিন!

বন্ধুটি বললে—আমার এক বন্ধু আছেন, একসঙ্গে বহু জেলে ছিলুম। তার আবার বেশ উঁচু মহলে যাতায়াত আছে। তিনি পরশু বিকেলে পাঁচটা থেকে ছ'টার ভেতর আমার এখানে আসবেন। আপনার যদি নেহাত অসুবিধে না হয় তো আসতে পারেন, পরিচয়

করিয়ে দেব। এর বেশী আমি আর কিছু করতে পারব না, মাপ করবেন।

বোনার সাহেব যেন অকূলে কূল দেখতে পেলেন। তিনি বললেন—বেশ, আমি তাই আসব। দেখবেন একটু দয়া ক'রে। এখন উঠি তাহ'লে, নমস্কার।

মোটরখানা দুয়ারের কাছে থাকাতে, আমাদের ঘরখানা এতক্ষণ যেন মরমে মরে ছিল। কিন্তু মোটরখানা চলে যেতেই, বাইরে থেকে এক ঝলক্ আলো ঢুকে, ঘরখানাকে যেন হঠাৎ কাতুকুতু দিয়ে হাসিয়ে ফেললে।

বন্ধুর দিকে চেয়ে আমি 'হায় হায়' ক'রে উঠলুম। দেখি মিঃ বোনারের দেওয়া সিগারেটটি দুমড়ে বাইরের দিকে ছুড়ে ফেলে দিলে।

আমি বললুম—আহা-হা! করলি কি, করলি কি? নিশ্চয়ই কোনো দামী সিগারেট হবে!

বন্ধুটি আমার দিকে চেয়ে বললে—কি জানি কেন যেন ঘেন্না করল খেতে!

নির্ধারিত দিনে আমার বন্ধুর সেই ভূতপূর্ব সহকর্মী রীতেন এসে উপস্থিত হ'ল।

রীতেন বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্ধুর মুখে শুনেছি, যে-কোনো দুর্ধর্ষ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভেতরই নাকি সে আনন্দ পেত বেশী। জীবন-মৃত্যুর মাঝে সে বড় বেশী কিছু তফাৎ অনুভব করত না। তাই বোধ হয় বারবার মৃত্যু এর কাছে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন অটল নির্ভীকতা, বন্ধুটি আর কোথাও দেখতে পায়নি।

বন্ধুটি অল্প দু'চারটি কথার পরই রীতেনকে বোনার সাহেবের আগমন এবং কারণ ব্যক্ত ক'রে তাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে অনুরোধ করলে।

রীতেন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—দেখছি জেল থেকে ছাড়া পেয়েও নিস্তার নেই। এসব কাজের ভেতর যেতে যেন কেমন লাগে!

বন্ধু বললে—তা আমিও জানি, কিন্তু ভদ্রলোক এমন একজন লোকের পরিচিতি নিয়ে এসেছেন, যাঁকে আমি কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারিনি।

রীতেন বললে—সে তো যেন হ'ল, কিন্তু লোকটি কে বল্ তো?

ঠিক এমন সময় সশব্দে ব্রেক কষবার আওয়াজ পেয়ে আমরা দুয়ারের দিকে চাইতেই দেখি বোনার সাহেব। মোটরের দরজা খুলে নেমে সোজাসুজি এসে ঘরে ঢুকলেন তিনি। বন্ধুটির দিকে চেয়ে হেসে নমস্কার করলেন। বন্ধুটিও প্রতিনমস্কার করে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল! আমি তখন জামার পকেটগুলোর গলি-ঘুঁজি গভীর মনোনিবেশ সহকারে একটি বিড়ির জন্যে তোলপাড় করছিলুম। হঠাৎ ঘরেব মধ্যেটা মায়ামুগ্ধ নৈঃশব্দে ভরে যাওয়াতে বিস্মিত হয়ে তাকালুম!

সে এক দৃশ্য! দেখি মিঃ বোনার চেয়ে আছেন রীতেনের দিকে, রীতেন চেয়ে আছে মিঃ বোনারেব দিকে। আর বন্ধুটি দু'জনার ঠিক মাঝে চেয়ে থেকে উভয়কে লক্ষ্য করছে। আমি পর্যায়ক্রমে সকলেব মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে এই অদ্ভুত ভাবময় পরিবেশের ভাব উদ্ধার করতে না পেরে, শুধু বোকার মত চেয়ে রইলুম।

খানিক বাদে মিঃ বোনারই সবাক হলেন, বললেন—রীঁতে—তুই!

রীতেন বললে—কাকা!

মিঃ বোনার আচম্কা বন্ধুর দিকে ফিরে ব'ললেন—আচ্ছা, নমস্কার। এখন আসি।

বলে ঝড়ের বেগে বের হ'য়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলেন এবং মুহূর্তে গাড়ীসহ অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! কী ব্যাপার!

রীতেনের দিকে চেয়ে দেখি তার মুখের উপর কে যেন কালি মেখে দিয়েছে!

আমি কৌতূহল দমন করতে না পেরে ব'ল্‌লুম—কি ব্যাপার রীতেনবাবু?

বন্ধুটি আমাকে থামিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লে—থাক্‌!

রীতেন ব'ললে—আর একদিন ব'ল্‌ব। বলে গম্ভীর ভাবে উঠে চলে গেল।

আমি গভীর বিরক্তির সঙ্গে বন্ধুর দিকে তাকালুম। সে আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে ব'ল্‌লে—হয়ত এর ভেতর কোনো রহস্য আছে, যা উদ্‌ঘাটনে রীতেন লজ্জিত হ'ত বা অত্যন্ত আহত হ'ত।

বন্ধুর এই উদ্ভট্ ধর্মজ্ঞানে আমার মাঝে মাঝে দারুণ রাগ হ'ত।

যা হোক্‌ কিছুদিন বাদে রীতেনই সব খুলে ব'ল্‌ল।

বস্তুতঃ কাকা ভাইপোর সঙ্গে এই প্রায় পনর বছর বাদে দেখা। তাতে কাকা প্রার্থীরূপে, আর ভাইপো দাতারূপে।

তারপর ব্যাপারটা যা শুনলুম, তাতে অবাক হ'বার মত মোটেই কিছু দেখতে পেলুম না। এ তো অতি সাধারণ জিনিস, হামেশাই ঘট্‌ছে। তুত্তোর! মনটা বড়ই দমে গেল।

নূতন ঘটনা জানবার আগ্রহটাই হ'ল কৌতূহল।

এই কৌতূহলটা বড়ই স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ। যে বিষয় জানবার কৌতূহল হ'ল, তা জানবার আগে এবং পরে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যাবে, কৌতূহল প্রশমিত হবার পরে, বক্তার প্রতি তার সেই অতি ব্যগ্রতা তো তিরোহিত হ'লই, উপরন্তু তার দিকে ফিরে চাইবারও প্রয়োজন হয় না।

একেই বলে কৌতূহল। এর আদিতে ব্যাকুলতা, নিবৃত্তিতে অকৃতজ্ঞতা।

যাই হোক, রীতেন এবং বোনার সম্বন্ধীয় ঘটনাটি হ'ল এই—

রীতেনের বাবা রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই মিঃ বোনার মানে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুই ভাই। তাদের বাবা তুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা গেলেন, তখন রমানাথবাবুর বয়স পনর আর সীতানাথবাবুর তেরো।

এই তুই নাবালক কিশোর তু'টি, একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে, অকূল সাগরের ভেতর হাবুডুবু খেতে লাগলেন। 'অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাইরে—' কিন্তু কূল একদিন পাওয়া গেল। অনেক নাকানি চুবানি খাবার পর মাসিক মাত্র দশ টাকা মাইনেতে বাজার সরকার রূপে পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে রমানাথবাবু চাকরী পেলেন এবং ভাই সীতানাথবাবুকে কাছে রেখে, কষ্টে-সৃষ্টে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রতে লাগলেন।

জমিদারবাবুর ছিল শিকারের প্রতি প্রবল ঝোঁক্। মাঝে মাঝেই তিনি সদলবলে শিকারে বেরিয়ে পড়তেন এবং ফিরতেন অতিকায় বাঘ বা হরিণ নিয়ে।

রমানাথবাবুর দেহে যেমন ছিল অসাধারণ শক্তি, মনে ছিল তেমনি তুর্দান্ত সাহস। স্বভাবতই তিনি শিকারের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন এবং অতি সহজেই জমিদারবাবুর শিকারের সঙ্গী হিসাবে বহাল হয়ে গেলেন।

একদিন এক তুর্ঘটনায় রমানাথবাবুর সৌভাগ্যের কপাট খুলে গেল।

এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে যখন দিনের বেলায় শিকারের পদচিহ্ন দেখে, তার গমনাগমনের পথের নিশানা করতে শিকারী দল ব্যস্ত ছিল, তখন অতর্কিতে শিকার এসে থাবা তুলে দন্ত বিকশিত ক'রে শিকারীকে অভ্যর্থনা করে বসল। এ যেন বহুদিন অদর্শনের পর প্রিয় বন্ধুর দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে একেবারে বিনাপ্রশ্নে কোলাকুলি ক'রে বসা।

এই মারাত্মক অভ্যর্থনায় জমিদারবাবু একেবারে থ' বনে গেলেন! তিনি সম্মোহিতের মত, না পারলেন নড়তে, না পারলেন হাতের বন্দুকের ব্যবহার করতে। হাতের বন্দুক হাতেই র'য়ে গেল, এমন কি একটা চীৎকার দেওয়ার পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা রইল না। বাঘ কিন্তু তার দুই থাবা জমিদারবাবুর দুই কাঁধে রেখে, নিজস্ব ভাষায় রাগ অথবা অনুরাগ যাই হোক একটানা প্রকাশ করে যাচ্ছিল।

দলবল তখনও কিছুটা দূরে। শুধু রমানাথবাবু জমিদারবাবুর হাতকয়েক পিছনে আসছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাঘ্রপ্রবরের চলাচলের পথের খবরটা তার পদচিহ্ন দেখে স্থির করে, সেই অনুযায়ী গাছের উপর মাচা বেঁধে মোলাকাৎ করবার জন্যে রাত্রে অপেক্ষা করবেন।

কিন্তু এদিকে ব্যাঘ্র মশাই যে তাদের আসার পথ চেয়ে এতদিন অধীর আশায় কাল গুনছিল, তা কি করে পূর্বাহ্নে এরা অনুমান করবেন! অনুমান যাই হোক্, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ তা প্রমাণিত হ'তে আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হবে না।

রমানাথবাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে। গুলি ক'রবার উপায় নেই। তাঁর সামনে জমিদারবাবু, জমিদারবাবুর সামনে সেই বিরাট দেহবিশিষ্ট বাঘ। রমানাথবাবু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, একটা হুঙ্কার দিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাঘও এই নূতন বন্ধুকে পেয়ে জমিদারবাবুকে ছেড়ে, পরম উৎসাহে তাকে জড়িয়ে ধরল। এবং রক্ত মাংসের আস্বাদনের জন্য মুখ বাড়াতেই, রমানাথবাবু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোমরের ছোরাখানা উঠিয়ে, বাঘের থুতনির নীচে সজোরে কোপ বসিয়ে ঠেলে ধরলেন। ইত্যবসরে জমিদারবাবু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, তার বিরাট ভোজালি দিয়ে বাঘটির ঘাঁড়ের উপর একটানা কোপ বসাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দলের অপরাপর সঙ্গীরাও অকুস্থলে উপস্থিত হ'য়ে, কয়েকজন পলায়নই সমীচীন

যাই হোক, রীতেন এবং বোনার সম্বন্ধীয় ঘটনাটি হ'ল এই—

রীতেনের বাবা রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই মিঃ বোনার মানে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুই ভাই। তাদের বাবা দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মারা গেলেন, তখন রমানাথবাবুর বয়স পনর আর সীতানাথবাবুর তেরো।

এই দুই নাবালক কিশোর দু'টি, একে অন্যকে আঁকড়ে ধরে, অকূল সাগরের ভেতর হাবুডুবু খেতে লাগলেন। 'অকূল দরিয়ার বুঝি কূল নাইরে—' কিন্তু কূল একদিন পাওয়া গেল। অনেক নাকানি চুবানি খাবার পর মাসিক মাত্র দশ টাকা মাইনেতে বাজার সরকার রূপে পাশের গাঁয়ের জমিদার বাড়ীতে রমানাথবাবু চাকরী পেলেন এবং ভাই সীতানাথবাবুকে কাছে রেখে, কষ্টে-সৃষ্টে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রতে লাগলেন।

জমিদারবাবুর ছিল শিকারের প্রতি প্রবল ঝোঁক্। মাঝে মাঝেই তিনি সদলবলে শিকারে বেরিয়ে পড়তেন এবং ফিরতেন অতিকায় বাঘ বা হরিণ নিয়ে।

রমানাথবাবুর দেহে যেমন ছিল অসাধারণ শক্তি, মনে ছিল তেমনি দুর্দান্ত সাহস। স্বভাবতই তিনি শিকারের প্রতি ঝুঁকে পড়লেন এবং অতি সহজেই জমিদারবাবুর শিকারের সঙ্গী হিসাবে বহাল হয়ে গেলেন।

একদিন এক দুর্ঘটনায় রমানাথবাবুর সৌভাগ্যের কপাট খুলে গেল।

এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে যখন দিনের বেলায় শিকারের পদচিহ্ন দেখে, তার গমনাগমনের পথের নিশানা করতে শিকারী দল ব্যস্ত ছিল, তখন অতর্কিতে শিকার এসে থাবা তুলে দন্ত বিকশিত ক'রে শিকারীকে অভ্যর্থনা করে বসল। এ যেন বহুদিন অদর্শনের পর প্রিয় বন্ধুর দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে একেবারে বিনাপ্রশ্নে কোলাকুলি ক'রে বসা।

এই মারাত্মক অভ্যর্থনায় জমিদারবাবু একেবারে থ' বনে গেলেন! তিনি সম্মোহিতের মত, না পারলেন নড়তে, না পারলেন হাতের বন্দুকের ব্যবহার করতে। হাতের বন্দুক হাতেই র'য়ে গেল, এমন কি একটা চীৎকার দেওয়ার পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা রইল না। বাঘ কিন্তু তার দুই থাবা জমিদারবাবুর দুই কাঁধে রেখে, নিজস্ব ভাষায় রাগ অথবা অনুরাগ যাই হোক একটানা প্রকাশ করে যাচ্ছিল।

দলবল তখনও কিছুটা দূরে। শুধু রমানাথবাবু জমিদারবাবুর হাতকয়েক পিছনে আসছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাঘ্রপ্রবরের চলাচলের পথের খবরটা তার পদচিহ্ন দেখে স্থির করে, সেই অনুযায়ী গাছের উপর মাচা বেঁধে মোলাকাৎ করবার জন্যে রাত্রে অপেক্ষা করবেন।

কিন্তু এদিকে ব্যাঘ্র মশাই যে তাদের আসার পথ চেয়ে এতদিন অধীর আশায় কাল গুনছিল, তা কি করে পূর্বাহ্নে এরা অনুমান করবেন! অনুমান যাই হোক্, কিন্তু এই সাক্ষাৎকারের পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ তা প্রমাণিত হ'তে আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব হবে না।

রমানাথবাবু পড়লেন মহা ফাঁপরে। গুলি ক'রবার উপায় নেই। তাঁর সামনে জমিদারবাবু, জমিদারবাবুর সামনে সেই বিরাট দেহবিশিষ্ট বাঘ। রমানাথবাবু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, একটা হুঙ্কার দিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বাঘও এই নূতন বন্ধুকে পেয়ে জমিদারবাবুকে ছেড়ে, পরম উৎসাহে তাকে জড়িয়ে ধরল। এবং রক্ত মাংসের আস্বাদনের জন্য মুখ বাড়াতেই, রমানাথবাবু ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোমরের ছোরাখানা উঠিয়ে, বাঘের থুতনির নীচে সজোরে কোপ বসিয়ে ঠেলে ধরলেন। ইত্যবসরে জমিদারবাবু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে, তার বিরাট ভোজালি দিয়ে বাঘটির ঘাঁড়ের উপর একটানা কোপ বসাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে দলের অপরাপর সঙ্গীরাও অকুস্থলে উপস্থিত হ'য়ে, কয়েকজন পলায়নই সমীচীন

মনে করল, বাকী সকলে একযোগে বাঘকে আক্রমণ করল। এই সম্মিলিত আক্রমণে, ব্যাঘ্রপ্রবর ভূ-শয্যা নিতে বাধ্য হ'ল। এদিকে বাঘটি পড়ে যেতেই রক্তাক্ত দেহে জমিদারবাবু এবং রমানাথবাবু, জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

এই ব্যাঘ্র আক্রমণই রমানাথবাবুর শাপে বর হ'ল। দশ টাকার বাজার সরকার থেকে এক লাফে তিনি ম্যানেজার হ'য়ে গেলেন। ক্রমে রমানাথবাবুই সর্বেসর্বা হ'য়ে উঠলেন। জমিদার-বাবু তাঁর হাতের পুতুলে পরিণত হ'লেন। প্রজারা রমানাথবাবুর আদেশকেই জমিদারবাবুর আদেশ বলে মেনে নিতে লাগল।

সেই শিকারলব্ধ বাঘ-ছালটি জমিদারবাবু রমানাথবাবুকেই পুরস্কার স্বরূপ দিয়েছিলেন। রমানাথবাবু তাকে অতি যত্ন সহকারে তুলে রাখলেন। নিকট বন্ধুদের কাছে মাঝে মাঝে গল্প প্রসঙ্গে বলতেন যে তার উন্নতির মূলে রয়েছে ঐ বাঘটি।

তারপর রমানাথবাবু সীতানাথবাবুকে ক্রমে এম্. কম্. পাশ করিয়ে, ব্যবসা সম্বন্ধীয় উচ্চতর জ্ঞান লাভের জন্যে বিলেত পাঠালেন। এবং সীতানাথবাবু বিলেত থেকে ফিরে এলে কলকাতায় এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করে দিলেন।

জমিদারবাবুই ঘটা করে রমানাথবাবুর বিয়ে ঘটিয়েছিলেন, এবং একটি মাত্র পুত্র, এই রীতেনকে জন্মদান করেই স্ত্রী মারা গেলেন। অতঃপর রমানাথবাবু আর দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে ভাই সীতানাথবাবুর সঙ্গে তার শালীর বিয়ে দিয়ে রীতেনকে তার মাসীমার কোলে তুলে দিতে স্থির করলেন। মাসীমার কোলে রীতেন মায়ের আদরেই থাকতে পারবে পরিকল্পনাটা ছিল তাই।

এইরূপ সিদ্ধান্ত করে, রমানাথবাবু তাঁর শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দিনক্ষণ পর্যন্ত স্থির করে সীতানাথবাবুকে যেদিন চিঠি দিলেন, ঠিক তার পরমূহূর্তে সীতানাথবাবুর একখানা চিঠি এসে হাজির হ'ল। চিঠিখানা পড়ে রমানাথবাবু বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এও সম্ভব হ'ল! সীতু তাঁর অজ্ঞাতে বিয়ে করেছে! তাও অসবর্ণ!

সদ্য স্ত্রী-বিয়োগ জনিত শোক, তার উপর ভাইএর কাছ থেকে এরূপ আঘাত, রমানাথবাবু সহ্য করতে পারলেন না। স্বাস্থ্য তাঁর ভেঙ্গে পড়ল, এবং একদিন অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্র তার ক্রিয়া বন্ধ করে রমানাথবাবুকে সকল শোক দুঃখের হাত থেকে অব্যাহতি দিল।

অসহায় রীতেন, মানুষ হতে লাগল তার মামার বাড়ীতে। সেখানেই অমিততেজা তার বড় মামার কাছে রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি হ'ল। বি. এ. পাশ করবার আগেই দু' একবার খুচ্‌খাচ্‌ জেলে গিয়ে প্রথম পাঠ সমাপ্ত করল। তারপর মামার সঙ্গে পাকা-পাকি ভাবে, জীবন পণ করে, রাজনৈতিক আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মামা তার বৃটিশ বর্বরতার কাছে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শহীদ হ'লেন।

আর রীতেন তার মামার আদর্শ সম্মুখে রেখে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার জন্যে, ভ্রূক্ষেপহীনভাবে দুর্বার গতিতে চল্‌তে লাগল।

কতবার মৃত্যুদূত এসে তার বিকট দশন বিস্তার করে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু প্রতিবারই নির্ভীক বীর সৈনিকের মত রীতেন তাকে উপেক্ষা করে দৃঢ়পদে এগিয়ে গেছে।

রণোন্মাদনা বোধহয় মানুষকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলে!

আর সীতানাথবাবু! তিনি এই অবসরে নিজেকে সবদিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিলেন। পাছে রীতেন কোনোদিন এসে কিছু দাবী ক'রে বসে, এই আশঙ্কায় তিনি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং স্থাবর সম্পত্তি সমস্ত নিজের নামে করিয়ে নিলেন। তার উপর রীতেনের জন্যে যদি সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়তে হয়, এই ভয়ে নিজের নামকে সংক্ষিপ্ত করে মিঃ বোনার নামে নিজেকে পরিচিত করালেন।

রমানাথ এবং সীতানাথ। একই ধারা বইতে বইতে, এক সময় দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে গেল। ধারা হ'তে উপধারার সৃষ্টি হ'ল। এল

রীতেন। সৃষ্টি করে মূল ধারা গেল মরে। অতএব সীতানাথ ও রীতেন এই দুই ভিন্নমুখী ধারা বহুকাল একত্রিত হয়নি। মাঝে মাঝে বাঁকের মুখে যে দু' একবার দেখা হ'য়ে গেছে, তা উভয়েই সাধ্যমত এড়িয়ে চলেছে। সীতানাথবাবু ভয়ে, আর রীতেন ঘৃণায়!

এক বর্ষণমুখর রাত্রে আহত, অসুস্থ, তিনদিনের অনাহারী পুলিশ-তাড়িত রীতেন, অনন্যোপায় হয়ে মিঃ বোনারের বাড়ীতে ঢুকে পড়ল।

মিঃ বোনার তখন হুইস্কীর আরাধনায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ দরজা ঠেলে রীতেনকে ঢুকতে দেখে, তিনি এমনভাবে চম্‌কে উঠলেন, যে তাঁর হুইস্কীর অমন গোলাপী নেশাটা, মুহূর্তে ছুটে গেল।

বরঞ্চ একটা কেউটে সাপকে তিনি ঘরে স্থান দিতে পারেন, কিন্তু একজন রাজনৈতিক ফেরারীকে নয়, রীতেনকে তো নয়ই।

রীতেন শুধু বলেছিল—এখানে এক রাতের জন্যেও কি মাথা গোঁজবার অধিকার আমার নেই?

একথার জবাবে মিঃ বোনার মুখে কিছু না বলে রীতেনকে আঙ্গুল দিয়ে বাইরের দরজাটা দেখিয়ে দিলেন এবং বহিষ্কারের পরবর্তী পর্বটা দরোয়ানের উপর ন্যস্ত করে, নিজে বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। কারণ তাঁর উত্থান পতন সবকিছুই এখন ইংরেজ-প্রভুর উপর নির্ভর করছে।

অসহায় অসুস্থ রীতেন সেই জল ঝড়ের মধ্যেই ধুঁকতে ধুঁকতে বের হয়ে পড়ল। কিছুদূর চলে শ্রান্ত অবসন্নভাবে এক বাড়ীর গাড়ীবারান্দার নীচে আশ্রয় নিল। সেইখানেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে একটানা দশ বছর নানা জেলে ঘুরে, জীবনের মূল্যবান সময়টা দেশের পূজায় বলি দিয়ে এল।

তারপর একটা বড়রকমের আবর্তনে চাকাটা গেল সম্পূর্ণরূপে ঘুরে। তাতে যারা এককালে কেউটের চাইতেও ভীতিজনক ছিল,

তারাই হ'ল দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। আর ইংরেজরা গেল পায়ের তলায় তলিয়ে। কিন্তু ইংরেজের পদলেহীদের কি হ'ল? তারা রাতারাতি ভোল্ পাল্‌টে দেশপ্রীতির নামাবলী গায়ে দিয়ে, একদম গোড়া দেশভক্ত সেজে বসল। বন্ধুটি একদিন বলেছিল—একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই, যাদের দেখেছি ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিয়ে সবার আগে গিয়ে দর্পভরে জাতীয় পতাকা পায়ে দলে, প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাত, তারাই আজ সবার আগে সেই পতাকা অভিবাদন করে নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছে। বল্ দেখি এদের কি আখ্যা দেব?

যাই হোক—অদৃষ্টের পরিহাসে, রীতেনের সঙ্গে মিঃ বোনারের এই সাক্ষাৎকারে একটা নাটক সৃষ্টি হয়ে গেল।

তিন অঙ্কের নাটক হলে, এই পর্যন্তকে ধরা যায়, দুই অঙ্ক। এখানে একটা বিরাম দেওয়া যেতে পারে। শেষ অঙ্কটা কিন্তু যেমনি করুণ, তেমনি বিস্ময়ের!

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে একদিন বাসায় বসে বন্ধু ও আমি নানাকথা নিয়ে আলোচনা করছিলুম। কথায় কথায় বোনার-সাহেবের কথা উঠল। আমি বন্ধুকে বল্‌লুম—ত্থাখ্, দেশের যা কিছু উন্নতির মূলে রয়েছে এই বড়লোক। দেশের ঐশ্বর্য বলতে যা বোঝায়, তা তো বড়লোকেরই কীর্তি। এই তো সেদিন অমুক ঝুনঝুনওয়ালা ঐ হাসপাতালে একলক্ষ টাকা দান করে দিলেন। তাহলেই ত্থাখ্, তোর যত বড় সদিচ্ছাই থাক না কেন, টাকা ছাড়া তো কোনো বড় কাজই করতে পারছিস না, অতএব টাকা—

আমার কথা শেষ না হতেই, বন্ধুটি এমন নৃশংস ভাবে, হাতে-কলমে আমার কথার জবাব দিয়েছিল যে বহুদিন পর্যন্ত আমি তা নিয়ে শোক করেছিলুম। মনে মনে এই বলে আফশোষ করেছিলুম—কি দরকার ছিল বাপু, আমার এই গবেষণা মূলক কথা ব'লবার! বড়লোক থাকুক বা না থাকুক, তাতেই বা

আমার সমূহ ক্ষতি বৃদ্ধি কি হচ্ছিল! কেন যে মরতে ব'ল্তে গিয়েছিলুম!

বন্ধুটি আমার অসমাপ্ত কথার মাঝখানেই বললে—অতএব পণ্ডিত মশাই থাক্। এই সাধারণ কথাটা বুঝতে পারছেন না? তবে শুনুন। আচ্ছা এরা যে টাকাটা দান করে দেশকে কৃতার্থ করে দিচ্ছেন, এই টাকাটা তারা পেলেন কোথায়?

আমি ঝট্ করে বললুম—তা ওরা পেয়েই থাকে। ভাগ্যবানের বোঝা; পরে পরেই বয়ে বেড়ায়। বলে বহুদিন পর আস্ত এক প্যাকেট বিড়ি কিনেছিলুম, সেই প্যাকেটটি হাতে নিয়েছি বিড়ি বার করবার জন্যে—অমনি বন্ধুটি খপ্ করে প্যাকেটটা সুদ্ধ ছিনিয়ে নিয়ে বললে—এই ভাবেই পায়।

আমি বললুম—আহা-হা-ওটা—

বন্ধুটি বললে—আর আহা-হা নয়, এইভাবে মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, ওরা টাকার পাহাড় রচনা করে থাকে। তারপর বুঝে সুঝে একটা মোটা দান করে, একসঙ্গে পুণ্য এবং খ্যাতি দুইই কিনে নেয়।

বলে আমার দিকে একটা বিড়ি ছুড়ে দিয়ে বললে—বুঝলি তো, আমি তোকে একটা বিড়ি দিলুম। মনে রাখিস কিন্তু।

আমি বললুম—আহা ভারি তো দিলি তুই! আমারটা দিয়ে আমাকেই বুঝ দেওয়া, তাও—

বন্ধুটি বললে—তাও সবটা নয়, নিয়েছি এক প্যাকেট আর দিলুম তা থেকে একটা। এই হচ্ছে দান করবার আসল রহস্য, যা নিয়ে নাকি আমরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকি। এই বিড়িটাই যদি তোকে তোর চরম প্রয়োজনে দিতুম? এই ধর, দেশে বিড়ির খুব দুর্ভিক্ষ লেগেছে। কোথাও বিড়ি পাওয়া যায় না। বিড়ি-খেকোরা দলে দলে বিড়ির অভাবে প্রাণত্যাগ করছে। দেশীয় সরকার বিড়ি সমস্যা সম্বন্ধে কোনো সুরাহা করতে পারছেন না।

রাস্তায় রাস্তায় রং-বেরংয়ের ঝাণ্ডা হাতে বিড়ি-খেকোদের মিছিল বেরুচ্ছে। নানাদেশ থেকে বিড়ি সাহায্য আসতে লাগল, এবং তা যাদের হাতে বিতরণের ভার পড়ল, তারাই বারো আনা ব্ল্যাক মার্কেট করে দিয়ে, বাকী চার আনা দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করে, সমাজ সেবার একটা জ্বলন্ত বিজ্ঞাপন দেশের সামনে তুলে ধরল। একটা হৈ হৈ রৈ রৈ মহা হুলুস্থুল কাণ্ড! তখন যদি এই বিড়িটি তোকে দিতুম তবে তুইই আমার জয়গানে গগন পবন মুখরিত করে তুলতিস। বুঝলি তো, দান করে খ্যাতি অর্জন করবার জন্যে এরা আগে থেকেই দান করবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। দেখিসনি, পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষের সময়, লক্ষ লক্ষ মণ চাল গুদামে পচেছে, আর লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেয়ে মরেছে! তবে হ্যাঁ, মরার আগে ঝুন্‌ঝুনওয়ালার লঙ্গরখানায় ডাল চালের লপ্‌সি খেয়ে গেছে, এই যা!

আমি হাসলুম এবং সতৃষ্ণ নয়নে বিড়ি প্যাকেটটির দিকে তাকালুম। ভাবলুম, এবার পুরো প্যাকেটটাই বোধ হয় ফেরত পাব।

এই ভেবে ফেরত চাইতে যাব, এমন সময় দরজার সামনে একখানা বৃহৎ গাড়ী এসে থামল, এবং আমাদের বিস্মিত ও চমকিত করে দিয়ে, সেই ভাবী গাড়ী থেকে ভারী দেহখানা নিয়ে ভোলানাথ-বাবু নেমে সোজাসুজি এসে ঘরে ঢুকলেন।

বন্ধুটি তাঁর দর্শন মাত্রই, বিড়ি প্যাকেটটি তার জামার পকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে, আনন্দে অধীর হয়ে ভোলানাথবাবুকে প্রণাম করল, আমিও করলুম। বন্ধুটি তাঁকে বসাবার জন্যে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভোলানাথবাবু তাকে কোনো অবসর না দিয়েই তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে আমাদের ছেড়া মাদুরটার উপরই তার দেহখানা চাপিয়ে দিলেন।

ব্যক্তিবিশেষের উপস্থিতি যে মনকে এত অনির্বচনীয় আনন্দে

ভরপুর করে দিতে পারে, তা আগে বুঝিনি। ভোলানাথবাবুর আগমনে নিজেকে যেন হঠাৎ নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ, নিরাপদ মনে হতে লাগল। ঐ প্রশস্ত বক্ষ যেন পরম নির্ভরস্থল। ঐ বিরাট পৌরুষের কাছে যেন কোনো অশুভ গ্রহই ঘেঁষতে পারে না।

নিঃসংশয়ে বুঝলুম, এ হচ্ছে সেই ব্যক্তিত্ব, যাঁর কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করা যায়, বা যাঁর সংস্পর্শে এলে আপনা থেকেই আত্মসমর্পণ করে বসতে হয়।

বন্ধুটি বলত—এইরূপ আত্মসমর্পণের ভেতর থেকেই শ্রেয়কে লাভ করা যায়। শুধু তাই নয়, নিজের কর্মক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। যা কিছু গুরুভার, যা কিছু ভাবনা চিন্তা সব সমর্পণ করে, হালকা মনে কাজ করে যাও। বিপদ এলে, রক্ষাকর্তা তো রইলেনই। তাই বোধ হয় গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন—আমার উপর সব কিছু সমর্পণ করে কর্ম করে যাও।

ভোলানাথবাবু বললেন—তোমরা বোধ হয় আজকাল খুবই ব্যস্ত থাকো হে?

বন্ধুটি আমতা আমতা করতে লাগল।

ভোলানাথবাবু বললেন—তা যেও মাঝে মাঝে।

বন্ধুটি আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এই না যাওয়ার জন্যে আমিই দায়ী। সেই পঁচিশটি টাকা ধার চাওয়ার জের।

ভোলানাথবাবু বললেন—আমিও আর সময় পাইনে, আর দেহটারও ছুটোছুটি করবার একটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা আছে তো। যাক, চল হে, একবার ঘুরে আসি।

কোথায় যেতে হবে, কেন যেতে হবে, কোনোরূপ প্রশ্ন না করেই বন্ধুটি চট্ করে প্রস্তুত হয়ে বললে—চলুন।

—আর আমি?

কিন্তু পরক্ষণেই ভোলানাথবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন—ওকি? তুমিও চল।

আমি বললুম—কোথায় ?

ভোলানাথবাবু বললেন—সে এক মজার কাণ্ড! সেই যে মিঠুয়া সিংয়ের মামলার প্রতিপক্ষ ভদ্রলোক, তাঁর বাড়ীতে।

বন্ধুটি সবিস্ময়ে বললে—কেন ?

ভোলানাথবাবু বললেন—ভদ্রলোকের যেন কিরকম একটা পরিবর্তন এসে গেছে। ঐ মামলার কয়েকদিন পরে একদিন বিকেল বেলা ভদ্রলোক এসে হাজির আমার বাড়ীতে। আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে দাদা ডেকে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। জীবনে তিনি মদ তো আর খাবেনই না, উপরন্তু যে শিক্ষা তিনি পেয়েছেন, তাও নাকি জীবনে ভুলবেন না। তোমাদেরও খোঁজ করছিলেন। যাক, আজ তাঁরই জন্মদিন। আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে গেছেন, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে। চল, চল।

গাড়ীতে বসে একটা কথা মনে পড়ে গেল। এক সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে গল্প শুনেছিলুম। তাঁর পার্বত্য গুহা-আশ্রমে, তাঁর চারদিকে নাকি বন্য হিংস্র বাঘ, সিংহ, ভল্লুক, হরিণ,, সাপ, ময়ুর প্রভৃতি একসঙ্গে ঘিরে বসে থাকে।

তাই ভাবলুম—বন্য হিংস্র জন্তু যাঁর সান্নিধ্যে এসে হিংসা ভুলে যায়, তিনিই সত্যিকারের প্রেমিক। ভোলানাথবাবু সম্বন্ধে সেই কথাটি বার বাব প্রয়োগ করতে লাগলুম।

ভোজসভা থেকে প্রচুর আদর আপ্যায়ন লাভ করে এবং তৎসহ গুরু ভোজন সমাধা করে যখন ফিরলুম, তখন রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

আমাদের গলির মুখে ঢুকতে গিয়ে বন্ধুটি হঠাৎ বলে উঠল—দাঁড়া, জামাটায় মাংসের ঝোল লেগেছে, এটাকে অমনি লণ্ড্রীতে দিয়ে আসি। বলে জামাটা খুলে পার্শ্ববর্তী 'প্যারিস্ ধৌতাগারে' জামাটা দিয়ে এল।

বাসায় ফিরে, ভোজসভা এবং ভোলানাথবাবু প্রভৃতির সম্বন্ধে

খুশি মনে গল্পগুজব করছি, হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার বিড়ি প্যাকেটটার কথা। বন্ধুকে বলতেই সে বললে—এই রে! তা তো জামাশুদ্ধ প্যারিসে চলে গেছে! ঐ যাঃ—!

আমি আঁৎকে উঠে বললুম—সে কি রে! বলে তড়াক করে উঠে ছুটলুম প্যারিসের উদ্দেশে। কিন্তু গিয়ে দেখি, প্যারিস বন্ধ হয়ে গেছে। আমার মনটা বড় বিশ্রী হয়ে গেল। আহা-হা! আস্ত এক প্যাকেট বিড়ি!

দোকানের বন্ধ তালাটা ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ক্ষুণ্নমনে বাসায় এলুম। ঘরে ঢুকে দেখি, রীতেন মুখভার করে বসে আছে। বন্ধুটি মাথা নীচু করে কি যেন ভাবছে।

আমি বললুম—কি ব্যাপার রীতেনবাবু? এত রাত্রে?

রীতেন ভারী গলায় বললে—বড়ই দুঃসংবাদ! কাকা মারা গেছেন! এদিকে তাঁর বাক্স থেকে এক উইল বেরিয়েছে, তাতে তিনি আমাকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেছেন। অথচ আমি তো কোনো দিনই এসব কিছু বুঝি না, তাই কি যে করি; মহা ভাবনায় পড়ে গেছি!

বুঝলুম—তাই বন্ধুকে লিগ্যাল এড্‌ভাইসাররূপে পাবার জন্যেই রীতেনের এখানে আগমন। সে যাই হোক—কিন্তু বোনার সাহেবের হঠাৎ কি হল?

আমি রীতেনকে জিজ্ঞেস করলুম—হার্টফেল করলেন নাকি? মানে করোনারি—

রীতেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—না, সুইসাইড্ করেছেন!

পরে এই শোচনীয় ঘটনার কারণ জেনেছি।

মিঃ বোনার সহধর্মিণীরূপে যাকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যেমন সুন্দরী তেমনি বিদুষী, নৃত্যে অদ্বিতীয়া, নাইট ক্লাবে তাঁর চাহিদাই নাকি ছিল সব চেয়ে বেশী। মিঃ বোনারের বন্ধু মিঃ ডাটা,

যদিও সস্ত্রীকই ক্লাবে যেতেন, কিন্তু একটু বাদেই মিসেস বোনারের সঙ্গেই তাঁকে হাস্যপরিহাসে রত থাকতে দেখা যেত। নৃত্য সম্বন্ধে মিঃ ডাটার নাকি একটা স্পেশাল ফেন্সি ছিল।

এদিকে মিসেস ডাটার মধুর ছন্দে পিয়ানো বাজনা নাইট ক্লাবে একটা আনন্দের হিল্লোল তুলত। মিঃ বোনার নাকি পিয়ানোর সুর-ঝঙ্কারকে, অত্যন্ত উঁচুতে স্থান দিতেন। দিন চলতে থাকে।

সে দিন রাত্রে। এক 'বার রেস্তোরার' পাশাপাশি দু'টি ঘরে, দুটি যুগল নরনারীর দেহ, সুরায় এবং সুরে, মায়ায় এবং মোহে ভাসিয়ে, এমন একস্থানে নিয়ে গেল, যেখানে নর ও নারীর দেহ মিশে এক হয়ে যায়, সমাজ ও সংসার, সংস্কার ও নীতিবোধ সব অতলে তলিয়ে যায়, শুধু জেগে থাকে একটি অনুভূতি, নর এবং নারীর হৃদয়ের অত্যুগ্র কামনা ও সম্ভোগ।

কিন্তু সব জিনিসেরই শেষ আছে। উত্তেজনার পর আছে অবসাদ।

উভয় ঘর থেকে উভয় যুগল বের হয়েই পরস্পরকে দেখে হতবাক্ হয়ে গেলেন।

যে যত বেশী উচ্ছৃঙ্খল, সে তত বেশী সন্দিহান, তত বেশী অসহায়।

প্রগতির নামে যে যত বেশী স্বৈরাচারী হয়, সে তত বেশী থাকে সংস্কারাচ্ছন্ন। তাই অপরের স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে নরনারীর হৃদয়ের স্বাভাবিক দাবী ব'লে সাফাই গাইলেও, নিজের স্ত্রীকে অপরের সঙ্গে দেখলে মুহূর্তে দিক্‌বিদিক্ হারিয়ে ফেলে।

অতএব মিঃ বোনারের রিভল্‌বার উদ্যত হ'ল মিঃ ডাটার প্রতি।

মুহূর্তে মিঃ ডাটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে, মিসেস বোনার বললেন—সাবধান! খুন যদি করতেই হয় তবে প্রত্যেককে প্রত্যেকের খুন করা উচিত। কিন্তু সুরা-উন্মত্ত বোনারের রিভল্‌বার এ প্রস্তাবে থামল না। এক ঝলক্ আগুন উদ্গীরণ করে তা গর্জে উঠল।

মিসেস বোনার, সেই নিক্ষিপ্ত গুলি নিজ বুকে গ্রহণ ক'রে, দয়িতকে রক্ষা করলেন।

মিঃ ডাটাও এর প্রত্যুত্তর দিলেন। কিন্তু মিসেস ডাটা নিজ প্রাণ বিনিময়ে রক্ষা করতে চাইলেন প্রণয়ীকে।

এবার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু মিঃ বোনার এবং মিঃ ডাটা। দুই বন্ধু। বহুদিনের অন্তরঙ্গ। লোকজন ছুটে আসবার পূর্বেই মিঃ বোনারের রিভল্‌বার পুনরায় গর্জে উঠল। মিঃ ডাটা, মিঃ বোনারের ক্ষিপ্রতার কাছে হার মানলেন। তাঁর প্রাণহীন দেহ মেঝেতে লুটিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ বোনার ছুটে বের হ'য়ে গেলেন।

পরদিন রেল-লাইনে মিঃ বোনারের দেহ পাওয়া গেল, অত্যন্ত বিকৃত ভাবে! যন্ত্রদানব তার দানবীয় নিষ্পেষণে বোনারকে দুম্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে বীভৎস করে রেখে গেছে!

যে প্রাণকে কেন্দ্র ক'রে এই দেহ, যে দেহকে কেন্দ্র করে এই বিশ্ব-সংসারের রূপ রস গন্ধের সৃষ্টি, সেই দেহের কি শোচনীয় পরিণতি!

নিঃশ্বাস ছেড়ে, বাড়ীর দরজায় লাগানো পিতলের ফলকখানার দিকে চেয়ে আবার পড়লুম—'মিঃ বোনার!'

ভাবলুম, ও তো শুধু মাত্র কয়েকটা অক্ষর নয়, ওর ভেতর লুকিয়ে আছে একটা গোটা ইতিহাস। একটা প্রশ্ন হঠাৎ আমার মনে জেগে উঠল।

—আচ্ছা, মিঃ বোনার জীবনে কী পেলেন আর আমিই বা কী হারালুম?

দেখলুম, বোনারের চেয়ে আমিই ভাগ্যবান। জীবনে এই প্রথম নিজেকে ভাগ্যবান মনে হওয়ায়, খুশি মনে একটা বিড়ি ধরিয়ে রাস্তা ধরলুম।

নাঃ, জোট বেঁধে যেন আজ সকলে এই পথেই আসছে।

ঐ যে মেয়েটি দামী শাড়ী আর দামী অলঙ্কারের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে যাচ্ছে, ওর নাম পূর্ণিমা।

পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাবের দিনকে বলে পূর্ণিমা। নির্মেঘ আকাশে তার রূপের দিকে তাকালে, একটা স্বপ্নময় আবেশের সৃষ্টি হয়। যা কিছু স্নিগ্ধ, যা কিছু শ্যামল, চোখ শুধু তাকেই খুঁজে বেড়ায়, সেইখানেই সে শান্তির নীড় বাঁধতে চায়।

কিন্তু প্রখরতারও একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। সে জোর ক'রে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে নেয়। তাই আমরা প্রখর সূর্যের উগ্ররূপের দিকে তাকাই। কিন্তু চোখ করে বারে বারে বিদ্রোহ। তাই সে সম্পূর্ণ খুলতে চায় না ; অবাধ্য ছেলে যেমন, ঘাড় বাঁকা ক'রে, রসকসহীন কঠিন অঙ্ক ক'ষতে বসে, চোখও তেমনি নিজেকে সঙ্কুচিত করে তার অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

সূর্য অহঙ্কারী, সে আবেদন করে না, তার বিধান জোর করে ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। সে ঐশ্বর্যের অধিকারী, তাই সে উদ্ধত।

চন্দ্র প্রেমময়, তার আবেদন প্রেমের দাবীতে। সে জানে, যা কিছু সম্পদ তার আছে, এ তার নিজস্ব নয়। তাই সে স্নিগ্ধ, কোমল, সংবেদনশীল, তাই সে সকলের প্রিয়। সে মাধুর্যের অধিকারী, তাই সে নম্র।

বন্ধুটি তাই ঐ মেয়েটির প্রসঙ্গে একদিন বলেছিল—ওর নাম পূর্ণিমা না হয়ে, মধ্যাহ্ন মার্তণ্ড হওয়াই উচিত ছিল। ওর রূপ তো নয় যেন আগুনের শিখা! ওর জৌলুস দেখে যে কাছে যাবে, তাকেই পুড়ে মরতে হবে! কিন্তু আমি বলেছিলুম—উহুঁ, তোমার উপমাটা ভুল হ'ল। বরঞ্চ ওকে একটি উল্কাপিণ্ড বলা চলে। বায়ুর সংস্পর্শে এলেই ও জ্বলে ওঠে। তারপর নিজের চোখ-ঝলসানো রূপের আগুনে নিজেই শেষ পর্যন্ত জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়!

আমার কথাই ঠিক হ'ল, পূর্ণিমা এখন এক মুঠো ছাই ছাড়া আর কিছুই নয়। কেন—তাই বলছি।

বন্ধুটির একসময় ওদের বাড়ী যাওয়া আসা ছিল। পূর্ণিমার

মাকে বন্ধুটি ডাকত পিসীমা। কি সুবাদে যে পিসীমা ডাকত তা অবশ্য জানি না, তবে সঙ্গে আমিও গলা ছেড়ে পিসীমা বলে ডাকতুম।

বন্ধুটি যেখানে আমিও সেখানে। আমার ধারণা, বন্ধুটির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আশ্চর্যবোধক চিহ্নের নীচের ফুটকির মত। আমি থাকলে লোকে বিরক্ত হ'ত, ঘৃণাসূচক শব্দ করত, কিন্তু বন্ধুটির সঙ্গে আমি না থাকলেও লোকে আশ্চর্য হ'ত। কারণ বন্ধুটি তখন একটি দাড়িতে পরিণত হ'ত, তার গতি যেত থেমে।

অতএব পূর্ণিমাদের বাড়ীতে যথারীতি আমিও যাতায়াত ক'রতুম। কখনো একক, কখনো বা সবান্ধবে।

সেই সময় আর একটি ছেলেও ওখানে আসত। তার নাম যতদূর মনে পড়ে সুকান্ত। সু-কান্তি তার ছিল এবং সাংসারিক জীবনে স্ত্রীর পক্ষে সে হয়ত সুকান্তই হ'তে পারত। আই. এ. পাশ, মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী। দশটা পাঁচটা অফিস অন্তে, পূর্ণিমার গানের আসরে যোগদান। এই ছিল তার প্রাত্যহিক কর্মপদ্ধতি, এবং সে-ই ছিল আসরের একমাত্র মনে প্রাণে শ্রোতা।

তার মুগ্ধ এবং বাঁধনহীন চোখের দিকে চেয়ে আমি বন্ধুকে একদিন বলেছিলুম—হয়ত সুকান্তকে রাঁচি পাঠাবার আশু প্রয়োজন হ'তে পারে।

কিন্তু আমার সেদিনকার সেই রহস্যচ্ছলের কথাটা যে এমনি করে মর্মান্তিক সত্যে পরিণত হবে, তা কি আগে জানতুম! সত্যই সুকান্ত আজ রাঁচিতে! প্রেমোন্মত্ত যুবকের শোচনীয় পরিণতি!

ঘড়ি দেখে, দশটা পাঁচটার ভেতর যে মূল্যবান জীবনটাকে ঠেসে প্যাক্ ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল, তার অভাবে জগতের হয়ত বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না, কিন্তু সুকান্তর দিক দিয়ে যে ক্ষতি হ'ল, তার তো কোনো পরিমাপই হয় না। ক্ষয়-ক্ষতি তো শুধু সুকান্তর

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তার উপর নির্ভর করত তার বিধবা মা, ছুটো বোন এবং তিনটে ছোট ভাইর এক বিরাট সংসার।

স্তাবক না থাকলে অহঙ্কারী হওয়া যায় না। অতএব সুকান্ত আসত যেত, গান শুনত। এতে না ছিল পূর্ণিমার আপত্তি, না ছিল তার মায়ের।

আর পূর্ণিমার এক সাইজ অন্তর ছোট বোন পাঁচটির ভাল লাগত—সুকান্তর রক্ত-জল-করা টাকায় লজেন্স বিস্কুট খেতে পেয়ে!

স্থানকালপাত্র বিস্মৃত না হলে উন্মত্ত হওয়া যায় না। সুকান্তরও একদিন তাই হল। এতদিন যে ভাব তার চোখ দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল, একদিন সন্ধ্যার আবছা আলোতে তা ভাষায় প্রকাশ করে ফেলল। পূর্ণিমা তাকে বেশী কিছু না বলে শুধু ধীর ভাবে বলেছিল—নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে নিজের সচেতন থাকা উচিত ছিল! যাক্, আশা করি এর পর আমাকে রূঢ় কিছু বলতে বাধ্য করবেন না। পাগলামোর যেন এইখানেই শেষ হয়।

সুকান্তর বুকভরা প্রেম শুধু পাগলামি ছাড়া কিছুই নয়! সুকান্ত এই আঘাত সহ্য করতে পারল না। তার এই পাগলামি মগজকে অধিকার করে বসল, এবং রাঁচির পাগলা গারদেই তার উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট হল। সুকান্ত পর্বের এইখানেই সমাপ্তি।

বন্ধু ওদের বাড়ী যেত শুধু ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সত্যই বন্ধুটি ওর মাকে শ্রদ্ধা করত এবং পূর্ণিমার মাও বন্ধুকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তাই শুধু পিসীমার সঙ্গেই দেখা করে চলে আসত। কালেভদ্রে ছু' একদিন পূর্ণিমার গানের আসরে উঁকি মারত। কিন্তু সুকান্তর ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবার পর থেকে, কেন জানি না বন্ধুটি পূর্ণিমাকে ছু'চক্ষে দেখতে পারত না।

এই প্রসঙ্গে বন্ধুটি একদিন বলেছিল,—পাঁজিতে দিনক্ষণ দেখে কোষ্ঠী ঠিকুজি মিলিয়ে বা রূপ অথবা রূপো দেখে যারা প্রেম

করে, আসলে সেটা প্রেম নয়, প্রেমের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা। প্রেম তো, উচ্ছৃঙ্খল হতে কখনো দেয় না, প্রেম মানুষকে করে সংযত, করে সংহত। প্রেম মানুষকে দেয় প্রেরণা, দেয় প্রাণ প্রাচুর্য। প্রেম শেখায় ত্যাগ, ভোগ নয়। এর প্রমাণ তো একটু চোখ চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়। কত ধনীর মেয়ে স্বেচ্ছায় হয় দরিদ্রের ঘরণী, সম্রাট অবহেলে ছেড়ে দেয় তার সিংহাসন। কত বড় ঐশ্বর্যের আকর্ষণ হলে এত বড় ত্যাগ সম্ভব হয়। খাঁটি প্রেমের আসন হর্ম্যশিখরে নয়, তার আসন পাতা হৃদয়ে। এই প্রেমের জন্যে চাই তপস্যা, কঠোর তপস্যা, উমা যেমন তপস্যা করেছিলেন শিবের। সুকান্তও ছিল সেইরকম একজন প্রেমিক তাপস। সে ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু তার তপস্যায় কোনো ফাঁকি ছিল না। তাকে বলা যেতে পারে প্রত্যাখ্যাত ভাগ্যহত প্রেমিক।

বন্ধুর জীবনে খাঁটি প্রেমের অভিব্যক্তি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাই সুকান্তকে উপলক্ষ্য করে যেন নিজের জীবনটাই বলে গেল।

পূর্ণিমার প্রসঙ্গে বন্ধুটি বলেছিল, স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার রূপ। এতে যেমন সে নিজেও অনাবিল আনন্দ পায় না, অপরকেও পেতে দেয় না। তার সবসময়ই একটা খেদ থাকে। আমার এত রূপ বুঝি বৃথাই গেল!

সেই পূর্ণিমার একদিন মহাসমারোহে বিয়ে হয়ে গেল। স্বামী একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কন্ট্রাকটর। অতএব তাঁর ছুটোছুটির বিরাম নেই। তাছাড়া আজ এ মিনিস্টার, কাল অমুক কোম্পানীর ম্যানেজারের পার্টিতে যোগদান প্রভৃতি কাজে তাঁকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। বিশেষ বিশেষ জায়গায় পূর্ণিমারও যেতে হয়, না গেলে চলে না।

কোনো কোনো দিন এমনও হয়েছে, হয়ত বা উঁচু দরের কোনো কেষ্ট-বিষ্টুর বাগান-বাড়ীর সান্ধ্য আসরে যোগদান করতে গেল, সঙ্গে গেল সঙ্গিনী স্ত্রী। নাচ গানের অবসরে স্বামী বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে। শুধু বলে গেল, বিশেষ জরুরী কাজে যাচ্ছি, এসে

তোমায় নিয়ে যাব। স্বামীর আর সে রাত্রে দেখা পাওয়া যায় না, পূর্ণিমার রাত কাটাতে হয় সেই বাগান-বাড়ীর প্রমোদশালায়। এইরকম এক একটি রাত্রি আসে আর যায়, স্বামী তার তর্‌তর্‌ করে উন্নতির সোপান বেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর ধাপে উঠে যায়।

কিন্তু ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া আছে। একদিন পূর্ণিমার ভেতরও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। স্বামী ব'ললে—ঘরের লক্ষ্মীদের উপরই আজকালকার নারায়ণদের লোভ বেশী তাই এতে যেমন সহজে কাজ আদায় হয়, অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভব হয় না। তুমিও যা আছ, আমিও তাই আছি বা থাকব। মাঝ থেকে—তার উপর বহু দূর এগিয়েছি, আর ফেরবার উপায় নেই, এই উত্তেজনার মাঝেই মরে যেতে চাই, অতএব—

পূর্ণিমা দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে ব'ললে—না!

স্বামী অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে ব'ললে—বেশ, তাহলে দরজা খোলাই রইল, যে কোনো সময় চলে যেতে পার। ধরে রাখব না। যেখানেই থাকো 'খোরপোস' পাবে। তবে যাবার আগে তোমার জেনে যাওয়া ভাল যে স্ত্রীর পরিচয়ে তুমিই শুধু একা নও, এরকম আরও তিনজন আমার আছে। প্রয়োজন হ'লে আরও তিনটে—বলে হাসল।

স্বামীটি বলে যেতে লাগল—বাংলা দেশে যখন মেয়ের অভাব নেই, বুঝতেই ত পারছ। তাছাড়া বিয়ে আমি কাউকেই করিনি। কয়েকটা স্ত্রী পাবার জন্যে বিয়ের নামে ছল করেছি মাত্র। আমার প্রয়োজন স্ত্রীদেহ নয়, যাদের তা প্রয়োজন সেই সব মাংসাশী জন্তুদের স্ত্রীদেহ উপঢৌকন দিয়ে বিনিময়ে আমি আদায় করি অর্থ, প্রতিপত্তি। এটাই আমার উন্মত্ত নেশা। বলে হুইস্কীর বোতলটা ঢেলে দিল গলার ভেতর ঢক্‌ঢক্‌ করে। পূর্ণিমা কাঁপতে লাগল ঠক্‌ ঠক্‌ করে, রাগে, দুঃখে, অপমানে, নিজ কলুষিত দেহের প্রতি চেয়ে—ঘৃণায়!

পূর্ণিমার এই আত্মসচেতনতা কি করে জাগল—যার ফলে সে এমন করে বিদ্রোহ করে বসল? সেই কারণটা এখানে বলা দরকার।

পূর্ণিমাদের মাধ্যমেই শ্যামলবাবুর পরিবারের সঙ্গে বন্ধু ও আমি পরিচিত হয়েছিলুম। শ্যামলবাবু, পূর্ণিমার বাপের বাড়ীর প্রতিবেশী। তিনি করেন সরকারী কোনো এক দপ্তরে চাকরী। পোষ্য বহু। অতএব তাব আয়, ব্যয়ের পক্ষে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাই বিলাসিতার ভেতর দিনের আহার্য যোগাবার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা এবং কোনোমতে টানাহ্যাঁচড়া করে চব্বিশটি ঘণ্টাকে পার করে দেওয়া।

আলাপে ব্যবহারে ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র এবং অমায়িক।

শ্যামলবাবুর বর্ণনা যদিওবা দেওয়া সম্ভব হল কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কথা লেখায় বা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কতটুকুই বা বলতে বা লিখতে পারব? নারীর অমন কল্যাণী মূর্তি ক'টাই বা দেখতে পাওয়া যায়?

রূপ তার কেমন ছিল, তা নিয়ে আমরা কোনো দিন মাথা ঘামাইনি। আমরা শুধু তার একটি রূপই দেখেছি, শুধু দেখিনি, মুগ্ধ হয়েছি। এ হল সেই রূপ, যে রূপ দেখে কবি বন্দনা গীতি রচেছেন, যে রূপের কল্পনা নিয়ে জগদ্ধাত্রী মূর্তি তৈরী হয়েছে, যে রূপের কল্পনা নিয়ে সীতা সাবিত্রীর উপাখ্যান রচিত হয়েছে।

বিচারে ছিল তাঁর সূক্ষ্মবোধ, বুদ্ধিতে বিচক্ষণ, দানে মুক্তহস্ত, সহিষ্ণুতায় বসুমতী, করুণায় মাতৃমূর্তি, দাম্পত্য প্রেমে আদর্শ, ব্যক্তিত্বে হিমালয়ের মত দৃঢ়।

অথচ বয়সই বা তাঁর কত! মাত্র সাতাশ কি আটাশ।

গড়ন দোহারা, শিক্ষায় আই-এ পর্যন্ত। কিন্তু এই বয়সে এত সব গুণের সমাবেশ সম্ভব হল কি করে?

বন্ধুটি বলত—এ ওঁর জন্মগত অধিকার।

যে বয়সে প্রসাধনের উপর স্ত্রীলোকের বেশী মোহ থাকে, সেই বয়সেই তিনি বাবার বাড়ীর দেওয়া গয়নাগুলো একে একে বিক্রী করে সংসার চালিয়েছেন। তাঁর হাতে অবশিষ্ট ছিল মাত্র দু'গাছা বালা।

বন্ধুটি বলেছিল—ঐ নিরাভরণা মূর্তিই ওঁকে সুষ্ঠু রূপ দিয়েছে। ওঁর অঙ্গে অলঙ্কার অত্যন্ত বেমানান, ওঁর সৌন্দর্যের অপমান।

বাপের বাড়ীর অবস্থা বিরাট। শুধু তাই নয়। সাত ভাইএর মধ্যে বৌদিই একমাত্র আদুরে বোন ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর বাপের বাড়ী মাত্র একবারই তিনি গিয়েছিলেন। আর নয়, পাছে স্বামীর কোনোরূপ হেনস্থা হয়, এই ভয়ে।

বন্ধুর সঙ্গে আমিও তাঁকে বৌদি বলে ডাকতুম। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল, যে পূর্ণিমাদের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলেও ওঁরাই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠল বেশী, পূর্ণিমারা গেল ক্রমে ক্রমে চাপা পড়ে।

আমরা যখন-তখন বৌদির ওখানে গিয়ে হানা দিতুম। একদিন সন্ধ্যার পর, বন্ধু ও আমি গিয়ে উপস্থিত। বৌদিকে সাধারণতঃ তখন রান্নাঘরেই পাবার কথা। কিন্তু সেখানে তাঁকে না পেয়ে, তাঁর একটি ছোট্ট ননদ মারফত জানলুম, বৌদি তখন শ্যামলদার সঙ্গে শোবার ঘরে।

বন্ধু ও আমি সেইদিকে চললুম। কয়েক পা যেতেই বন্ধুটির বুদ্ধি ঘটে এল। সে আমার জামার খুঁট ধরে টান দিল।

আমি বললুম—কি রে ?

সে চাপা স্বরে বললে—যাস্‌নি !

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম—কেন ?

বন্ধুটি বললে—তুই একটি গাধা।

আমি প্রতিবাদ করে বললুম—মোটেই না। বলে এগিয়ে চললুম।

বন্ধুটি বললে—হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হ'লে, তাঁরা বিব্রত হ'য়ে পড়তে পারেন, বুঝিস তো স্বামী-স্ত্রীর সান্ধ্য মিলন! আমার কৌতূহল আরও তীব্র হ'য়ে উঠল। বললুম—সেইটিই তো দেখবার।

বলে দ্রুত অথচ নিঃশব্দে অগ্রসর হ'য়ে তাঁদের শোবার ঘরের জানালার পাশে গিয়ে উঁকি মেরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

দেখলুম—শ্যামলদার বুকের মধ্যে বৌদি মাথা গুঁজে দাঁড়ানো। শ্যামলদা তাঁকে এক হাতে ধরে, আর হাতে মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

প্রেমের মাধুর্য আছে, এবং মিলনেই যে একমাত্র তার অভিব্যক্তি হয়, তাই প্রত্যক্ষ করলুম।

মগ্ন হ'য়ে গেলুম, হঠাৎ পিঠের উপর পড়ল 'দুম্' করে এক কিল! 'উঃ' বলে পিছন ফিরে দেখি, বন্ধুটি যাকে বলে অনলবর্ষী চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে—'ননসেন্স্ !'

এদিকে কিলের শব্দে দম্পতীরা সচকিত হ'য়ে উঠলেন। পরস্পর পরস্পরকে অপ্রতিভ ভাবে ছেড়ে দিলেন। বৌদি জানালার ধারে এসে হেসে বললেন—কে ?

বন্ধুর মুষ্ট্যাঘাতের ব্যথায় এবং লজ্জায় আমার গলা দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ বের হ'য়ে এল। বললুম—আমি।

বৌদি হেসে বললেন—ঠাকুরপো ! তোমরা ? এস এস ভেতরে এস।

অগত্যা ভেতরে গিয়ে বসলুম। শ্যামলদা হেসে বললেন—বুঝলে, এরা হ'ল ছিঁচকে চোর, লুকিয়ে চুরিয়ে আসে। এদের শাস্তি হওয়া উচিত। বলে বেরিয়ে গেলেন। আমি যুৎসই হ'য়ে বিছানার উপর চেপে বসলুম। বন্ধুটি বললে—বুঝলে বৌদি, এটা এমন গাধা—

আমি প্রতিবাদ করে ব'ল্লুম—গাধা কক্ষণো নয়। কেন, আমরা

কি ঘরে রাধাকৃষ্ণের ছবি পরম শ্রদ্ধাভরে রাখি না ? তবে ওটা ছবি, আর এটা বাস্তব, এই যা। মূলে একই।

বন্ধুটি বৌদির দিকে চেয়ে বল্‌লে—আচ্ছা বৌদি, একটা সত্য কথা ব'ল্‌বে ?

বৌদি হেসে ব'ল্‌লেন—বল।

বন্ধুটি ব'ল্‌লে—তোমাদের উভয়ের সত্তা কি এক হ'য়ে গেছে ?

বৌদি একটু হাসলেন।

বন্ধু ব'ল্‌লে—না, না, বল ; এটা আমার নিছক কৌতূহল নয়, এটা আমার জানা প্রয়োজন। তোমাদের মিলন-কুঞ্জের বেড়া কি এতই উঁচু, যে তা ডিঙিয়ে বাইরের কোনো আবিলতা এসে, পরম মুহূর্তগুলোকে কি বিষাক্ত ক'রে দেয় না ?

বৌদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ব'ল্‌লেন—ঠাকুরপো, কিছু রেখে কিছু ঢেকে দেওয়াকে যেমন সম্পূর্ণ দেওয়া বলে না, তেমনি কিছু ফেলে কিছু রেখে পাওয়াকেও একান্তভাবে পাওয়া বলে না। জগতে সব জিনিসেই ভেজাল চলে, কিন্তু এখানে কোন ভেজাল চ'লবে না। কৃত্রিমতার আশ্রয় কিছু নিয়েছ কি ধরা পড়ে যাবে। জান তো, মাল-মসল্লায় ফাঁকি দিলে অট্টালিকা দু'দিনেই ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে কেনো ফাঁকি ছিল না, তাই তাঁদের ছবি আজও ঘরে ঘরে। চণ্ডীদাস-রামীর ভেতর কোনো কৃত্রিমতা ছিল না, তাই তাঁদের গাথা আজও মুখে মুখে। প্রেম হ'চ্ছে অত্যন্ত কুলীন, দোষ স্পর্শ করা মাত্র ভঙ্গ হয়ে যায়। দুধ যেমন সামান্য টকের সংস্পর্শে এলেই নষ্ট হয়ে যায়।

বন্ধুটি ব'ললে—আচ্ছা,—অভাব, দারিদ্র্য, সাংসারিক দুশ্চিন্তা—এসবও কি মনে তখন স্থান পায় না ?

বৌদি ব'ল্‌লেন—আমাদের চারিদিকে ঘিরে র'য়েছে, নানাবিধ সমস্যা। এর ভেতর এমন কতকগুলো সমস্যা থাকে, যার কোনো সমাধানই নেই। এই সব সমাধানহীন সমস্যার প্রতিক্রিয়া

মানুষের মস্তিষ্ককে সর্বদাই উত্তপ্ত করে রাখে। এ যেন অনন্ত জীবন কারাবাসের মেয়াদ। পিছনে দাঁড়িয়ে উদ্যত কশা হাতে, ভীষণদর্শন প্রহরী। সে শুধু সপাসপ্ সর্বক্ষণ কশাঘাত করেই চলেছে। পালাবার পথ নেই, এর হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। এ কোনো কাকুতি শুনবে না, অনুরোধ রাখবে না, ক্ষমা করবে না, কাতরতার প্রত্যুত্তরে শুধু দাঁত বের করে অট্টহাসি হাসবে। মাত্র রাত্রিটুকুর জন্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা। কিন্তু রাতের ঘুমটুকু পর্যন্ত বারে বারে বিঘ্নিত হয়, প্রহরীর বীভৎস রূপের স্বপ্ন দেখে। এর ভেতর একটু সময়, একটা নির্ভরযোগ্য স্থল রাখা প্রয়োজন, যেখানে সে ক্ষণিকের জন্যেও মাথা গুঁজে থাকতে পারে। বাইরের আবিলতা এসে, যাতে পঙ্কিল করে না দিতে পারে, তার জন্যে সেই জায়গাটাকে শক্ত বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা উচিত। এটা শুধু বিলাস নয়, এটা প্রয়োজন। এটাই হচ্ছে পরম আশ্রয়স্থল। যার এটা আছে, সে অন্ততঃ কিছুদিন বেশী বাঁচে। যার নেই, হয় সে মরে, না হয় পাগল হয়ে যায়।

বৌদি একটু চুপ করে থেকে বললেন—আচ্ছা বলতে পার, লোকে কেন লাইন দিয়ে টিকিট কিনে সিনেমা দেখে? কেন রাস্তায় বাঁদর-নাচ মগ্ন হ'য়ে দেখে? শুধু ক্ষণিকের জন্যে মুক্তি পাবার জন্যে। অন্তরাত্মা চায় শান্তি, চায় আনন্দ। অথচ প্রতিকূল পরিবেশের জন্যে আত্মা থাকে সদাই বঞ্চিত। তাই সিনেমা বা বাঁদর-নাচ দেখে আত্মাকে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। এতে ক্ষয়ে-যাওয়া আয়ুর কিছুটা পূরণ হয় বৈ কি! সেদিন পাড়ার ছেলেরা এসেছিল থিয়েটারের চাঁদা নিতে। পাশের বাড়ী থেকে চাঁদা তো দিলই না, উপরন্তু এই দুর্দিনে যেখানে লোকে না খেতে পেয়ে মরছে, সেখানে সখের থিয়েটার করে অর্থ ব্যয় করার যে কোনো অর্থ হয় না, সেটা বিশদ-ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আমি তাদের ডেকে চাঁদা দিয়ে দিলুম। কেন দিলুম জান? এই দুর্দিন এসেছে

বলেই তো আনন্দের প্রয়োজন বেশী। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দই হচ্ছে, প্রাণশক্তির পরিচয়। সেটার যেখানে অভাব, সেখানে ধার করা ছাড়া উপায় কি? দেখছ না, দেহে ভিটামিনের অভাব হলে, ডাক্তাররা ভিটামিন ইন্‌জেক্‌শন্ করে সেই অভাব পূরণ করেন। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হবে তো? অন্ততঃ বাচবার চেষ্টা তো করতে হবে? আচ্ছা বলতে পার, লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে আজ হাসি নেই কেন? কে এই জন্য দায়ী? কবে হাসি ফুটবে?

বলতে বলতে বৌদি যেন অন্য লোকে চলে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল এক বিদ্রোহিনীর রূপ। আমরা স্তব্ধ বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম তাঁর দিকে। কিছু পরে তার সম্বিৎ ফিরে এল, এবং মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে আবহাওয়াটাকে সহজ করবার জন্যে আমার দিকে ফিরে বললেন—কি ঠাকুর-পো, তুমি যে শুধু চুপ করেই রইলে? বলছ না যে কিছু?

আমি বললুম—মুখ আর কান দু'টোর কাজ তো এক সঙ্গে হয় না বৌদি। মুখ খুললেই কান বন্ধ করতে হয়, কান খুললেই মুখ বন্ধ করতে হয়। তারপর মুখ থাকলেই যা কিছু আবোল তাবোল বলা যায়, কিন্তু কান থাকলেই সব সময় কিছু ভাল কথা শোনা যায় না। অতএব এখন আমি শুনব এবং সঞ্চয় করে রাখব। তুমি বল।

বন্ধু বললে—হ্যাঁ, ও তো এখন শুনছে না, গরুর মত গিলছে, তারপর ধীরে সুস্থে জাবর কাটবে।

বৌদি হেসে বললেন—তাই নাকি ঠাকুরপো! তবে খাবার সময় একসঙ্গে সব কিছু খেও না। তাল গোল পাকিয়ে যাবে। কারণ ভাল হোক মন্দ হোক সব জিনিসেরই একটা আলাদা আলাদা স্বাদ আছে, একটা আলাদা আলাদা ক্রিয়া আছে।

আমি একটা হাই তুলে বললুম—বৌদি, এখন কিন্তু আমি মুখ খুলব।

বৌদি বললেন—বেশ, বল।

আমি বললুম—কিছু খাব।

বন্ধু বললে—গাধা কোথাকার।

বৌদি হেসে বললেন—বেশ তো বস। বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

আমিও বন্ধুর দিকে চেয়ে, ওখানে থাকাটা নিরাপদ নয় মনে করে বৌদির পদাঙ্ক অনুসরণ করে সোজা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

কিছুদিন পর একদিন সারাটা দিন টিপি টিপি বর্ষায়, মনটা একেবারে ঢ্যাব্‌ঢ্যাবে হ'য়ে ছিল। বন্ধুটির অবশ্য কাব্য প্রেরণা জেগেছিল। কিন্তু আমি একদম বেকার ছিলুম। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা একটু ধরতেই, বন্ধুটিকে সাজগোজ করতে দেখে আমিও তৈরী হয়ে নিলুম। বন্ধুটি আমার দিকে চেয়ে বললে—কোথায় যাবি ?

আমি বললুম—তুই ?

বন্ধুটি বললে—আমি যেখানেই যাই তোকে যে সঙ্গে নেব না, এটা অন্ততঃ ঠিক।

আমি বললুম—আমাকে সঙ্গে নেবার তোমার দরকারই নেই। আমার হাত পা আছে। দিব্যি তোমার পেছন পেছন হেঁটে যেতে পারব। পেছনের দিকে ল্যাং ছুড়লে, টুক্ করে তোমার কাঁধে চেপে বসব।

আমরা যখন বৌদির ওখানে গিয়ে হাজির হলুম, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঘরে ঢুকে দেখি, বৌদি চুপ করে ব'সে আছেন। মুখ গম্ভীর।

বুঝলুম একটা কিছু হয়েছে। বন্ধুটি সভয়ে জিজ্ঞেস করলে—কি ব্যাপার, অমন চুপচাপ যে ?

বৌদি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—বস তোমরা। বন্ধুটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে বৌদি ?

বৌদি তেমনি ভাবে বললেন—দারিদ্র্যটা এমন একটা অভিশাপ, যে লুকিয়ে থেকেও তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

বন্ধুটি বললে—কি হয়েছে খুলেই বল না ?

বৌদি বললেন—আজ ও-বাড়ীর পূর্ণিমা এসেছিল, এসেছিল তার সমস্ত গয়নাগুলো পরে, আপাদমস্তক সোনা দিয়ে মুড়ে।

বন্ধুটি রুদ্ধশ্বাসে বললে—তারপর ?

বৌদি বললেন—এসেছিল আমাকে দেখতে কি দেখাতে, ঠিক বুঝলুম না। এসেই দু'এক কথার পরই আমাকে প্রশ্ন করল আমার হাত খালি কেন। আমি বললুম গয়না নেই। সে বিশ্বাস করল না। তার ধারণা, ক্ষয় হবে বলে কৃপণতা করে গয়না বাক্সে তুলে রেখেছি। যখন তাকে সত্যই বিশ্বাস করাতে পারলুম, যে সংসারের এতগুলো পোষ্যির খাওয়া পরা যুগিয়ে গয়না পরা সম্ভব নয়, তখন সে আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ স্ত্রীর স্বামী আছে, অথচ স্ত্রীর গায়ে গয়না নেই বা স্ত্রী গয়না আদায় করে নেয় না, এ তার কাছে নেহাতই রূপকথার মত শোনাল। তারপর উপদেশ যা দিলে, তা সবটা নাই বা শুনলে। শুধু তার সারমর্ম হল এই যে এর পরেও তোমার দাদার প্রতি স্বামী হিসাবে ভক্তি করা বা ভালবাসাকে, সে নিতান্তই হাস্যকর বলে মনে করে। তার বিচারে আমি একটি অপদার্থ।

পূর্ণিমার তখন স্ত্রী-জীবনের স্বর্ণযুগ চলছে। আমরা গুম হয়ে রইলুম।

বৌদি বললেন—সত্যি বলছি ঠাকুরপো, অর্থাভাব আমাদের দুঃখ দিলেও লজ্জা দেয় না। কারণ দারিদ্র্যটা তো আর আমাদের সৃষ্টি নয়। একটা লোক সারা দিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও যদি দিনান্তে বেঁচে থাকার মত আহার্য যোগাতে না পারে, সে

জন্যে কি সে দায়ী? কিন্তু আমি ভয় করি শুধু একটি জিনিসকে— যার জন্যে আমি বাবার বাড়ী যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। সেটা হল পাছে তোমার দাদাকে কেউ হেনস্থা করে বা আমাকে কেউ করুণার চোখে দেখে।

বলতে বলতে বৌদির চোখের পাতা দুটো ভিজে এল। সেদিনের সান্ধ্য-আসর আর আমাদের জমল না।

তারপর বহুদিন আর ওদিকে যাওয়া হয়নি। একদিন বৌদির একখানা ছোট্ট চিঠি এসে হাজির। সংবাদ সংক্ষিপ্ত। 'দাদার অসুখ, আমরা যেন গিয়ে একবার দেখে আসি।'

হন্তদন্ত হয়ে দুই বন্ধুতে মিলে যখন উপস্থিত হ'লুম, তখন সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি, শ্যামলদার রোগশয্যা-পাশে অবিচলিত ভাবে বসে শুশ্রূষা করছেন বৌদি। চোখে মুখে বহু রাত-জাগার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ঘরে তখনো আলো জ্বালা হয়নি। সূর্যের রক্তিম অস্তরাগ জানালা দিয়ে এসে বৌদির মুখের উপর পড়েছে। সেই আভায় বৌদির মুখখানাকে এমন অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেখাচ্ছিল যে, আমার মত অ-কবি মনেও তাঁর প্রশস্তি গীতি রচনা করতে ইচ্ছে জাগল। নারীর কয়েকটি রূপ আছে, তার মধ্যে একটি হল সেবিকা, তা-ই দুই চোখে প্রত্যক্ষ করলুম।

কিন্তু খাটের ওপাশে চাইতেই চম্‌কে উঠলুম! দেখি পুর্ণিমা অপলক চোখে বৌদির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামলদার রোগ খুব কঠিনই হয়েছিল, টাইফয়েড্। তবে এখন বিপদের আশঙ্কা অনেকখানি কেটে গেছে। আইস্‌ব্যাগটা পাল্‌টে দিয়ে বৌদি আমাদের দিকে ফিরে বললেন—বসো।

বন্ধুটি অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে—বৌদি, আমরা এমন কি অপরাধ করলুম যে সময় মত একটা খবর পর্যন্ত পেলুম না!

বৌদি হেসে বললেন—তোমাদের অভিযোগ আমি অস্বীকার

করছি না। পরস্পরের মনে এ অধিকার আপনা থেকেই জন্মে গেছে। আমি কি জানি না আমার বিপদে তোমরা ছুটে আসবে? জানি বলেই তোমাদের কাছে খবর দিইনি। কারণ যতক্ষণ আমি একাই বইতে পারছি, ততক্ষণ তোমাদের আর বিব্রত করতে চাইনি। আজ যে ডেকেছি তার একটা কারণ আছে।

বলে খাট থেকে নেমে একটু দূরে এসে হাতের অবশিষ্ট বালা দু'গাছা খুলে বন্ধুটির হাতে দিয়ে বললেন—এ দু'গাছা বিক্রী করে দাও, এই জন্যেই তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি।

বন্ধুটি নীরবে বালা দু'গাছা হাত পেতে নিল।

কিছু সময় পরে আমরা যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালুম। বৌদিও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাইরের বারান্দা পর্যন্ত এলেন। হঠাৎ 'বৌদি' ডাক শুনে পেছনের দিকে চেয়ে দেখি—পূর্ণিমা।

বৌদি তার দিকে চেয়ে বললেন—কি ভাই?

পূর্ণিমা বৌদির হাত দু'খানা ধ'রে বললে—বৌদি, তুমিই সুখী, সত্যিই তুমি সুখী, তুমি আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর! বলে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল। এবং হাত দিয়ে বৌদির পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে, ঝড়ের বেগে বের হয়ে গেল।

আমরা হতবাক্‌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম!

পূর্ণিমার তখন স্ত্রীত্বের স্বর্ণচূড়া থেকে স্খালনের যুগ। বা পঙ্ক মুক্তির যুগ।

কিছুদিন বাদে শ্যামলদা বদলি হয়ে দিল্লী চলে গেলেন। আমরা হৈ হৈ রৈ রৈ করে তাঁদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে এলুম। বৌদি কাঁদলেন। আমাদের চোখ দিয়েও বোধ হয় দু' এক ফোঁটা জল পড়েছিল। কিন্তু যন্ত্রযান এইসব ভাব-প্রবণতার ধার না ধেরে, আমাদের এই অশ্রু বন্যার উজানে দানবীয় উল্লাসে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বীরদর্পে চলে গেল। বৌদি মিলিয়ে গেলেন।

এক বছরের মধ্যে পূর্ণিমাদের কোনো খোঁজ খবর জানিওনা বা নিইওনি।

একদিন দুপুরে বন্ধুটি বাসায় ফিরে জামা খুলতে খুলতে বললে—পূর্ণিমার খবর শুনেছিস ?

আমি বললুম—কি, মারা গেছে ?

বন্ধুটি বললে—তা একরকম মৃত্যুও বলতে পারিস, আবার নবজন্মও বলতে পারিস।

আমি বললুম—কি রকম ?

বন্ধুটি বললে—এখন দেখলে তাকে চিনতেই পারবি না।

আমি বললুম—না চিনলেও ক্ষতি নেই। তুই ঘটনাটা বল।

বন্ধুটি যা বলল, তা এই—পূর্ণিমার স্বামী প্রায় বছর খানেক হ'ল তাকে ত্যাগ করেছে। পূর্ণিমাকে আলাদা বাসা করে দিয়েছে। সে এখন সেখানেই থাকে। আর স্বামীটি যে কখন কোথায় থাকেন তার খবর এক যাদের কাছে থাকেন, তারা ভিন্ন অপর কেউ বলতে পারে না। অবশ্য পূর্ণিমার খোরপোশের সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু নিজে ধার কাছ দিয়েও ঘেঁযে না। মতের গরমিল চলছিল কিছুদিন ধরেই। স্বামী চেয়েছিল পূর্ণিমাকে সহকর্মিণীরূপে পেতে, আর পূর্ণিমা চেয়েছিল সহধর্মিণী হতে। ইতিমধ্যে কালব্যাধি বসন্ত হয়ে পূর্ণিমার সেই রূপ গেল নষ্ট হয়ে। অতএব স্বামীর প্রয়োজনও গেল ফুরিয়ে।

বন্ধুটি বললে—অর্থ হরণ করেছে ওর জীবনের মাধুর্য। ব্যাধি হরণ করল ওর রূপ। এখন ও রিক্ত, নিঃস্ব, সর্বহারা !

আমি বললুম—না, ও এখন দগ্ধ উল্কাপিণ্ডের এক মুঠো ছাই মাত্র।

সেই পূর্ণিমাকে আজ বহুদিন পরে তেমনি গয়না পরে যেতে দেখে ভাবলুম—সেদিনও পূর্ণিমার গায়ে গয়না ছিল, আজও আছে। কিন্তু সেদিন সোনা ওর অঙ্গে থেকে ওর রূপের কাছে নিজেই লজ্জায়

লাল হয়ে গিয়েছিল। আর আজ সেই সোনাই ওকে বিদ্রূপ করছে অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে।

বাংলায় বলে চুক্তি। ইংরেজীতে কন্ট্রাক্ট। এই চুক্তি নিয়ে ঘরবাড়ী তৈরী থেকে আরম্ভ করে, ডাক্তারের রোগী সারানো মায় হোটেলে পেটচুক্তি পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। আমার বন্ধুটিও এইরকম একটা কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল। তা হ'ল পাড়ার রামবাবুর পুত্র নন্দ-কিশোরের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার দুরূহ কাজের। যাকে এইমাত্র জামা জুতো পরে স্মার্ট সেজে স্কুল-ফেরত বাড়ীমুখো ট্রামে উঠতে দেখলুম, সে-ই হল রামবাবুর সাত-রাজার-ধন এক-মাণিক শ্রীমান নন্দকিশোর।

অপুত্রকের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন। নির্ধন রামবাবুর ধনপ্রাপ্তি হয়েছিল যুদ্ধের কল্যাণে। তার পরিমাণও ছিল প্রচুর। কিন্তু পুত্র? সাড়ে পাঁচ সের মাদুলি গলায় বেঁধেও সাড়ে দশ মণ খাঁটি গব্য ঘৃত পুত্রেষ্টি যজ্ঞে পুড়িয়েও, সে গুড়ে বালি দিতে হ'ল। আর একটা বিয়েতে তাঁর মত হয়েছিল। কারণ পুত্রার্থেই যখন বিয়ে করা তখন আর দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে উপায়ই বা কি? এতে প্রথমার আপত্তি থাকলেও ধোপে টিকল না। রামবাবুর স্বপক্ষে যুক্তি ছিল অকাট্য। কারণ এত টাকাপয়সা ভবিষ্যতে ওড়াবার কেউ রইল না। এমন কি নির্বংশ অবস্থায় মরলে, পরলোকে গিয়ে জল অভাবে কিরূপ কষ্টটা পেতে হবে, তা বিশদ্‌ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে প্রথমাকে বললেন—দেখ, পরলোক বলে যে জায়গাটা আছে, সেখানে সৎলোক বলে একটিও নেই। সেখানে যার যার তার তার, কেউ কারুর দিকে ফিরেও তাকায় না। তুমি যতই তেষ্টায় ছাতি ফেটে মর না কেন, ওপাড়ার আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু নরেশ দত্ত যখন তার পুত্রের দেওয়া পিণ্ড এবং জল পেট ভরে গিলবে,

তখন তা থেকে এক কণা পিণ্ড বা এক ফোঁটা জলও তোমার গলায় সে ঢেলে দেবে না। এমন স্বার্থপরের জায়গা ওই পরলোকটা। অথচ দেখ, আমার বাড়ীতে ডালের উপর শাকচচ্চড়ি হলে নরেশকে না দিয়ে আমরা খাই না। তার বাড়ীতে বড়াটা ভাজলে আমাদের নেমন্তন্ন না করে ছাড়ে না।

অতএব প্রথমা, পরলোকে গিয়ে সতীনপোর হাতের পিণ্ড এবং জল পাবার আশায়, মুখ বুজে রামবাবুর দ্বিতীয়বার বিয়েতে সম্মতি দিলেন।

রামবাবু তাকে প্রবোধ দেবার জন্যে বললেন—আরে শাস্ত্রেই আছে—'একবারে না পারিলে দেখ শতবার'। আমি ত শুধু দু'বার চেষ্টা করে দেখছি মাত্র।

বিয়ের সবই প্রস্তুত, কনে থেকে আরম্ভ করে দিনক্ষণ পর্যন্ত।

কনের বাবা কনেকে বোঝালেন—পঞ্চাশ বছর পুরুষের পক্ষে একটা বয়সই নয়। তা ছাড়া—।

পাকা দেখার দিন মেয়ে প্রণাম করছে বাবাকে। বাবার মুখ থেকে 'তা ছাড়া' পর্যন্ত শুনে চেয়ে রইল বাবার মুখের দিকে। বাবা তাড়াতাড়ি মাথায় হাত রেখে বললেন—চির আয়ুষ্মতী হও মা। মনে মনে হয়ত বললেন, যত শীঘ্র বিধবা হও, ততই তোমার আমার সকলের পক্ষেই মঙ্গল।

রামবাবুর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতি লক্ষ্য রেখেই মেয়ের বাবা এই সম্বন্ধ করেছিলেন। এবং বিয়ের দিনই নিজের মেয়ের নামে সম্পত্তির একটা লেখাপড়া করিয়ে নেবার কথা পাকা করে নিয়েছিলেন।

মেয়ের বাবা লক্ষ্য স্থির করে বসে আছেন রামবাবুর লক্ষ লক্ষ টাকার দিকে, রামবাবুর লক্ষ্য ভাবী নববধূর দিকে। মাঝখানে মেয়েটি অস্থির হয়ে বোধহয় নিজের কপালের দিকেই লক্ষ্য স্থির করে ব'সল। কিন্তু এদিকে সবার অলক্ষ্যে যে ব্যাঙ্কে রামবাবু বেশী

সুদের আশায় বেশী টাকা রেখেছিলেন, তা একদিন গণেশ উল্‌টে দিয়ে লালবাতি জ্বালিয়ে ব'সল।

ব্যস্! রামবাবু এবং মেয়ের বাবা দুজনেই লক্ষ্য ফিরিয়ে নিয়ে যথারীতি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন।

রামবাবু ভাবলেন, এই বিয়ের নাম করাটাই যত অলক্ষুণে কাজ হয়েছে! অতএব বিয়ে স্থগিত রইল চিরদিনের জন্যে। তাছাড়া টাকাই যখন গেল তখন অনর্থক আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি! অবশিষ্ট লাখ তিনেক টাকা সম্বল করে স্বামী-স্ত্রী কোনোরকমে দিন কাটাবার মনস্থ করলেন।

দিন যায় সুখে-দুঃখে। একদিন দাড়ি কাটতে গিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে হঠাৎ রামবাবু আবিষ্কার করলেন—তাঁর চুল ও দাড়িতে পাক ধরেছে। অতএব তাঁর বয়স হয়েছে, তিনি মরবেন। তারপরে? তাঁর যা এখনো অবশিষ্ট আছে, কে ভোগ করবে? ঐ জ্ঞাতিভাই প্রাণকেষ্টর পঙ্গপালের দল? অসম্ভব! তিনি ওপারে গিয়েও তাহলে ছট্‌ফট্ করে মরবেন! অতএব তিনি জীবিত থাকতেই এর একটা সুব্যবস্থা করে যেতে চান, যাতে নামও হবে কামও হবে, আবার পরকালেরও একটা হিল্লে হবে।

অতএব পাড়ার গণ্যমান্যদের ডেকে সভা করা হ'ল।

রামবাবু প্রস্তাব করলেন—পাড়ার ভেতর একটি প্রসূতি-হাসপাতাল করা হোক।

সভাস্থ সকলে তৎক্ষণাৎ একযোগে বলে উঠলেন—হয় যদি তবে হউক। কিন্তু—

কিন্তুর সমাধানও রামবাবুই করে দিলেন।

রামবাবু দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—হাসপাতাল বাবদ জমি ছাড়াও দুই লক্ষ টাকা নগদ আমি দেব।

সভার ভেতর ধন্য-ধন্য পড়ে গেল।

পরবর্তী সভায় ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হ'ল। রামবাবু হলেন ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি। রামবাবু এবং তাঁর স্ত্রীর নাম অনুসারে হাসপাতালের নাম হ'ল—রাম-নলিনী প্রসূতি সদন।

একান্ত আকাঙ্ক্ষিত সন্তান লাভে বঞ্চিত রামবাবু দেশের দশের সন্তানের ভেতর দিয়ে তাঁর অভিলাষ চরিতার্থ করতে চাইলেন।

রামবাবুর অবশ্য মরণের বয়স হয়নি। কিন্তু রামবাবু সাধারণতঃ একটু আগাম চিন্তা করেই কাজ করে থাকেন। যেমন তিনি যুদ্ধের আঁচ পেয়েই, বিলাতী অষুধের লেবেল ছাপিয়ে এবং খালি ফাইল যোগাড় করে রেখেছিলেন। তাই না তিনি আজ রামবাবু। পাড়ার মধ্যে দস্তুরমত একজন কেষ্ট-বিষ্টু। না হলে তো তিনি সেই 'রেমোই' থেকে যেতেন! পাড়ার চায়ের দোকানে বসে ডবল-হাফ চা ও বিড়ি-সহযোগে হিল্লী-দিল্লী করা আর বড়বাজারের মেড়োর গদীতে দালালি করা ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না। 'যুদ্ধ চাই না—শান্তি চাই' এই শ্লোগান শুনলেই রামবাবু তাই খিঁচিয়ে ওঠেন—আহা হা, শান্তি চাই, শান্তি চাই! কত শান্তিতেই আছিস তোরা! হুঁ!

যাই হোক্ হাসপাতালটা তৈরী হতে প্রায় দু'বছর লাগল। কিন্তু একবছর যেতেই রামবাবু আর এক চিন্তায় পড়লেন। অথচ ব্যাপারটা এই দু'বছর আগে হলেও রামবাবুর আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকত না; চাইকি, হোম যজ্ঞ স্বস্ত্যয়ন তো করতেনই এমন কি কাঙালী ভোজন পর্যন্ত বাদ যেত না।

তাই রামবাবুর স্ত্রী যখন সলজ্জ হেসে জানিয়ে দিলেন যে তিনি মা হতে চলেছেন, তখন রামবাবু হাসবেন কি কাঁদবেন স্থির করতে না পেরে শুধু কপাল চাপড়াতে লাগলেন, আর দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে নব নির্মীয়মান হাসপাতালটার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকাতে লাগলেন।

যাই হোক্ হাসপাতালের গঠন কার্য শেষ হ'ল এবং মহা সমারোহে এক প্রসিদ্ধ নেতা কর্তৃক একদিন তার শুভ দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হ'ল। বিভিন্ন বক্তা চোস্ত ভাষায় বক্তৃতা দিলেন, এবং রামবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করে ও প্রশস্তি গেয়ে দেশের অপর সকলকেও জাতির সেবায় রামবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলে হাসপাতালের উদ্বোধন পর্ব সমাপ্ত করলেন। সবচেয়ে যেটা বেশী আনন্দের ও রাম-নলিনী প্রস্থৃতি সদনের পক্ষে গৌরবের বস্তু, সেটা হ'ল—হাসপাতালের দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে যে রোগিণী প্রবেশ করলেন, তিনি হলেন রামবাবুরই স্ত্রী নলিনী দেবী।

এই হল শ্রীমান নন্দকিশোরের প্রাক্-জন্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রাকৃতিক নিয়মে নন্দকিশোরের আয়তন শশীকলার মত দিন দিন বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার দৌরাত্ম্যও নানা ভাবে আত্ম-প্রকাশ করতে লাগল। রামবাবু পুত্রের দিকে চেয়ে শুধু ভাবেন—বাপু, এলেই যখন, দুদিন আগে কেন এলে না ? তাহলে তো—বলেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একবার তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের দিকে, একবার পুত্রের দিকে চেয়ে দেখেন। ভেবে ভেবে রামবাবু দিশেহারা হয়ে গেলেন। কিছুই তো রেখে যেতে পারলেন না। শুধু বাড়ীখানা আর নগদ কয়েক হাজার টাকা। এ তো নিজ হাতে নিজের ছেলেকে ভিখারীর খাতায় নাম লিখিয়ে যাওয়া! 'অপয়া, অপয়া, এই ছেলেটাই অপয়া, না হলে এসময় ওর জন্ম হবে কেন ?'

ক্রমে নন্দকিশোর হামাগুড়ি দিতে শিখল। একদিন খাটের পাশের টেবিলের উপর থেকে রামবাবুর সৌখিন হাতীর দাঁতের কলমটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দিল সেটাকে মেঝেতে ফেলে। কলমটি গেল খান খান হয়ে। মা নলিনী দেবী হেসে উঠলেন খিল্ খিল্ করে। বললেন—দেখছ গো, বাবার আমার সুন্দর জিনিসের উপরই লোভ বেশী।

রুচি আছে বলতে হবে ছেলের। কারণ পাশেই ছিল রামবাবুর তামাক খাবার পাইপটি।

রামবাবু শিউরে উঠলেন পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে। তিনি বললেন—এ তো সুন্দরের উপর লোভ নয়, এ হল সুন্দরকে ধ্বংস করবার একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি!

আর একদিনের ঘটনায় রামবাবু তাঁর পুত্রের ঘোর দুর্যোগপূর্ণ ভবিষ্যতের নিশ্চিত আভাস পেয়ে চক্ষে অন্ধকার দেখলেন।

ঘটনাটি এই—

রামবাবুর বহুবিধ সখের মধ্যে শিকারের সখও একটি। কিন্তু একটু মুস্কিল ছিল। তার সাহসটা ছিল না মোটেই। বনে-বাদাড়ে গেলেই তার গা'টা কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করতে থাকে, বুকের ভেতরটা দ্রুত লয়ে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করতে থাকে, দুত্তোর ছাই! শেষে জন্তু মারতে গিয়ে কি নিজেই হার্টফেল করবেন নাকি! অতএব রামবাবুকে কোনো নিরাপদ শিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হল। তিনি শিকার সম্বন্ধীয় নানা রোমাঞ্চকর কাহিনীর বই সংগ্রহ করলেন এবং তাঁর বসবার ঘরের চারিদিকের দেয়ালে নানা ধরনের হিংস্র জীবজন্তুর ছবি টাঙিয়ে রাখলেন। রামবাবু এক একখানা বই পড়েন আর দেয়ালে রক্ষিত জীবগুলোর দিকে তাকান। আর মনে মনে নিজেকে কাহিনীর শিকারী কল্পনা করে জন্তুগুলোর মুণ্ডুপাত করেন। কখনো সিংহটার দিকে রাইফেল তাক্‌ করছেন, কখনো রয়েল বেঙ্গল টাইগারটার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করছেন, কখনো বা উঁচু গাছে উঠে বসছেন।

নন্দকিশোর যখন আধো-আধো কথা বলতে শিখেছে, তখন একদিন ছবিগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বাবাকে প্রশ্ন করতে লাগল—বাবা, এতা কি? ওতা কি?

রামবাবুও ছেলের শিকারের প্রতি ঝোঁক দেখে মনে মনে বড়ই পুলকিত হলেন এবং যথাসাধ্য পুত্রকে শিকারের প্রথম

পাঠ হিসাবে জন্তু-পরিচয় আরম্ভ করলেন—ওটা সিংহ, ওটা বাঘ, ওটা বুনো হাতি—।

নন্দকিশোর বায়না ধরে বসল—বাবা আমি হাতি খাব। নলিনী দেবী হেসে উঠলেন। কিন্তু রামবাবুর মাথাটা যেন কেমন অস্থির করে উঠল। —বাব্বাঃ! ছেলে যে হাতি খেতে চায়!

তারপর আগাম চিন্তাশীল রামবাবু ভেবে চললেন—ছেলের খাঁকৃতি যদি প্রথমে হাতি থেকেই শুরু হয়, তবে এই বাড়ী এবং সামান্য কয়েক হাজার টাকা খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ! তারপর? যুদ্ধের বাজারও নেই যে আমার মত দুপয়সা করে খাবে! তবে? অতএব এ নিশ্চয়ই চুরি করবে, না হয় গাঁট কাটবে। সুতরাং বংশের সুনাম রক্ষার জন্যেও একে লেখাপড়া শেখানো দরকার। যাতে আর কিছু না হোক, একটা কেরানী টেরানী হয়ে জীবন কাটাতে পারবে।

সেদিন থেকেই বামবাবু তাক করে রইলেন, নন্দকিশোবকে লেখাপড়া শেখাবেন।

নন্দকিশোরেব বয়স পাঁচ বছর হতেই রামবাবু তাঁদের কুলগুরুকে দিয়ে হাতেখড়ি দেবার ব্যবস্থা করলেন।

গুরুদেব তাঁর এই শাসাল শিষ্যের পুত্রকে আপন পুত্র জ্ঞানে কোলের উপর বসিয়ে, নন্দকিশোরের হাতে এক খণ্ড খড়ি গুঁজে দিলেন এবং পাথরের উপর হাতে ধরে লেখালেন—'ক'।

ব্যস্, 'খ' লিখবার আগেই, গুরুদেবের আজানুলম্বিত পাকা দাড়ীর সুড়সুড়িতেই হোক্ অথবা এতক্ষণ একজায়গায় চুপচাপ বসে থাকার দরুণ অস্বস্তির জন্যেই হোক্, নন্দকিশোর একটানে পাথর-খানাকে মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে একেবারে চোঁচা দৌড়।

সকলে হৈ হৈ করে উঠল। রামবাবু ছুটে গিয়ে পাঁজা-কোলে করে নিয়ে এলেন এবং পিঠের উপর গোটা দুই কিল মেরে শান্ত হয়ে বসবার আদেশ দিয়ে পুনরায় গুরুদেবের কোলে বসিয়ে দিলেন।

বিদ্যারম্ভের শুভ মহরতের সঙ্গে সঙ্গেই, নন্দকিশোরের পিঠের উপরে উত্তম-মধ্যমেরও মহরতটা হয়ে গেল।

এবারে নন্দকিশোর খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। বাবার কাছ থেকে এই প্রথম দক্ষিণা পেয়ে, তার শিশুমন বোধ হয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়ে থাকবে।

নূতন পাথরের থালা এল। গুরুদেব এবার আদর করে, 'লক্ষ্মী', 'মাণিক' প্রভৃতি মিষ্টি সম্বোধন করে নন্দকিশোরকে দিয়ে 'খ' লেখালেন।

গুরুদেব নন্দকিশোরকে উৎসাহিত করবার জন্যে তার কচি গালে, আপন পাকা দাড়ীর ঘসা দিতে দিতে বললেন—বাঃ বাঃ এই তো বেশ খাসা লিখেছ মাণিক আমার। এই তো—

কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই, নন্দকিশোর গুরুদেবের প্রলম্বিত দাড়ীতে এক হ্যাঁচকা টান মেরে, লম্বা দৌড়ে বাড়ীর বের হয়ে গেল।

রামবাবু রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু বাধা দিলেন গুরুদেব। হেসে বললেন—থাক থাক এতেই হয়েছে। আদ্যক্ষর যখন লেখা হয়েছে, তখনই বুঝতে হবে সমস্তই লেখা হল। 'ক' তে কালী, কৈবল্যদায়িনী, 'ক' তে কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু। আহা হা! তুমি কিচ্ছু ভেব না রামচরণ, দেখবে তোমার ছেলে জজ্ মেজিষ্ট্রেট চাই কি তার চেয়েও বড় কিছু না হয়েই যায় না।

রামবাবুর জিদ্ চেপে গেল, যেমন করেই হোক, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেনই। সুতরাং প্রথম থেকেই লেখাপড়া নিয়ে পিতাপুত্রে এক যুদ্ধ ঘোষণার মত হয়ে গেল। তারপর থেকে পুত্রকে ঘায়েল করবার জন্যে বেছে বেছে জবরদস্ত সেনাপতি নিযুক্ত করতে লাগলেন। ক্রমে নন্দকিশোর সাত বৎসরে পা দিল। এই দুই বৎসরে কত শিক্ষক এলেন, কত শিক্ষক গেলেন, কত বেত ভাঙলেন, কত বেত নূতন এল, 'শিক্ষক চাই' বলে কত বিজ্ঞাপন খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ভরল; কিন্তু অবস্থা ঐ একই জায়গায়। নন্দকিশোরের

ধনুকভাঙ্গা পণ থেকে এক চুলও তাকে নড়াতে কেউ পারেনি। সেই যে গুরুদেব দুইবারের চেষ্টায় 'খ' অবধি লিখিয়ে চলে গেছেন, তারপর আজ পর্যন্ত 'গ' কেউ লেখাতে পারেনি। মাঝখান থেকে নন্দকিশোরের দৌরাত্ম্যের রূপ নিত্য নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। মারধরকে সে এখন আর আমলই দেয় না, ও তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। লাভের মধ্যে হল এই, আগে মিথ্যে কথা বলত না, এখন নির্যাতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে, ছলনার আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল।

সেবার এলেন হাইস্কুলের বহু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রবীণ শিক্ষক নিখিলবাবু। সূর্য উদয় থেকে আরম্ভ করে রাত নটা অবধি, ছাত্রদের সঙ্গে মা সরস্বতীর একটা যোগসূত্রের দালালি করে তিনি যখন নিজের বাড়ীতে ফেরেন, তখন তাঁকে দেখলে যে কেউই শুঁড়ীর দোকান ফেরত বলে মনে কবতে পারে। শিক্ষকদের উপর রামবাবুর ঢালা হুকুম ছিল—আমি ছেলের গায়ের চামড়া এবং মাংস চাই না, চাই শুধু হাড়ের নীচের ধুঁক্‌ধুঁকিটুকু। তার সঙ্গে চাই লেখাপড়া। শিক্ষকরা শেষের শর্তটা না পুবতে পারলেও প্রথমটা তাঁরা পুরোপুরিই পালন করতেন।

নিখিলবাবু, সব টিউশনি সেরে, রাত আটটার সময় নন্দ-কিশোরকে পড়াতে আসতেন। দেরীতে আসার কারণ সম্বন্ধে তিনি রামবাবুকে বুঝিয়েছিলেন—তার আগমন অবধি, ছাত্রকে যেমন জেগে থাকতেই হবে, তেমনি সান্ধ্য ঝিমুনী থেকে মুক্ত হবার অভ্যাসটাও তার হবে।

রামবাবুর আবার ঐ সময়টা ক্লাবে তাসের আড্ডায় না গেলেই নয়। অতএব ছেলের দায়িত্ব শিক্ষকের উপর দিয়েই তিনি খালাস। সুতরাং নিম্নোক্ত রুটীন অনুযায়ী নন্দকিশোরের পাঠ শিক্ষা চলতে লাগল—

নিখিলবাবুর রাত আটটায় আগমন, নন্দকিশোরের ঐ পর্যন্ত

চেষ্টা করে জাগরণ, শিক্ষক মহাশয় ও ছাত্র মুখোমুখি দুই চেয়ারে উপবেশন। একটু বাদেই টেবিলের উপর উভয়ের মস্তক স্থাপন ও যথারীতি নাসিকা গর্জন।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে নটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক মহাশয়ের নিদ্রা অপগত হত। এবং চোখ বুজেই টেবিলের উপর রক্ষিত গোলাকৃতি কাঠের নস্যের ডিবা থেকে দুই নাকে দুই টিপ্ ঠেসে দিয়ে তবে চোখ মেলতেন। চোখ মেলেই হাতের কাছের বেতখানা নিয়ে সপাসপ্ ঘা কতক নন্দকিশোরের পিঠের উপর দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিয়ে বলতেন—ছ্যাখ্, আজ মারলুম না বটে, কিন্তু কাল যদি পড়া না করিস তো, এমনি ভাবে মার খেয়ে মরবি। বুঝলি বাঁদর কোথাকার? বলে নমুনা স্বরূপ আরও ঘা কতক দিয়ে তিনি হাই তুলে উঠে দাঁড়াতেন। নিদ্রাজড়িত নন্দকিশোর, বুঝল না কিছুই। শুধু খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হবার সঙ্গে সঙ্গে, বই শ্লেট ছুড়ে ফেলে এক দৌড়ে বাড়ীর ভেতর চলে যেত।

কিছুদিন পর নন্দকিশোর ভাবতে বসল—কি ভাবে এই শিক্ষক মশাইকে শিক্ষা দেওয়া যায়! অতএব ডাক পড়ল তার খেলার সাথী, তার চেয়ে বছর দুই বড় পটলের। দুই জনে মিলে পরামর্শ করে পন্থা আবিষ্কার করল।

সেদিনও রাত্রে নিখিলবাবু এলেন এবং সকল কাজই যথারীতি চলল। যথাসময়ে রাত নটা বাজল। নিখিলবাবু অভ্যাসমত চোখ বুজেই নস্যির ডিবার মুখটা খুলবার জন্যে ঘোরাতে লাগলেন, কিন্তু যতই ঘোরাচ্ছেন ততই পুচ্ পুচ্ করে জল ছিটে নিখিলবাবুর চোখে মুখে নাকে পড়তে লাগল। নিখিলবাবুর মুখের ভেতর খানিকটা জল যেতেই দুর্গন্ধে নাক সিট্‌কে চেয়ে দেখেন, তার নস্যির ডিবার স্থলে, একটি ছোট ডিগবল, এবং তার ভেতর ছিদ্র করে নর্দমার পচা জল ভরে রেখেছে। একটু চাপ পড়তেই পুচ্‌পুচ্

করে যত জল নিখিলবাবুর চোখে মুখে। রাগে বেত হাতে সামনের দিকে চেয়ে দেখেন, নন্দকিশোর ততক্ষণে অন্তর্ধান হয়েছে।

তাব কিছুদিন বাদে, রামবাবু একদিন সাড়ে আটটার সময়ই কোনো কাবণে ক্লাব থেকে বাড়ী চলে এলেন। এসে পড়বার ঘরে উঁকি দিয়ে, শিক্ষক ও ছাত্রকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঘুমোতে দেখে, অবাক হয়ে গেলেন। নিখিলবাবুকে ডেকে বললেন—একি মাষ্টার মশাই! এই ভাবেই বোজ পড়ান নাকি?

বাবার আওয়াজ পেয়েই নন্দকিশোর জেগে উঠে আড়মোড়া ভেঙ্গে বললে—বারে! আমবা রোজই তো এই রকম ঘুমাই। না মাষ্টার মশাই?

নিখিলবাবু একবাব বামবাবুর দিকে একবার ছাত্রেব দিকে অসহায়ের মত তাকাতে লাগলেন।

নন্দকিশোর হাতেব বুড়ো আঙ্গুল দু'টো দ্রুত তালে কয়েকবাব নাচিয়ে সবেগে প্রস্থান কবল।

তাবপর যাকে রাখা হল, তিনি তুলসীবাবু। থাকেন হোষ্টেলে, পড়েন থার্ডইয়াবে, কুস্তী লড়েন কুস্তীর আখড়ায়। জবরদস্ত্ চেহাবা। চলনে বলনে ফিট্‌ফাট্। সবসময়ই কেতা-দুবস্ত। নিত্য নূতন জামা পবে আসতেন। কোনোদিন মটকাব, কোনোদিন গবদের, কোনোদিন সিল্ক বা আদ্দির। গিলে-কবা জামা, কোঁচান ধুতি, পায়ে চক্‌চকে পাম্পস্যু, মুখে সিগাবেট টানতে টানতে এসেই টেবিলের উপর পা দুটোকে ছড়িয়ে দিয়ে বসতেন।

বামবাবু মারফত শ্রীমান নন্দকিশোরের সমস্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ কবে তুলসীবাবু বাবকয়েক বুকের মাস্‌ল্‌টা নাচিয়ে নিয়ে রামবাবুকে বললেন—এই ভাবে যদি নিজের মাস্‌ল্‌কে কণ্ট্রোল্ কবতে পারি, তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আপনার ছেলেকেও আমি কণ্ট্রোলে আনতে পারব।

বামবাবুও তুলসীবাবুর এই পালোয়ানী চেহারা দেখেই তাকে

বহাল করেছিলেন। ভাবলেন—এই ষণ্ডামর্ক চেহাবা দেখে যদি ছেলেটা ভয় পেয়ে পড়াশুনায় মন দেয়।

কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই গুরু-শিষ্যেব মধ্যে একটা নক্-আউট গেম হয়ে গেল।

ঘটনাটি এই—নন্দকিশোব সেদিন সকাল থেকে উঠেই কাদা-মাটিব সাহায্যে দুর্গা ঠাকুর তৈরী কবতে লেগে গেল। ভ্রূক্ষেপ-হীন ভাবে মৃৎশিল্পের চর্চাতে মনোনিবেশ কবল। মা বাব দুই খেতে ডেকে বিফল হলেন। বামবাবু একবাব গিয়ে ধম্‌কে এলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে টলাতে পাবলেন না। এক মনে গড়ে যাচ্ছে তো গড়েই যাচ্ছে। মাটিব কাজ যখন শেষ হল, তখন শুরু হল বংয়েব কাজ। অতএব দোযাতেব কালি, চুন প্রভৃতি সহযোগে ন্যাকডাব তুলি দিয়ে চিত্র বিচিত্র কবে যখন প্রতিমা গড়া সম্পূর্ণ হল, তখন প্রতিমাব দিকে চেয়ে নন্দ আর চোখ ফেরাতে পারলে না। নন্দকিশোব নিজ কৃতিত্বে আত্মহাবা হয়ে উঠল। কিন্তু নিজে দেখে গর্ব-সুখ পুরোপুবি উপভোগ কবা যায় না। অতএব প্রথমেই ডাক পডল তাব একান্ত আশ্রয়-স্থল স্নেহময়ী মায়েব। নলিনীদেবী এসে প্রতিমা দেখে তৎক্ষণি আটআনা পয়সা চাঁদা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসলেন।

নন্দ ভাবল—মা যখন এত তাবিফ কবে গেলেন তখন এ সুন্দব না হযেই যায না।

তাহলে খেলাব সঙ্গীদেব এখন বুক ফুলিয়েই দেখানো চলে। ক্রমে বুলা, কচি, খুকু, মিঠু অনেকেই এসে জড়ো হল। এবং প্রতিমা দেখে, কতকটা তাদেব বিবেচনায়, আব কতকটা নন্দ-কিশোরেব হাতের চড়চাপড খাবাব ভয়ে তাবা একবাক্যে স্বীকাব কবল—এরকম ঠাকুব তারা জন্মে দেখেনি।

বুলা তো প্রমাণ প্রয়োগ সহ বলেই ফেললে—ওপাড়ার গণেশ-ঠাকুরের শুঁড়টা, কক্ষণো এত বাঁকা হয়নি।

নন্দকিশোরের সারাটা দিন যে কি ভাবে কাটল, তা সে বলতে পারে না। সে শুধু সারাটা দিন ভাবতে লাগল এমন সুন্দর জিনিসটি আর কাকে দেখানো যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল্—ঠিক্ হয়েছে, আজ নূতন মাষ্টারমশাই আসবেন; তাঁকে দেখাতে হবে।

নন্দকিশোব আজ সাগ্রহে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা করতে লাগল। প্রতিমা দেখলে মাষ্টারমশাইর মুখখানা কিরূপ প্রসংশমান হ'য়ে উঠবে, কি ভাবে তাকে তারিফ করবেন, তার একটা সুখকর চিত্র কল্পনা কবে আনন্দে বিভোব হয়ে গেল। আজ মাষ্টার-মশাইকে তার এত ভাল লাগল, যে সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাই কবে ফেললে আজ মাষ্টারমশাই যা বলবেন তাই সে করবে।

সন্ধ্যা হবাব আগেই সে বই শ্লেট নিয়ে পড়বাব ঘবে গিয়ে হাজির হ'ল এবং ঘন ঘন ঘড়িব দিকে তাকাতে লাগল। তার একবাব ঘড়িব উপব আব একবার মাষ্টাবমশাইব উপর রাগ হতে লাগল। হয় ঘড়িটা আস্তে আস্তে চলছে, না হয় মাষ্টার মশাই দেবী ক'বে আসছেন। হঠাৎ একসময় দবজার ওপাশে পায়ের শব্দ হতেই সে সচকিত হয়ে উঠল এবং মুহূর্তে বই শ্লেট খুলে পড়ায় মনোযোগ দিল। কিন্তু একটু পবেই তার ভুল ভাঙল। যা ভেবেছিল তা নয় পদশব্দকাবী তাব মাষ্টাবমশাই নয়, তাদেরই বাড়ীর চাকব হবনাথ। নন্দকিশোরের ইচ্ছা হল—দেয় হরনাথের পিঠেব উপর দুম্ করে এক কিল।

তারপর একসময়ে সত্য সত্যই তুলসীবাবু এলেন। মট্‌কার জামা গায়ে, কোঁচানো ধুতি, হাতে আংটি, বা হাতের কব্জিতে ঘড়ি, পকেটে দামী কলম, মাথার চুল এত ছোট করে ছাটা যে ন্যাড়া মাথার সঙ্গে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকেই কট্‌মট্ করে একবার চারিদিকটা দেখে নিলেন, নন্দর দিকে চেয়ে ব্যর দুই কাশলেন, তারপর গায়ের জামাটা

খুলে ব্রাকেটে ঝুলিয়ে রেখে, উভয় হাতের মাস্‌ল্‌টা বারদুই নাচালেন, তারপর হাতকাটা গেঞ্জীর ভেতব থেকে বুকেব ছাতিটাকে ফুলিয়ে আবলুস কাঠের চেয়াবটা জুড়ে বসলেন। পা দুটোকে টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, কর্কশকণ্ঠে বললেন—এই, তোব নাম কি ?

নন্দকিশোর এতক্ষণ অবাক হযে তাব নবনিযুক্ত মাষ্টাবমশাইব গতিবিধি নিবীক্ষণ কবছিল। ক্রমেই সে তাব সাধেব প্রতিমা দেখাবাব উৎসাহটা হাবিয়ে ফেলছিল। সে কোনোমতে বললে—নন্দকিশোব।

তুলসীবাবু একবাব অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন—হুঁ !

নন্দ এবাব মবিযা হযে বললে—মাষ্টাবমশাই, আমি কেমন সুন্দব ঠাকুব গডেছি, দেখবেন ? বলে মাষ্টাবমশাইব সম্মতিব অপেক্ষা না করেই সে টেবিলেব তলা থেকে তাব সাধের দুর্গা প্রতিমা সযত্নে তুলে টেবিলেব উপব বাখল।

তুলসীবাবু চম্‌কে পা সবিযে নিযে, জোব ধমক দিয়ে বললেন—সবিযে নে, শীগগীব সবিয়ে নে হতভাগা কোথাকাব ! এঃ ! দেখ দেখি, কাদা দিযে টেবিলটাকে কি নোংবা কবে ফেলল !

যদিও লাগবাব সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তিনি বাব বাব তাঁব কাপড়টা পবীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

নন্দ তাডাতাডি তাব প্রতিমা এনে টেবিলেব নীচে বাখল।

মাষ্টাবমশাই দৃষ্টিতে আগুন জ্বালিযে বললেন—এই বুঝি কবা হয় সাবাদিন বসে বসে ? কিন্তু আমি সাবধান করে দিলুম, ফেব যদি তোকে এবকম করতে দেখি তো আছড়ে হাড গুড়ো কবে দেব !

নন্দকিশোবের চোখে জল এসে পড়ল। সে কোনো কিছু না বলে, জানালা দিয়ে বাইরেব দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ তাব লক্ষ্য পডল, বাস্তার লাইট পোষ্টেব তলায় একটি নধরকান্তি

স্থধাল মোষ শুয়ে বিশ্রাম করছে। নন্দকিশোর সেটার দিকে চেয়ে চেয়ে তার দেওয়া অস্থরের পায়ের তলাব মোষটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল। ক্রমে সে এমন মগ্ন হয়ে গেল যে প্রবল প্রতাপান্বিত মাষ্টারমশাইর অস্তিত্বের কথা পর্যন্ত ভুলে গেল।

তুলসীবাবু ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্রাকেট্ থেকে জামাটা খুলে তার ভাজগুলো সযত্নে ঠিক্ঠাক্ করে গায়ে দিয়ে পকেট-চিরুনি দিয়ে মাথাটা বেশ করে আঁচড়ে নিলেন। জঁাদরেল চেহাবাটা নন্দকিশোবকে দেখিয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথমে জামাটা খুলেছিলেন।

এদিকে নন্দকিশোর মোষ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল। সে দেখল তাব মোষটাব সবই ঠিক হয়েছিল, শুধু মোষটার মাথাটা এবং গায়েব বংটা সে কিছুতেই ঠিক কবতে পারে নি। বং সম্বন্ধে কত গবেষণাই না সে কবেছে! নীল কালিব সঙ্গে মাটির গুড়ো মিশিয়ে দেখেছে কিন্তু ঠিক বংটি হয়নি। তাবপব দিয়াশলাইর কাঠির মাথার বারুদ গুড়ো কবে জলে মিশিয়ে দেখেছে, ঠিক মোষেব বং না হলেও প্রায় কাছাকাছি যায় বটে। অবশেষে তাই দিয়েই সে মোষের বং দিয়েছে, কিন্তু যতই সে দিক, ঐ জ্যান্ত মোষটা তাবটার চেয়ে অনেক—অনেক—

—এই শোন্! তুলসীবাবু আবার জুত হয়ে চেয়াবে বসে ছাত্রকে সম্বোধন করে বললেন—দেখছিস আমাব চেহারা?

তন্ময় নন্দকিশোবেব কানে চেহারা কথাটাই শুধু গেল, তাই সে আপন চিন্তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—হ্যা, ঐ মোষটাব মত ঠিক—

তার কথা শেষ হতে পারল না, মাষ্টাব মশাই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে নন্দর ঘাড়টা ধরে লুফে নিলেন—কি! আমাকে মোষ বলা! দাঁড়া! বলে দমাদম পিঠের উপর তার পালোয়ানী কস্‌রৎ চালাতে লাগলেন।

নন্দ বুঝতে পারল না, কি দোষ সে করেছে। কেনই বা সে মার খাচ্ছে। সে তো মাষ্টারমশাইকে মোষ বলেনি। সে বলতে চেয়েছিল—তার তৈরী মোষটার চেয়ে রাস্তার ঐ মোষটার চেহারা সত্যিই সুন্দর।

তুলসীবাবু গা ঝাড়া দিয়ে বললে—বেয়াদব কোথাকার! কই, বার কর দেখি তোর বই।

এইবার নন্দ বিদ্রোহী হয়ে উঠল, সে চট্ করে দাঁড়িয়ে রাগে দুঃখে তার অত সাধের দুর্গা প্রতিমা পা দিয়ে মাড়িয়ে বই শ্লেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

পরদিন থেকে নন্দ আবার ভাবতে বসল, এই মাষ্টারমশাইকে কি উপায়ে জব্দ করা যায়!

এবারেও নন্দ তার মন্ত্রী পটলের শরণাপন্ন হল। তারপর পটল ও নন্দ সাত দিন বসে মাষ্টারমশাইর গতিবিধি লক্ষ্য করে উপায় স্থির করল। এ বিষয়ে পটলের কাছে নন্দ ঋণী এবং পটলের মাথাটা যে কত দামী তা সে ঠিকই করতে পারে না। সেদিনও যথারীতি তুলসীবাবু এলেন এবং চেয়ার জুড়ে বসে পা দুটো টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে নন্দকে বললেন—যা লিখতে দিয়ে-ছিলুম, তা লিখেছিস তো?

বলে যেই একটু নড়েছেন, অমনি তার জামাটায় টান লাগল। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে জামাটার দিকে চাইতেই তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল! জামাটা আলকাতরায় মাখামাখি। তার মটকার জামার এরূপ ঘাড়-মটকানো অবস্থা দেখে, রাগে দুই চোখ লাল করে সামনের দিকে তাকাতেই দেখেন নন্দকিশোর তার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে হাসছে।

পেছন থেকে পটল তাকে চিমটি কেটে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—এইবেলা পালিয়ে চল্।

জানালার গরাদে দেবার জন্যে আলকাতরা এনেছিলেন বোধহয়

বামবাবু। তাবই দু'পোচ আবলুস কাঠের কালো মিশমিশে চেয়ারে লাগিয়ে রাখা হয়েছিল। বলা বাহুল্য বুদ্ধিটি পটলেব।

অবশেষে বামবাবু হতাশ হয়ে পড়লেন। এমনি একদিন যখন নিজেব ও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হা-হুতাশ করছিলেন বসে তখন আমার বন্ধু গিয়ে উপস্থিত বীমাব প্রিমিয়াম আনতে। বামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন—আব মশাই প্রিমিয়াম! কাব জন্যে আর এসব বেখে যাব বলতে পাবেন? ছেলেটা যে মানুষই হল না।

বন্ধুটি বললে—ব্যাপাবটা কি খুলেই বলুন না।

তখন বামবাবু আদ্যোপান্ত নন্দকিশোবেব জীবনী বলে গেলেন।

সমস্ত শুনে বন্ধুটি বললে—আপনাব ছেলেটিকে তো আমি দেখেছি, কিন্তু খাবাপ বলে তো মনে হল না।

বামবাবু জোব দিযে বললেন - খারাপ, খাবাপ, মশাই একেবাবেই খাবাপ। ভালব লেশমাত্র নেই।

বন্ধুটি বললে—দেখুন, বোগ হলেই হতাশ হতে নেই। যথানিয়মে তাব চিকিৎসা কবতে হবে। যেমন বোগ আছে, তেমনি তাব দাওয়াইও আছে।

বামবাবু বললেন—দাওয়াই! আবে মশাই এই ক'বছবে অন্ততঃ পাঁচশখানা বেত ভেঙেছি ওব পিঠে, আব ডজন দেড়েক মাষ্টাব ওর সঙ্গে লডাই কবে ঘাযেল হয়েছে। কিন্তু ওকে এঁটে ওঠা যাযনি।

বন্ধুটি বললে—তাহলেই বুঝুন চিকিৎসাটাই ভুল হচ্ছে। আমি আপনাব ছেলেকে সাবিযে দিতে পাবি।

বামবাবু বললেন—পাবেন? তাহলে ভাই আপনাব কেনা হয়ে থাকব। তা আপনি পাবতেও পাবেন। আপনাবা স্বদেশীকবা লোক, আপনাদের কথাই আলাদা। তাহলে—?

বন্ধুটি বললে—তাহলে আব কি, আমাব হাতে ওব ভার সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিতে হবে। তবে আমি তো বোজ আসতে পারব না। জানেনই তো নিজেব ধান্ধায় ঘুবে বেড়াতে হয়।

বামবাবু বললেন—তা আপনি যেরকম খুশী আসবেন। মোদ্দা আপনি আমাব ছেলেটাকে মানুষ করে দিন।

বন্ধুটি বললে—এই দুষ্টু ছেলেগুলোব উপব আমাবও বড লোভ বেশী। এবকম আবও দু চাবটি বন্ধু আমাব আছে। আমাব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যে ছেলেটা যত দুষ্টু, তাব মস্তিস্কটা তত পবিষ্কাব। সাফ মাথা না হলে দুষ্টুমিটা মাথায আসে না। তাই সেই সব ছেলেদেব উপবই আমি ভবসা কবি বেশী। এদেব জীবনেব গতিটাকে যদি কোনো মতে সুপথে ঘুবিযে দেওযা যায, তবে দেখবেন, তথাকথিত সুবোধ ছেলেদেব চাইতে এবা গড্‌গড্‌ কবে দ্রুত উন্নতি কবে যাচ্ছে। দেখেন নি, খেলনা মোটবকে চাবি দিয়ে, যেদিকে মুখ কবে ছেডে দেবেন, সেই দিকেই তবতব কবে ছুটতে থাকবে। তা আপনি ভাল পথেব দিকেই দিন আব খাবাপ পথেব দিকেই দিন, আব খানাব দিকেই দিন। হযত খানায পডে গুঁডো হয়ে যাবে। কুছ পবোযা নেই। সে আপন গতিব আবেগে চলতেই থাকবে। আসলে এই গতিটাই হল প্রাণশক্তিব পবিচয। এ গতি যাদেব মন্থব, তাবা কচ্ছপ আব খবগোসেব দৌডেব বাজীতে, কচ্ছপেব মত বাজী জিততে হযত পাববে, কিন্তু এতে কৃতিত্বেব কোনো পরিচয পাওযা যায না। এবা জীবনে দৈবক্রমে হযত বাজী জিতে যায। কিন্তু জগতেব খুব বেশী কিছু কাজ এদেব কাছ থেকে আশা কবা যায না। আব দ্রুতগতিসম্পন্ন, চঞ্চল, উচ্ছল, উজ্জ্বল যাবা, তাবা খবস্রোতা স্রোতস্বতীব মত, পর্বত থেকে মহাসাগবে বিলীন হবাব আগে, যতদূব সম্ভব ক্ষিপ্রতাব সঙ্গে কাজ করে যায। মুহূর্তে মুহূর্তে এবা আপন কীর্তি সৌধ বচনা কবছে। আপন কীর্তিকে এবা পিছনে ফেলে ছুটে চলে নব নব কীর্তি-সৃষ্টিব নব নব প্রেবণায। এবা পর্বতেব বাধা উল্লঙ্ঘন করে, জলপ্রপাতেব সৃষ্টি কবে, এরা জনপদ ভাসিযে নিযে যায, আবাব জনপদ গডেও তোলে। এদেব বুকে প্রাণপ্রাচুর্যের

বান ডাকে। এরা বিধ্বংসী, এরা স্রষ্টা, এরাই রচে যুগে যুগে ইতিহাস।

আগুনের তাতে লোহা গলে জল হয়ে গেল। বন্ধুটির এই নাতিদীর্ঘ জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, রামবাবু একেবাবে বিগলিত হয়ে বন্ধুটিব হাত ছুটো খপ করে ধরে বললেন—আজ থেকে নন্দকিশোর আপনার। এই আমি কথা দিচ্ছি দশটি হাজারেব কেস্ আমি আবার করব।

যাই হোক্, তাবপর থেকে নন্দকিশোরের ভাব বন্ধুটি নিজের হাতেই নিল।

অনেক বয়স অবধি বিয়ে না করলে, মানুষ বোধ হয় কোনো না কোনো ধরনেব বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বন্ধুটির বেলাতেও সেই কথাটাই প্রয়োগ কবা চলে। অবসব সময়ে যত রাজ্যের বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো এঁচড়ে-পাকা ছেলেদেব জড় কবে সে তাদেব উপদেশামৃত বিতবণ কবত। তাদের আত্মিক উন্নতি বিধানে মনপ্রাণ ঢেলে দিত। এবজন্য বন্ধুটিব খবচাও বড় কম হত না। লজেন্স, বিস্কুট প্রভৃতি উপঢৌকন প্রতিদিনই তাদেব দিয়ে বশে রাখাব চেষ্টা কবা হত। কিন্তু বিপদটা বাড়তো আমাব। ঐসব পঙ্গপাল যখন আমাদেব ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে এসে ঢুকত, তখনই আমি তুর্গানাম জপ্ করতে আবম্ভ করতুম, এবং প্রতিদিনই দক্ষযজ্ঞ, লঙ্কাকাণ্ড, কুরুক্ষেত্র এর যে কোনো একটা ঘটিয়ে তাবা বিদায় নিত। আব তাব ঠেলা সামলাতে হত আমাকে।

আমি একদিন স্পষ্ট বন্ধুকে জানিয়ে দিলুম—ত্যাখ, তোর ঐ কীচকদেব নিয়ে, হয় তুই কোনো মাঠে ঘাটে গিয়ে আশ্রয় নে, না হলে ঐ যে ওদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানদানেব উদ্দেশ্যে কোথায় কোথায় যেন নিয়ে যাস্, তাই কর। মোদ্দা এদেব ঘরেব মধ্যে এনে ঢোকালে—আমি যে কাকে কখন ভট্ কবে মেরে বসব, তার কিন্তু ঠিক নেই।

বন্ধুটি আবেগজড়িত কণ্ঠে বললে—ছাখ, আজ প্রতিটি সভ্যজাতি, তাদের দেশের কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। কি করে এদের সত্যিকারের মানুষ করে গড়া যায়। দেশের যারা ভবিষ্যৎ, যারা দেশের মেরুদণ্ড, তারা যাতে জীবাণুমুক্ত থাকে সে বিষয়ে তাদের সদাই থাকে সতর্ক দৃষ্টি। আমাদেরও উচিত, এইসব কিশোর-কিশোরীদের সমস্ত পঙ্কিলতা থেকে উদ্ধার করা। এদের দেখিয়ে দিতে হবে সত্যিকারের পথ। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে, মানুষ শুধু ঘাড় গুঁজে কোনো মতে চব্বিশটি ঘণ্টা পার করতেই আসেনি। সে এসেছে এই পৃথিবীর মাটির অধিকার মানুষের মত মাথা খাড়া করে ভোগ করতে, সে এসেছে সুন্দরকে ভোগ করতে, সে যে রূপস্রষ্টা। তাই এরা যতদিন মহীরুহ হয়ে না ওঠে, ততদিন এই চারা গাছগুলোর চারদিকে সযত্নে বেড়া দিয়ে রক্ষা করতে হবে। এরা কাদামাটি, যেরকম করে গড়বে, সেইরকম ভাবে গড়ে উঠবে। এরা আয়না, যেরকম ছবি এর সামনে রাখবে, তারই প্রতিবিম্ব গিয়ে পড়বে। এদের মানুষ করে তুলতে হবে। এটাকেই আমি সমাজ সেবার প্রধান অঙ্গ বলে মনে করি। তাই আমি এদের মাঝে ডুবে থাকি।

আমি হাত যোড় করে বললুম—তা তুমি ডুবে থাক ক্ষতি নেই, মোটের উপর আমাকে ডুবিও না। এই যে মাঝে মাঝেই ঘরখানাকে ভাগাড় বানিয়ে রেখে যায়, তা সাফ সাফাই করতে আমার প্রাণান্ত হয়। বুঝলে?

ছেলেমেয়ে বশ করবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আমার বন্ধুর। এমন যে নন্দকিশোর, সে পর্যন্ত প্রথম দিনেই একেবারে ঢিট্ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা হবার আগেই বন্ধুটি গিয়ে নন্দকিশোরের বাড়ী উপস্থিত। নন্দকিশোর তখন পড়বার ঘরে বসে, তার আঁকা একখানা নাড়ু-গোপালের ছবি, তার মাকে দেখিয়ে শিল্প-চাতুর্য যে কত উচ্চস্তরের

হয়েছে, তাই বিশদভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় বন্ধুটি ঘরের বাইরে থেকে ডাক দিল—নন্দকিশোর বাড়ী আছ ভাই ?

ডাক শুনে মা ও ছেলে সচকিত হয়ে উঠল। নন্দর ভাবটা যেন কেমন একরকম হয়ে গেল। তাকে এমন দরদ ভরা কণ্ঠে ডাকে কে ? তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলতেই বন্ধুটি তার হাত ধরে ঘরে ঢুকে বললে—আমি তোমাকে পড়াতে এসেছি। আমার কাছে পড়বে তে ?

এত আদর মা ভিন্ন আর কারো কাছে নন্দ জীবনে কোনোদিন পায়নি। তাই সে হঠাৎ কিছু বলতে পারলে না।

বন্ধুটি বললে—তুমি যে ভাই চুপ করে রইলে, তাহলে বুঝি আমাকে তোমার তেমন পছন্দ হয়নি ?

তারপর নন্দর হাতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বলে উঠলে—ওকি, দেখি, দেখি, ছবি নাকি ? বলে আগ্রহের সঙ্গে নন্দর হাত থেকে ছবিখানি নিয়ে বললে—বাঃ, বেশ হয়েছে তো ! তুমি এঁকেছ বুঝি ? আমি কিন্তু ছবি সত্যিই খুব ভালবাসি। এখানা কিন্তু আমি নেব। কেমন, দেবে ত ? বলে নন্দকে বুকের কাছে টেনে নিল।

নন্দ ক্রমেই যেন অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। মাষ্টারমশাই এসেই কোথায় শুয়ার গাধা বলে আপ্যায়িত করবে, তা নয়। একেবারে ভাই সম্বোধন, তার আঁকা ছবির জন্য তারিফ করা, মায় আগ্রহের সঙ্গে নিতে চাওয়া পর্যন্ত ! এত আদর তার সহ্য হল না। সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। তার কান্না দেখে, তার মাও কেঁদে ফেললেন।

বন্ধুটি বিব্রত হয়ে পড়ল। বললে—ওকি ! কাঁদছ কেন ভাই ?

নলিনীদেবী জোর করে চোখ মুছে বললেন—এত আদর ও কোথাও পায়নি কিনা তাই ও সামলে উঠতে পারেনি। সবাই বলে—ও নাকি খুব দুষ্ট। ওর লেখাপড়া হবে না। ওর বাবাও দিনরাত এ নিয়ে আক্ষেপ করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত যতজন মাষ্টার-

মশাই এসেছেন, তাঁরা যে-কটা অক্ষর ওকে পড়িয়েছেন, তার চেয়ে ওর পিঠে বেত ভেঙেছেন বেশী।

বন্ধুটির মুখ ব্যথায় ভরে গেল। বললে—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনার ছেলেকে আমি মানুষ করে দেব। আর তাতে বেত ভাঙবার কোনো প্রয়োজনই হবে না।

এবার নন্দ সত্যি সত্যিই অবাক্ হয়ে গেল। বললে—আপনি আমাকে সত্যিই মারবেন না!

বন্ধুটি তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাতে বুলাতে বললে—না, সত্যিই মারব না। দেখে নিও। কারণ মানুষ মারামারি করে কেন জান? যেখানে তার স্বার্থ আছে, তা আদায় করবার জন্যে। আমার তো এখানে কোনো স্বার্থ নেই। এমন কি তোমাকে পড়াবার জন্যে, তোমার বাবার কাছ থেকে কোনো টাকাও আমি নেব না। এটা সম্পূর্ণ তোমার নিজের স্বার্থ। পড়াশুনা করলে তোমারই ভাল হবে। লোকে প্রশংসা করলে তোমাকেই করবে। ভাল বললে তোমাকেই বলবে। আমাকে তো নয়, বুঝতে পেরেছ? এটা তো বোঝ—লোকে যদি তোমাকে বলে—না নন্দ ছেলেটি বড়ই ভাল। সেটা শুনতেই বা কেমন লাগে, আর যদি সকলে বলে—এঃ নন্দ ছেলেটি বড্ড খারাপ, সেটাই বা কেমন লাগে? বল?

নন্দ বললে—ভাল বললে ভাল লাগে।

বন্ধুটি বললে—এই যে তোমার ছবিটা দেখে আমি ভাল বললুম, কেমন শুনতে লাগল!

নন্দ বললে—ভাল।

বন্ধুটি বললে—তাহলেই বোঝ, ভাল হওয়াটা যখন সত্যিই ভাল জিনিস, তখন তোমারও ভাল হওয়া উচিত। কি বল? তুমি ছেলেমানুষ বলে, সেই ভাল হবার উপায়টা জান না তো, আমি শুধু সেই পথটাই বাতলে দেব। ব্যস, তারপর তোমার ভাল তুমিই বুঝবে, আমি মিছিমিছি কষ্ট করে মারতে যাব কেন?

তারপর কোণের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বন্ধুটি বললে—ওটা কি ?

নন্দ সভয়ে বললে—বেত। বাবা আপনার জন্যে রেখে গেছেন।

বন্ধুটি বললে—নিয়ে এস।

নন্দ ঘাবড়ে গেল। বন্ধুর এতক্ষণকার রসালো বক্তৃতাকে তার ছলনা বলে মনে হ'ল।

বন্ধুটি আবার বললে—যাও, নিয়ে এস।

নন্দ অগত্যা নিজের মৃত্যুবাণ নিজেই নিয়ে এল। বন্ধুটি সেটা এক মোচড়ে ভেঙে দু'টুকরা করে নন্দকে দিয়ে বললে—দাও এটাকে দূর করে ফেলে। আপদ বিদায় হোক।

নন্দর মুখ শুকিয়ে গেল। বললে—করেছেন কি! বাবা জানলে আমাকে আর রক্ষে রাখবেন না।

বন্ধুটি বললে—সে ভার আমার। তুমি ফেলে এস।

অভয় পেয়ে, নন্দ হৃষ্ট মনে বেতখানা ফেলে দিয়ে এল।

বন্ধুটি বললে—সন্ধ্যা হতে এখনো কিছুটা দেরী আছে। চল একটু বেড়িয়ে আসি। কেমন ?

নন্দ এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না, সে ঝুপ্ করে বন্ধুকে একটা প্রণাম করে ফেললে। বন্ধুটি তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—বেড়াতে যাবে তো ?

নন্দ আগ্রহের সঙ্গে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন চলুন—বলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে—মা, যাব ?

নলিনীদেবীও এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি শুধু বন্ধুকে লক্ষ্য করে বললেন—ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।

সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরে বন্ধুটি বললে—এবার নিয়ে এস তোমার বই।

নন্দ বই নিয়ে এল। বন্ধুটি সেগুলো নাড়াচাড়া করে বললে—আজ আর পড়া নয়, তার চেয়ে শোন, গল্প বলি।

নন্দ হাতে যেন স্বর্গ পেল। বললে—গল্প! বলুন, বলুন, ভূতের গল্প, কেমন?

তারপর থেকে নন্দ, আমার বন্ধুটির একান্ত অনুগত হয়ে পড়ল। শিক্ষক ও ছাত্রের ভীতিজনক ব্যবধান ঘুচে গিয়ে বন্ধুত্বের সূত্র স্থাপিত হ'ল।

বন্ধুটির তত্ত্বাবধানে নন্দকিশোর মানুষ হতে লাগল। আর মাঝখান থেকে উত্যক্ত হতে লাগলুম আমি। কারণ নন্দ মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় এসেও হানা দিতে লাগল। এটা সেটা নাড়াচাড়া করে তার শিশুসুলভ চাপল্যের পরিচয় দিত। বন্ধুটির মতে অবশ্য তাতে বস্তুর সঙ্গে নন্দর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ ঘটত।

একদিন বিকেলে নন্দকে ঘরে রেখে বন্ধু গেছে মুখ ধুতে। ইতিমধ্যে নন্দকিশোর এক আশ্চর্য খেলায় মেতে গেল। আমি বাইরে থেকে ঘরে ঢুকতেই দেখি, কেরোসিনের গন্ধে ঘর ভরে গেছে। কোণের দিকে চেয়ে দেখি, নন্দ একমনে আমাদের ষ্টোভটিকে পাম্প করছে, আর বায়ুর চাপের ফলে বার্ণার দিয়ে সবেগে উৎক্ষিপ্ত তেল ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। আমি তো রেগে মারতেই গেলুম। পিছন থেকে বন্ধুটি বাধা দিয়ে বললে—থাক্, মারিস নে। বলে কাছে এসে নন্দকিশোরকে ষ্টোভ সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল। নন্দকিশোর খুশিমনে বিদায় নিল। বন্ধুটি একবার আমাকে জ্ঞান-দান করতে আরম্ভ করলে—ওকে মারলে কোন লাভই হ'ত না। ও বুঝতেই পারত না, কেন ও মার খেল। আর এ জিনিসটার সম্বন্ধে তার অজ্ঞতার দরুণ, এখানে না হোক্ অপর কোথাও এর প্রয়োগ করত। বুঝলি?

আমি মুখ ভার করে বললুম—বুঝলুম। এখন ঘরটা মুছে দে।

সেই নন্দর তিন মাসের মধ্যে পুরানো বই বদলে উচ্চ শ্রেণীর নূতন বইর প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এবং এক বছরের মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীব উপযুক্ত করে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হ'ল। পর বৎসর

চতুর্থ শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উঠে নন্দ সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলে। রামবাবু বন্ধুটির হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন—আপনাকে শত ধন্যবাদ। আপনিই আমার ছেলেকে মানুষ করে দিলেন।

বন্ধুটি বললে—এ কৃতিত্ব যত না আমার, তার চেয়ে বেশী প্রাপ্য আপনার ছেলের। ওর মাথা এমন চমৎকার যে, যা বলি চট্ করে বুঝে নেয়। আপনারা চিকিৎসা করবেন ভুল, তাতে রোগী সারবে কেন বলুন?

রামবাবু বললেন—আপনি ত বল্‌ছেন নন্দর মাথা অত্যন্ত উর্বর, কিন্তু এতদিন তো তাতে শুধ্ আগাছাই জন্মাতে দেখলুম।

বন্ধুটি বললে—আপনারা যদি আগাছার বীজই বোনেন তাহলে কি আব সু-গাছার প্রত্যাশা করতে পারেন? আসলে জমি প্রস্তুত থাকলেই হল না, তাতে কোন্ সময় কি বীজ বুন্‌তে হবে, তা ভাল করে জানা থাকা চাই।

—তাই সেই নন্দকে আজ স্কুল থেকে বাড়ী ফিরতে দেখে, মনে মনে ভাবলুম—আমার বন্ধুর এই একটি অবিনশ্বর কীর্তি।

কিছুদূর যেতেই দেখি, আমাদের পাড়ার হরেনবাবুর মেয়ে মালবিকা, আমার পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে গিয়ে কলেজে ঢুকল। আমাকে বোধহয় লক্ষ্য করেনি। তাহলে আমার সঙ্গে আলাপ না করে পারত না।

এর বাবার একবার গুরুতর অসুখ হয়েছিল। বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না। আশা না থাকার আর একটা কারণ হল, তখন জীবন এবং অর্থের মধ্যে বড় রকমের এক প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছিল। প্রতিযোগিতার ফলাফলে দেখা গেল জীবনের মূল্য গেছে কমে, জীবন ধারণের মান গেছে বেড়ে। অতএব অর্থই অধিকার করল শ্রেষ্ঠত্বের আসন, যার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে

দেখা দিল উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের ভয়াবহ তুর্ভিক্ষ। পঞ্চাশ লক্ষ নরনারীর কঙ্কালের উপর গড়ে উঠল সাম্রাজ্যবাদের পোষ্যপুত্র পুঁজিবাদের রাজধানী—বিরাট কালোবাজার, যার ফলে একটা হাহাকার স্থায়ী ভাবে বাসা বাঁধতে পেরেছে। একদিকে এ্যাটমিক বম, অপর দিকে কালোবাজারী প্রেতের শোষণ, এই তু'য়ের ধাক্কায়, সমাজের এতদিনকার সুদৃঢ় বনিয়াদ ঝর্ঝর্ করে ভেঙে পড়তে লাগল। সে ভাঙন আজও শেষ হয়নি। হয়ত বা জাতিকে নিঃশেষ না করে এর ভাঙন থামবেও না।

মালবিকার বাবা হরেনবাবুব সঙ্গে বন্ধুর পরিচয়টা স্বার্থ-কেন্দ্রিক। হরেনবাবু বন্ধুর একজন বড় মক্কেলও বলা যেতে পাবে, আবার এককথায় সাব-এজেন্টও বলা যেতে পারে। হরেনবাবুর মাধ্যমে তাদের অফিসের কেরাণীকুলের প্রায় সব কটিই বন্ধুর কাছে ইন্‌সিওর করে তাদের জীবন সম্বন্ধে সিওর হয়েছে। অতএব কার্য উপলক্ষ্যে বন্ধুর হামেশা যাতায়াত ছিল হরেনবাবুর বাড়ীতে। আর সেই সঙ্গে আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে হাজির হতুম।

হরেনবাবুকে এক কথায় একজন গো-বেচারী বলা যেতে পারে। অতএব যুদ্ধেব বাজারে ফালতু আয় থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। সন্তানের মধ্যে পর পর সাতটি কন্যার জন্মদান করেই, হরেনবাবুর স্ত্রী জীবনের ডেড্ ব্রেক্ কসলেন। অতএব মায়ের অবর্তমানে বড় মেয়ে মালবিকার উপরই সংসারের ভার পড়ল। তারপর থেকে সংসার চলছিল যাই হোক মন্দ-মধুর তালে। কিন্তু হরেনবাবু অসুখে প'ড়েই দিলেন সব বানচাল করে। ডাক্তার এলেন, দেখলেন, ব্যবস্থাপত্র দিলেন। কিন্তু অষুধ ? ইন্‌জেক্সন ? পুষ্টিকর পথ্য ? ডাক্তারবাবু সে সম্বন্ধে আর কি বলতে পারেন ! এদিকে তখন বিলাতী অষুধ বা ইন্‌জেক্সন্ পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তার উপর নকল মালের ভয়। ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছিলেন—কোনো অষুধের দোকানের সঙ্গে জানাশুনা থাকলে হয় তো বা পেতে পারেন।

একদিন সকালবেলা পাংশুমুখে মালবিকা এসে হাজির আমাদের বাসায়। তার মুখে সব বিবরণ শুনে বন্ধুটি ও আমি ব্যবস্থাপত্রটি হাতে নিয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম অষুধ অন্বেষণে। প্রথম দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলুম। যে দোকানেই গিয়েছি, সেই দোকানের মালিকই ব্যবস্থাপত্রটি পড়ে 'নেই' ব'লে এমনভাবে ঘাড় ফিরিয়েছেন যার অর্থ বন্ধুটি না বুঝলেও আমি বুঝেছি।

অর্থাৎ এ অষুধ সামনে নেই। পিছনে আছে। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছাতে যে প্রণামীর প্রয়োজন তা আমাদের পকেটে নেই। তাই আমাদের ফিরতে হ'ল।

আমি বন্ধুকে এই কথাটা বলতেই সে আমার উপর খিঁচে উঠল। বললে—এ হতেই পারে না। এরাও তো মানুষ। তোর প্রকৃতিটা ছোট কিনা, তাই তোর স্বভাবই দাঁড়িয়েছে সবাইকে ছোট ভাবা।

কারণ যাদের কাছে গিয়েছিলুম—তারা প্রত্যেকেই বন্ধুর সুপরিচিত। তার উপর একজনের জীবন সংশয়। এমন অবস্থায় অষুধ আছে অথচ অবৈধ অর্থলোভে তা দেবে না বন্ধুটির বিবেচনায় এ হতেই পারে না।

আমি তাকে বলেছিলুম—ছ্যাখ, সময়কালে চোখেয় পর্দা ওল্‌টাতে এদের জুড়ি নেই। স্বার্থের প্রয়োজনে এরা সব পারে।

এদিকে হরেনবাবুও আমাদের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে দ্রুত তালে কাহিল হয়ে পড়তে লাগলেন এবং ডাক্তারবাবু এসে তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে গেলেন—এই ইনজেকশন্‌টা আজকের মধ্যে না দিতে পারলে, রোগী বাঁচানো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

মালবিকা কাঁদ কাঁদ ভাবে আমাদের দিকে চেয়ে বললে—কি হবে!

কি যে হবে, তা তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি। তবু একবার শেষ

চেষ্টা করে দেখা যাক্। বন্ধু ও আমি দুর্গা বলে আর একবার স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তোলপাড় করতে বেরিয়ে পড়লুম।

বন্ধুটি বললে—আমার একজন দূরসম্পর্কের আত্মীয় ডাক্তার আছেন। তার নিজেরই ডিস্‌পেন্সারি আছে। চল দেখি একবার সেখানে।

অবশেষে সেই ডাক্তারবাবুর দয়াতেই ইন্‌জেকশন্‌টি মিল্‌ল। কিন্তু আনতে হল গোপনে। দক্ষিণা যা দেওয়া হ'ল, তাও গোপন রাখতে হ'ল।

হরেনবাবুকে ইন্‌জেকশন্ দেওয়া হ'ল। ডাক্তারবাবুরও হাত যশ বাড়ল। হরেনবাবুও ক্রমে ক্রমে রোগমুক্ত হলেন, কিন্তু সেই আত্মীয়-ডাক্তারটি বন্ধুর চিত্ত থেকে দূর হয়ে গেলেন।

হনুমানের কাছে মন্দোদরী রাবণের মৃত্যুবাণটার কথা বলে দেওয়াতে রাবণ রাজা মৃত্যুকালে খেদের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন—স্ত্রীর কাছে কদাচ গোপন কথা বলবে না। কথাটা ঠিক। অন্ততঃ বন্ধুটির সেই আত্মীয় ডাক্তারবাবুটির বেলায় তা হুবহু মিলে গেল।

ঘটনাটা এই। ইন্‌জেকশন্ আনার ব্যাপার নিয়ে যখন পুরোনো আত্মীয়তাটা বন্ধুর সঙ্গে ঝালিয়েই উঠল, তখন একদিন তাকে এবং আমি যখন সঙ্গে ছিলুম তখন আমাকেও নিমন্ত্রণ করে না খাওয়ালে ব্যাপারটা ভাল দেখায় না। তাই সগৃহিণী ডাক্তারবাবু আমাদের সনির্বন্ধ আমন্ত্রণ জানালেন বিশেষ এক নির্দিষ্ট দিনে তাঁদের বাড়ীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করে তাঁদের কৃতার্থ করতে।

আমি তো রাজী হয়েই আছি। শুধু বন্ধুটিকে নিয়ে যা চিন্তা। দেখি বন্ধুটিও আমার কথায়ই সায় দিল। অতএব নির্দিষ্ট দিনে মধ্যাহ্ন ভোজন করতে কিছুটা সময় থাকতেই গিয়ে হাজির হলুম। ডাক্তারবাবু তখন বিশেষ জরুরী 'কলে' বাইরে গেছেন, আসতে দেরী হবে। তাঁর স্ত্রী আমাদের যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করলেন।

বন্ধুটি তো তাদের আত্মীয়ই। অতএব সঙ্কোচের কোনো প্রশ্ন ছিল না। একথা সেকথার পর, ডাক্তার গৃহিণী সগর্বে তার নূতন কেনা বিছে হারটা আমাদের দেখিয়ে বললেন—এটা ওঁর উপরি টাকা দিয়ে করেছি।

বন্ধুটি বললে—উপরি মানে—ভিজিটের টাকা ?

ডাক্তার-গৃহিণী হেসে মাথা নেড়ে বললেন—উহুঁ, উনি তো হাসপাতালের ডাক্তার, সেখানে রোগীদের জন্যে বাড়ী থেকে যত দামী দামী অষুধ ইন্‌জেক্‌শন্ কিনে দেওয়া হয় তা ওঁরা গোপনে— । বলে এমন ভাবে তিনি হাসলেন যে এত কথার পরও যদি এই সাধারণ কথাটা না বুঝতে পারি তো, আমাদের মত মূর্খ আর এ তুনিয়াতে নেই।

ভরপেটে বন্ধুটি বোধ হয় কথাটাকে গিলতে পারল না। তাই বোধ হয় গলায় আট্‌কে যাওয়াতে বন্ধুটি খানিকক্ষণ 'হা' করে রইল।

তারপর বললে—সেই যে সেদিন ইন্‌জেক্‌শন্‌টা দিলেন—সেটাও কি—

এর জবাবে ডাক্তার-গৃহিণী কথা না বলে শুধু মৃত্থ হাসতে লাগলেন।

বন্ধুটি বললে—তাহলে হাসপাতালের রোগীদের কি দেওয়া হয় ?

এমন সময় ডাক্তারবাবু ফিরে আসতেই, ডাক্তার-গৃহিণী হেসে গড়িয়ে পড়ে স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন—ওগো, বল না গো, হাসপাতালের রোগীদের বাড়ী থেকে দেওয়া দামী দামী অষুধ ইন্‌জেক্‌শন্‌গুলো ছাড়াই কেমন করে তোমরা চিকিৎসা কর।

ডাক্তারবাবু স্ত্রীর সরস কথাটির মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের দিকে চেয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন, এবং আমরা তার দিকে চাইতেই তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে কি যেন বলতে বলতে পোশাক বদলাতে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেলেন।

পথে নেমে বন্ধুটি বললে—দুর্নীতির স্রোত যখন সমাজের প্রতি স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই ধ্বংস আসন্ন হয়ে ওঠে।

সত্যিই, আমি যে আমি, আমারই ইচ্ছে হতে লাগল, যা ইতিপূর্বে ওদের বাড়ী খেয়েছি, সব উগরে দিয়ে আসিগে।

যাই হোক, হরেনবাবু প্রাণে বাঁচলেন, কিন্তু কর্মক্ষমতা একেবারেই হারিয়ে ফেললেন। মালবিকা আবার সেইবারই মেট্রিক পরীক্ষা দেবে। ফী দাখিল করবার টাকা নেই। শেষে বন্ধুই সেই ব্যবস্থা করে দিল।

একদিন রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময়, বন্ধুটি ধর্মতলা দিয়ে আসছিল, হঠাৎ একটা বিশেষ বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে মালবিকাকে নামতে দেখে, বন্ধুটি থম্‌কে দাঁড়াল। বন্ধুর সঙ্গে চার চোখে দেখা হয়ে যাওয়াতে মালবিকা যেন মরমে মরে গেল। বন্ধুটি উপরের দিকে চেয়ে দেখল, সাইন্‌বোর্ডে লেখা আছে—'সায়েন্টিফিক ম্যাসেজ বাথ'। বন্ধুটি মালবিকার মুখের দিকে তাকাতেই ও ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল।

বন্ধুটি বুঝল সব। তাই কোনো কথা না বলে তাকে সঙ্গে নিয়ে এগোল।

পরদিন থেকে বন্ধুটির শুরু হ'ল মালবিকাকে নিয়ে এখানে ওখানে চাকরীর সন্ধানে ঘোরাফেরা করা। অবশেষে বন্ধুর কাছে ইন্‌সিওর করেছেন এমন একজন পদস্থ কর্মচারী মিঃ ভোস্‌কে (বসু ?) ধরে মালবিকার একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দিল।

এই সেই মালবিকা। এখন সে চাকরীও করছে আবার রাত্রে কলেজেও পড়ছে।

বন্ধুটি এই প্রসঙ্গে একদিন বলেছিল—সমাজের পায়ের তলা থেকে মাটি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, যত বড় ইমারতই তৈরী কর না কেন, টিকবে না। সবসুদ্ধ অতলে তলিয়ে যেতে হবে।

মালবিকা আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই, আমি আবার রাস্তা ধরলুম।

এই পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় আর একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলুম। বন্ধুর কাছে তার গল্প করেছিলুম। গল্প করবার প্রয়োজন হয়েছিল এই জন্যে, বন্ধুটি এই নারকীয় দৃশ্য স্বচক্ষে দর্শন করেনি। তখন সে ছিল জেলে বন্দী। সুকৃতির ফলই বলতে হবে তার।

যাই হোক, কাহিনীটি এই—জীর্ণ শীর্ণ একটি স্ত্রীলোক, বয়স অনুমান করা দুঃসাধ্য। ফসিল দেখে বয়স অনুমান করবার মত এই জীবন্ত দেহটার বয়স অঙ্ক কষে বের করাও প্রত্নতত্ত্ব-বিদদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। তারই কোল আশ্রয় করে ততোধিক শীর্ণ একটি ছেলে।

এই জীবন্ত কঙ্কালের শোভাযাত্রা, পথে ঘাটে কতই তো দেখেছি, ফিরেও তাকাইনি। তাকাতে পারিনি। কেমন যেন একটা অশরীরী আত্মার ভয় আমার কাঁধে চেপে বসত।

কিন্তু হঠাৎ ছেলেটির ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ আবেদন কানে যেতেই আমি ফিরে তাকাতে বাধ্য হলুম।

ছেলেটি তার মায়ের কাছে খেতে চাইছে। আবেদন কি দাবি, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। আমার মনে হচ্ছিল, ছেলেটি দাবিই করছে। খেতে পাওয়া তো ছেলেটির জন্মগত অধিকার। মা তাকে সেই খাবার দিতে ন্যায়ত ধর্মত বাধ্য।

এদিকে প্রথমে তার মা তাকে প্রবোধ বাক্য শোনাল। তারপর বললে—এখন একটু কষ্ট করে থাক বাবা, বিকেলে শুনেছি হাটখোলাতে ভিখারী ভোজন হবে। সেখানে নিয়ে যাব। পেটপুরে খেতে পারবি।

কিন্তু স্তোকবাক্যে ছেলে ভুললেও তার পেট ভুলল না। বিকেলে ভূরি ভোজনের আশায় বসে থাকতে সে মোটেই রাজী নয়। পেট তাকে উত্যক্ত করতে লাগল। ক্রমে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে। ছেলেটি যতদূর সম্ভব জোরে চেঁচাতে লাগল। অতএব মা তার বিদ্রোহ দমনের আশু প্রয়োজনীতা অনুভব করলে। তাই ক্ষুধার্ত ছেলের পেটে কিছু না দিয়ে, পিঠের উপর উপর্যুপরি কিল চড় মারতে লাগল।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। ঐ হাড়ের উপর পাতলা চামড়ার আবরণ দিয়ে ঢাকা স্ত্রীলোকটির; মাংসল দেহী যুবতীর রূপটা কল্পনা করলুম। একদিন এর যৌবন ছিল, তারপর শুভ দিনে বিয়ে হল। স্বামীর কত সোহাগ ওর দেহটায় আঁকা হল। এল সন্তান। হল মা। নারীত্বের চরম পরিস্ফুটন। ঐ ছেলেটাকে ঘিরে স্বামীস্ত্রীর কত আনন্দঘন মুহূর্তগুলোর আবর্ত রচনা হল। কত রঙীন স্বপ্ন। চুমোর পর চুমো দিয়েও যেন তৃপ্তি নেই। পূর্ণ সন্তুষ্টি নেই। ইচ্ছে হয় বুক চিরে বুকের মাণিককে ভরে রাখি। তারপর? দেখলুম সেই মা সেই ছেলে, কিন্তু—

শিউরে উঠলুম! এবং যা আমার কোনো দিন হয়নি, তাই হলো। আমার প্রাণে দয়ার সঞ্চার হল। চোখের কোণে বোধ হয় একটু জলও দেখা দিল। পকেটে হাত পুরে দিলুম। দেখলুম মাত্র দুটো পয়সা, তাদের ক্ষুদ্রত্বের বিবেচনায় পকেটের এক কোণে লজ্জায় আত্মগোপন করে আছে।

যা থাকে কপালে বলে পয়সা দুটো তাদের দিতে যাব এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের আহার্য জুটে গেল। রাস্তার সামনের বড় বাড়ীটার ঝি, এক গামলা বাসা ভাত ও কিছু পচা তরকারী ডাষ্টবিনে ফেলতে আসায়, স্ত্রীলোকটি ছেলের অবাধ্যতার শাস্তি মুলতুবী রেখে, ছুটে গেল ঝির কাছে, এবং বহু অনুরোধ উপরোধ করে সেগুলো সংগ্রহ করে আনল।

কিন্তু মায়ের শত ডাকাডাকিতেও ক্ষুধার্ত পুত্র আর চোখ মেলে তাকাল না। যে পৃথিবীকে দেখবার জন্যে সে ডাগর ডাগর দুটো চোখ নিয়ে জন্মেছিল সেই চোখ দুটো বেদনায়, হতাশায়, আঘাতে বন্ধ করেছে। আর সে চোখ খুলবে না। পৃথিবীর এই ভয়াল রূপ আর সে দেখবে না। সে চলে গেছে, যে তাকে পাঠিয়েছিল তার কাছে। সেখানে গিয়ে, সেই স্রষ্টার কাছে সে কৈফিয়ৎ চাইবে—কেন, কেন তুমি আমাকে ঐ নিষ্ঠুর পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলে, যেখানে মানুষ মানুষের বুকের রক্ত সোল্লাসে শোষণ করে? মানুষ মনুষ্যত্বের মাথায় অবহেলে পদাঘাত করে? স্রষ্টা কি কৈফিয়ৎ দেবেন তা জানি না। তবে আমি ছেলেটির উদ্দেশ্যে বললুম—এ মরলিনা তো, বেঁচে গেলি বাবা!

মা ছেলেটার মুখখানা তুলে ধরল। দেখল দুই ফোঁটা বিবর্ণ রক্ত তার গালের দুই কস্ বেয়ে ঝরে পড়েছে!

যে মাটি না দিল তাকে আশ্রয়, না দিল আহার্য, তাকেই সে দুই ফোঁটা রক্ত উপহার দিয়ে গেল!

খানিকক্ষণ মৃত পুত্রের দিকে চেয়ে থেকে, সংগৃহীত পদার্থগুলো গোগ্রাসে গিলতে লাগল তার মা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেকে দুই ফোঁটা জলও টপ টপ করে মৃত পুত্রের মুখের উপর ঝরে পড়ল।

বন্ধুটি শুনে কানে আঙ্গুল দিয়ে বলেছিল—আর বলিসনে, বলিসনে। এ আর শুনতে পারি না। জীবনের এত বড় অপচয় কি কোনো দেশ কল্পনা করতে পেরেছে? অথচ ত্যাখ, আমরা কত নিরীহ জীব, না খেয়ে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল কিন্তু কেউ কারো বাড়ীর হেঁসেলে ঢুকে তাদের ভাতের হাড়িটাকে টেনে আনতে যায়নি বা চেষ্টাও করেনি।

এবার আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে বললুম—চুপ কর, এক্ষুণি পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে।

ছেলেবেলা থেকেই একটা কথা শুনে আস্‌ছি, 'নারীচরিত্র দুর্জ্ঞেয়।' কিন্তু হাতে-কলমে তার প্রমাণ পাইনি কোনোদিন। আর পরীক্ষা করেও দেখিনি কোনোদিন। শুধু বেশী বয়সে বিয়ে করলে লোকে যেমন তার স্ত্রীর গুণাগুণ বর্ণনায় অতিমাত্রায় প্রগল্‌ভ হয়ে ওঠে, তেমনি আমিও একটু বেশী বয়সে কলেজে ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্তি হ'য়ে, শেলী, কীট্‌স্‌, বায়রন, ফ্রয়েড্‌ আউড়ে নারীচরিত্র সম্বন্ধে বন্ধুমহলে তর্ক করতাম মাত্র।

নারী-চরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ও অভিজ্ঞতা আমার ঐ পর্যন্তই। কারণ ঐরূপ দুর্জ্ঞেয় বস্তু বুঝবার মত, মস্তিষ্কের স্থিরতা বা মনের দৃঢ়তা কোনটাই আমার ছিল না।

প্রেম জীবনে যে করিনি এমন নয়। নায়িকা আমার নারী ছিল না, ছিল বালিকা। কিন্তু তার নাড়ীর খবর আমি রাখতুম। তখনো সে রেখে ঢেকে কিছু ব'লতে শেখেনি, মুখ ঘুরিয়ে "যাও তুমি ভারী দুষ্টু" বলবার মত বয়স তার হয়নি। সে ছিল নিতান্তই সরল ও আন্তরিক।

তার ভেতর দুর্জ্ঞেয় বলে কিছুই দেখিনি। আনন্দ হলে হিঃ হিঃ ক'রে হাসত, অভিমান হ'লে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে কেঁদে ফেলত। মায়ের লুকানো আমসত্ত্ব চুরি ক'রে এনে আমাকে খাওয়াত। সে ছিল আমাদেরই পাশের বাড়ীর মেয়ে কাবেরী।

বাল্য-জীবনের পুতুল খেলা থেকে কাবেরীর সঙ্গে আমার ভাব। আমি সাজতুম বর, কাবেরী হ'ত বউ। পুতুল খেলায় দুটি বালক-বালিকা মেতে ছিলুম, হৃদয়-সাগরে ছিল টল্‌টলে জল। সেখানে উজানও বইত না, জোয়ার ভাটাও বইত না। সে ছিল অচঞ্চল, ধীর, স্থিল, পঙ্কিলতামুক্ত। কিন্তু কবে যে তার ভেতরে জোয়ারের ঘোলা জল এসে মিশল, তা টের পাইনি। কিন্তু মনের

একটা পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রেছি। কিশোর জীবনে আমি চাইতুম শুধু কাবেরীকে, কাবেরী চাইত আমাকে। কামনা করতুম উভয়ে উভয়ের সান্নিধ্য। ঝগড়া, মারামারি, চুল ছেড়াছিড়ি বহু করেছি। কিন্তু জলে দাগ কাটার মতই মুহূর্তে তা মিলিয়ে যেত।

ক্রমে দেখলুম, আমার চোখ কাবেরীকে বাদ দিয়ে তার দেহের দিকে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেছে। মন চায় তাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে। দেহ চায়, তার দেহকে স্পর্শ ক'রতে। আগে যে গালে হামেশা চড় দিয়েছি, সেই গালে আজ হাত দিলে কেমন যেন সারা দেহে একটা শিহরণ অনুভব করি। আর যে কাবেরী চড়ের বিনিময়ে চিম্‌টে, কামড় দিয়ে প্রতিশোধ নিত সে এখন কিছুই বলত না। কেমন যেন তার গাল দু'খানা রাঙা হ'য়ে উঠত। যে কাবেরী ফ্রক্ পরত, লাফাত, দৌড়াত, সেই কাবেরী ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ি পরেছে। এখনো অবশ্য মাঝে মাঝে ছুটোছুটি করে বটে, কিন্তু বুকের উপর আঁচলখানা সাবধানে হাত দিয়ে চেপে রাখে।

আমাদের এই দু'টো যৌবনকে আরও সামনে ঠেলে দিয়ে, আর একটা বছর গড়িয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে আমাদের ভেতর বাধা নিষেধের প্রাচীর গড়ে উঠতে লাগল। আমাদের হামেশা দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল।

গ্রামের নির্জন পুকুর-ঘাটটাই ছিল আমাদের গোপন মিলন-ক্ষেত্র। বিকেলে জল আনবার ছল ক'রে, কলসী কাখে কাবেরী পুকুর-ঘাটে আসত, তারপর কলসী ভাসিয়ে দিয়ে দুজনে প্রেম সাগরে ভেসে পড়তুম। বিশেষ কিছুই বলতুম না। একই কথা হয়ত পঞ্চাশ বার করে বলতুম। যাবার সময় দুজনের মাথার চুল এলোমেলো করে দিতুম। বেশ ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ কাবেরী পুকুর-ঘাটে আসাও বন্ধ করে দিল। শুনলুম কাবেরীর বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে। বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। কি করব ভেবে পেলুম না, একবার মনে হ'ল কাবেরীকে নিয়ে কোথাও

চলে যাই। একবার মনে হ'ল দুজনেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি। আবার ভাবলুম কাবেরীর বাবার চক্‌চকে টাকের উপর ইয়া এক ডাণ্ডা মেরে আসি, না হয় কাবেরীর বর যখন আসবে, তখন দূর থেকে নিদেন একখানা থান ইট মেরে তার দফা রফা করে দিই।

কিন্তু মনে যা ভাবা যায়, তাই যদি সকলে ক'রত বা ব'লত, তাহলে পৃথিবীটা এতদিনে একটা স্থায়ী কুরুক্ষেত্রে পরিণত হ'ত। শিক্ষা, সংস্কার, রুচি, নীতিবোধ এই সব গুণাবলী সভ্য মানুষের মধ্যে আছে বলেই মনের ভাব গোপন রেখে, পৃথিবীটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, অথবা পৃথিবীটা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে। অতএব ঐসব গুণাবলীর মধ্যে আমারও বোধ হয় একটা কিছু ছিল যার জন্যে আমি কিছুই করিনি, শুধু মনের জ্বালায় নিজেই জ্বলে মরেছি।

শুভদিনে শুভক্ষণে বাদ্যি-বাজনা শঙ্খধ্বনির মধ্যে কাবেরীর শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হ'ল। শুধু তাই নয়, সেই বিয়েতে আমি নিমন্ত্রণও খেলুম।

গাঁটছড়া বেঁধে স্বামীসহ কাবেরী শ্বশুর-বাড়ী গেল। আমি গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ালুম। কাবেরী আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। তার চুলের গন্ধ আমার নাকে এল। অথচ আমি স্থাণুর মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলুম।

বেশ কিছুদিন 'কাবেরী' 'কাবেরী' ক'রে, বুক চাপড়ে কাটালুম। কবিতা লিখলুম, রাত্রে চুপি চুপি সেই পুকুরঘাটে গিয়ে বসতুম। তারপর একদিন দিব্যজ্ঞান লাভ হলে বুঝতে পারলুম—দূর যাঃ! কোথাকার কে কাবেরী, তার জন্যে কিনা আমার শরীরটাকে আধ-খানা করে ফেললুম! সে মেয়েটা তো দিব্বি স্বামী নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছে। দুত্তোর! বলে সহরে এসে কলেজে ভর্তি হ'লুম।

হয়ত বা কাবেরীও কেঁদে বুক ভাসিয়েছে, ছট্‌ফট্ করেছে, বলির

পাঁঠার মত বাধ্য হয়ে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে খোঁজ আমি নিইনি। বিচারটা একতরফাই করেছি। করেছি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে। মোদ্দা কথা কোনোদিন আর প্রেম করতে যাইনি বা নারী-চরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেও যাইনি। কিন্তু কথাটা বরাবরই শুনে আসছি, নারী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়।

কিন্তু এখন দেখছি—নারী-চরিত্র থেকেও, দরোয়ান শোভিত বিরাট বাড়ীর বিশিষ্ট পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা আরও বেশী দুর্জ্ঞেয়।

এত কথা মনে পড়ল—ঐ রীতা আর তার মাকে এইমাত্র 'সিল্ক-হাউসে' ঢুকতে দেখে।

সেদিন ছিল যেমন ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি, তেমনি শন্‌শনে হাওয়া, আর তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা। সেকেণ্ড-শোতে সিনেমা দেখে, আমরা দুই বন্ধু বাস-ট্রামের আশায় এক গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়ে আরও কিছুটা রাত্রি বাড়িয়ে, যখন একজন পথচারীর মুখে শুনলুম—বাস ট্রাম আসবে না, রাস্তায় যা জল জমেছে, তাতে নৌকো ছাড়া নাকি উপায় নেই, তখন আমরা দুই বন্ধু হতাশভাবে আকাশের দিকে তাকালুম এবং নৌকো বা জাহাজ কোনোটা পাবার আশা না দেখে, চরণতরীতেই দেহখানা ভাসিয়ে দিলুম। শালীনতা বজায় রেখে কাপড় যতদূর সম্ভব উঠিয়ে জুতো হাতে ছপ্‌ছপ্‌ ঝপ্‌ঝপ্‌ করতে করতে মাথায় রুমাল বেঁধে রওনা হ'লুম। কিছুদূর আসতেই মিহি কণ্ঠের কাতর আবেদন কানে এল—দয়া ক'রে একটু শুনুন তো?

বন্ধু ও আমি সচকিতে পথের পাশে চেয়ে দেখি, ফুটপাথের উপর ছোট্ট একটি গাছের তলায়, একটি তরুণী; এক হাঁটু জলের ভেতর, তার পরনের বেনারসীখানাকে একহাতে হাঁটু অবধি তুলে, অন্য হাতে ভ্যানিটি ব্যাগটি মাথার উপর রেখে, বেনারসী ও মাথা ঝম্‌-ঝমে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবছা আলোতে দেখলুম, তরুণীটি সুন্দরী, গায়ে অলঙ্কারের

আমদানী প্রচুর না হলেও, যে ক'খানি আছে তা দামী ও মানানসই। দেখে অভিজাত ঘরের বলেই মনে হ'ল।

আমার মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক্ দিয়ে গেল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করবার আগেই বন্ধুটি ব'ললে—কি ব্যাপার বলুন তো?

তরুণীটি কাতরভাবে ব'ললে—দেখুন, এসেছিলুম সিনেমা দেখতে। ড্রাইভারের গাড়ী নিয়ে আসবার কথা ছিল। কিন্তু জলের জন্যে বোধ হয় আসতে পারছে না। এদিকে রাতও—

বন্ধুটি ব'ললে—তা আমরা আপনার কি উপকার ক'রতে পারি বলুন?

তরুণী কাতরভাবে ব'ল্লে—যদি দয়া করে একটু পৌঁছে দেন।

বন্ধুটি ব'ললে—কোথায় যেতে হবে?

আমি বন্ধুকে সজোরে একটা চিম্‌টি কেটে ফিস্‌ফিস্ করে ব'ললুম—এ নিশ্চয়ই মেয়ে ডাকাত ফাকাত হবে, অতএব—

বন্ধুটি আমার উপদেশ চিরাচরিত প্রথায় অগ্রাহ্য ক'রে ব'ললে—চলুন।

অগত্যা আমিও চ'ললুম।

তারপর মাথার উপরে জল, হাঁটুর নীচে জল, মাঝখানে আমরা তিনটি প্রাণী পাশাপাশি জলকেলি ক'রতে ক'রতে আপাদমস্তক জলময় হ'য়ে যখন চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে এসে পড়লুম, তখন বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে, আর বরাতগুণে একটা ট্যাক্সিও পেয়ে গেলুম।

বাড়ীর সামনে গিয়ে গাড়ী থামল। চেয়ে দেখি এ তো ইট কাঠের গড়া বাড়ী নয়, এ যেন সুদক্ষ শিল্পীর একখানা পটে-আঁকা ছবি।

গাড়ীর শব্দে নেপালী দরোয়ান দরজা খুলেই খটাস্ করে সেলাম করে দাঁড়াল। তরুণীটি গাড়ী থেকে নামতে না নামতে, তার মা সারা মুখে প্রতীক্ষমাণ চরম উৎকণ্ঠা নিয়ে ব'লতে ব'লতে নেমে এলেন—রীতা এলি মা? উঃ! যে ভাবনায় পড়েছিলুম!

গাড়ীটা গেল বিগড়ে, ড্রাইভার কিছুতেই তা ঠিক করতে পারল না ; এদিকে কাকে পাঠাই ? ওঁর আবার সেই বাতের ব্যথাটা বেড়ে গিয়ে—

রীতা ততক্ষণে নেমে আমাদের সাদর আহ্বান জানাতে লাগল—আস্থন, নেমে আস্থন।

রীতার মায়ের এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে এল। আমাদের দিকে চেয়ে রীতাকে কিছু ব'লবার আগেই রীতা ব'ললে—ওঁরাই তো আমায় পৌঁছে দিলেন। তোমার কিন্তু উচিত ওঁদের অভ্যর্থনা করা।

রীতার মা লজ্জিত হ'য়ে বললেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আমার মনের অবস্থা বুঝে আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন। আস্থন আস্থন।

আমরা ততক্ষণে নেমে প'ড়েছি, এদিকে ট্যাক্সি ড্রাইভারের তাগিদ সত্ত্বেও যখন ও-পক্ষ থেকে ভাড়া দেবার উদ্যোগ দেখা গেল না, তখন অগত্যা বন্ধুটিই পকেট থেকে টাকাটা মিটিয়ে দিলে।

তারপর রীতার দিকে ফিরে ব'ললে—মাপ করবেন, আমরা আর দেরী ক'রব না। রাত অনেক হ'ল, যেতেও হবে অনেক দূর।

রীতার মা হেসে বললেন—রাত হয়েছে তাতে কি হয়েছে ? এখানে এসে তো আর জলে পড়নি বাবা। এতক্ষণই বরঞ্চ জলের ভেতর ছিলে।

'আপনি' থেকে একেবারে 'তুমি' সম্বোধন ! অপরিচয়ের ব্যবধান যেন মুহূর্তে টেনে সরিয়ে ফেলে, একেবারে সন্তানের পর্যায়ে এনে ফেললেন। এরপরও চা না খেয়ে গেলে সেটা স্নেহশীলা মাতৃ-হৃদয়কে অপমান করা হয়। তার উপর জলে ভিজে একেবারে কাক ব'নে গেছি, এখন এক কাপ গরম চা পেলে—

কল্পনাতেই শরীর গরম হয়ে উঠল।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বন্ধুটি আমার দিকে ফিরে বললে—কি রে ? কি করবি ?

আমি মনের ভাবটা চেপে গিয়ে ব'ললুম—না, না, না, এত রাত্রে আবার এদের বিব্রত করা—বলে রীতার মায়ের দিকে চাইলুম। রীতার মা একথার কোনো উত্তর দেবার আবশ্যক বোধ করলেন না। তিনি আদেশের সুরে "এস" বলে অগ্রবর্তিনী হলেন, আমরা সারিবদ্ধ ভাবে সুবোধ ছেলের মত তাঁর পশ্চাৎবর্তী হলুম।

উপরের ঘরে আসা মাত্র শুক্‌নো জামা কাপড় এল। পাশের ঘরে গিয়ে আমাদের ভিজে জামা কাপড় ছাড়তে হল। তারপর নানা ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মধ্যে চা, টোষ্ট প্রভৃতির সদ্‌ব্যবহার চলতে লাগল। ভিজে দেহটা মুহূর্তে চাঙা হয়ে উঠল।

পান ভোজন শেষে রীতা ব'ললে—আসুন, বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

পাশের ঘরে এসে দেখলুম, রীতার বাবা, রায়বাহাদুর রণদাপ্রসাদ দত্ত, একখানা বালাপোষ গায়ে দিয়ে, পিঠের নীচে গণ্ডা কয়েক বালিশ দিয়ে, ধনুকের মত হয়ে শুয়ে আছেন।

আমরা যেতেই তিনি হেসে নমস্কার করে বললেন—আসুন আসুন, আমি যে একটু উঠে গিয়ে আপনাদের অভ্যর্থনা করব, তার উপায় নেই। মাঝে মাঝে বাতে এমন পঙ্গু করে ফেলে যে—

আমি বাধা দিয়ে বললুম—থাক্ থাক্, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা যথেষ্ট ইয়ে পেয়েছি, তার উপর আমরা তো ঘরের ছেলের মতই—হেঃ হেঃ হেঃ—। অহেতুক 'হেঃ' 'হেঃ' ক'রে ঘরের ছেলে হবার যেটুকু বাধা ছিল যে, তা উড়িয়ে দিলুম।

বস্তুত, একান্ত অপরিচিতকে অল্পসময়ের মধ্যে কি করে আপনার করে নিতে হয়, তার কায়দা-কানুনগুলো এদের ভাল ভাবেই রপ্ত করা আছে।

রায় বাহাত্বর বললেন—আজ আপনারা যে মহৎ উপকার আমার করলেন—

বন্ধুটি বললে—না না, এর মধ্যে মহত্বের কিছু নেই, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য মানুষের বিপদে এগিয়ে যাওয়া।

রায় বাহাত্বর বললেন—আমার সন্তানের মধ্যে এই একটিই। তাই ওর আবদার খেয়াল কোনোটাতেই আমরা বাধা দিই না।

পিছন থেকে রীতার মা ব'ললেন—বুঝলে, দুষ্টু ছেলেরা তক্ষুণি চলে যেতে চেয়েছিল। বল, এ অবস্থায় ওদের কি আমি দরজা থেকেই বিদায় দিতে পারি ?

রায়বাহাত্বর বললেন—সে কি কথা! আর তাছাড়া তোমার কাছ থেকে এরা পালায়, এদের সাধ্য কি ? বলে হাসলেন !

সত্যিই সাধ্য ছিল না। বিদায় নিয়ে আসবার সময় যখন-তখন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে আমরা ছাড়া পেলুম।

পথে আসতে আসতে বন্ধু ও আমি একযোগে এই সিদ্ধান্তই করলুম যে যদি রীতার মায়ের আহ্বান উপেক্ষা ক'রে আমরা আজ চলে আসতুম, তবে একটি মাতৃহৃদয়ের স্নেহ থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকতুম।

এই গৌরচন্দ্রিকা করতেই যা দেরী হ'ল। কিন্তু তার পরের ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

অতঃপর আমি ঘরের ছেলের মত, বন্ধুকে ঠেলেঠুলে, চা টোষ্ট আরও কত কি খাবার লোভে, রীতাদের বাড়ী প্রায়ই এসে উপস্থিত হ'তে লাগলুম।

রীতার সঙ্গে একেবারে 'মাই ডিয়ার' ভাব। আর তার মায়ের সঙ্গে তো কথাই নেই। আমরা যে গত জন্মে তাঁর আপন গর্ভসম্ভূত সন্তান ছিলুম, এ তো তিনি হলপ্ করে ব'লতেনই, এ জন্মেও যেন একরকম তাই হ'য়ে গেছি। পর-জন্ম সম্বন্ধেও তিনি গভীর আশা পোষণ করতেন।

আর রীতার বাবা? তাঁর রায়বাহাদুর খেতাবটা ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদার নিদর্শন পত্র, প্রৌঢ়ত্বটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার ব্রহ্মাস্ত্র, আর তার বাতের আক্রমণটা সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাঁকে বেকসুর খালাস দেবার পক্ষে অকাট্য যুক্তি। অতএব আমরা তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরে দূরেই রাখতুম।

অল্প কিছুদিন বাদেই কিন্তু এই উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি, মনটা বড়ই বুদ্ধিমান। ভাল-মন্দ যাচাই করবার ক্ষমতা তার অদ্ভুত।

বন্ধু ব'লত—মনটা হ'ল রঞ্জন-রশ্মি। অন্তর্ভেদী ওর দৃষ্টি। আন্তরিকতার মুখোস ও যেমন বুঝতে পারে তেমন আর কেউ পারে না। সবার মনই এক ধাতুতে গড়া। ক্রিয়া এক। কিন্তু সবাই তাকে চিনতে পারে না। অজ্ঞানতায়, অবিদ্যায়, মোহে আচ্ছন্ন থাকে ব'লে তাকে বুঝতে পারে না। তাই বলা হয়, মনকে জানাই হ'ল পরম জ্ঞান লাভ করা, পরম ব্রহ্মকে জানা। তার নির্দেশ মানেই বিবেকের নির্দেশ।

বন্ধুর মতে আমরা বোধ হয় প্রথম দিকে পরম জ্ঞানকে লাভ করতে পারিনি। কিন্তু পরে আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। আস্তে আস্তে ওদের বাড়ী যাবার চাড়টা বন্ধ হ'য়ে গেল। কারণ ইদানীং দেখলাম আমরা গেলে ওরা আর তেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠত না। আর রীতাকেও প্রায়ই বাড়ী পাওয়া যেত না।

যাই হোক, বেশ কিছুদিন বাদে একদিন ভোর বেলা সবেমাত্র চোখ খুলেছি। বন্ধুটি শু'য়ে শু'য়েই ব'ললে—আমার এক মক্কেলের বোনের বিয়ে। আমাকে সবান্ধবে নেমন্তন্ন করেছেন। তা বন্ধু হিসেবে তুই আমার সঙ্গে যাবি নাকি?

আমি গম্ভীর ভাবে উঠে ব'ললুম—দাঁড়া, একবার ডাক্তারখানা থেকে এসে নিই।

বন্ধুটি অবাক হ'য়ে বললে—ডাক্তারখানায় কেন?

আমি তেমনি ভাবে ব'ললুম—একটা জোলাপ নিয়ে আসি।

বন্ধুটি হেসে ফেললে।

একটু অধিক রাত্রে ভোজ সভা থেকে স্ফীত উদরে, হেলে দুলে বন্ধু ও আমি গল্প করতে করতে আসছিলুম। হঠাৎ নামল জোর বৃষ্টি, ছুটে গিয়ে রীতাদের গ্যারেজ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। কিন্তু রীতাদের বাড়ীর ভেতর ঢুকবার ইচ্ছা যেমন আমার ছিল না, তেমনি বন্ধুরও না।

এদিকে বৃষ্টি এক নাগাড়ে পড়েই চল্‌ল, থামবার লক্ষণ দেখছি না। রাস্তায় জল জমে গেছে। কি করব ভাবছি, এমন সময় বৃষ্টির ঝম্‌ঝমি ছাপিয়ে, গাড়ীতে ব্রেক কস্‌বার একটা শব্দ হ'ল। বন্ধু ও আমি সচকিত হয়ে চাইতেই দেখি, রীতাদের দুয়ারের সামনে একখানা সুদৃশ্য মোটর এসে থামল। কৌতূহলী হ'য়ে আমরা দু'জনেই সেই দিকে চেয়ে রইলুম। যা দেখলুম—তাতে ব্রহ্মতালু থেকে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ পায়ের তলা ভেদ করে চলে গেল! দেখলুম সেই একই ব্যাপার সেই একই দৃশ্য। সেই রীতা, একই বেশ পরিধানে। সেই বেনারসী পরা। সিক্ত বসনা, দেহের যৌবন-সম্পদ অত্যন্ত প্রকট।

নেমেই রীতার সেই মন-মাতানো আহ্বান। তবে এ বাংলা ভাষাতে নয়, একেবারে রাষ্ট্রভাষায়,—আইয়ে জী।

মোটর আরোহীর সামান্য আপত্তি তার আকুল আহ্বানে মুহূর্তে খণ্ডন হয়ে গেল এবং গাড়ী থেকে নামতে না নামতেই রীতার মায়ের উৎকণ্ঠিত অবস্থায় আবির্ভাব হল। তারপর সেই একই অভিনয় অন্তে সদলবলে বাড়ীর ভিতর প্রস্থান।

এবারকার শিকারটি বাঙ্গালী নয়, খাঁটি মাড়োয়ারী।

বুঝলুম—আমাদের আদর কেন এত কমে গিয়েছিল। আমাদের কেতাদুরস্ত জামা-কাপড়ের আড়ালে, আমাদের ছেঁড়া গেঞ্জীটা তাদের চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু রায়বাহাদুরের নামের পিতলের ফলকখানা, দেয়ালে তেমনি জ্বল্ জ্বল্ করছে। আমি বললুম—এও কি সম্ভব!

বন্ধুটি গম্ভীরভাবে বললে—বৃষ্টি থেমেছে। নে চল।

বাসায় এসে দুই বন্ধু পাশাপাশি লম্বা হলুম।

বন্ধুটি খানিক বাদে বললে—আশ্চর্য!

আমি পাশ ফিরে শুয়ে বললুম—দুর্জ্ঞেয়।

সেই রীতা আর তার মা, সিল্ক হাউস থেকে একটা প্যাকেট হাতে বেরিয়ে এল। আমি ওদের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে আরো দ্রুত পা চালিয়ে দিলুম। হাঁটতে হাঁটতে আর একটা কথা মনে পড়ে হাসি পেল।

এর কিছুদিন বাদে আমি একদিন বন্ধুকে বলেছিলুম—আচ্ছা, যেদিনই গিয়েছি সেদিনই দেখেছি রীতাদের গাড়ীটা গ্যারেজে রয়েছে। গ্যারেজের দরজাও খোলা থাকে, অথচ রীতা বাড়ী ফেরে ট্যাক্সি করে—ওদের গাড়ী কি রোজই বিগড়ায় নাকি?

বন্ধুটি ঘৃণার সঙ্গে বলেছিল—গাড়ীটা ওদের একটা 'শো' মাত্র। বড়লোকত্বের বিজ্ঞাপন। সকাল থেকে রাত অবধি সাধারণের দর্শনযোগ্য করে গ্যারেজের দরজা খুলে রাখে। আসলে ওই গাড়ীটার মত ওদের সকলেরই কলকব্জা বিগড়ে গেছে। ওরা অচল।

হেঁটে চলেছি, আর বন্ধুর কথা ভাবছি। আর বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠছে—বন্ধুটি এপার ছেড়ে ওপারে চলে গেছে। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালুম!

সাধারণতঃ পৃথিবীতে একই চেহারার দুটি লোক দেখতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টির এ এক অদ্ভুত রহস্য। কিন্তু অনেক সময় একের সঙ্গে অন্যের কিছুটা সামঞ্জস্য দেখা যায়, এবং তাকে দেখলেই, সেই পরিচিত লোকটির কথা মনে পড়ে যায়।

ঐ ফুটপাথে ছাতা মাথায় দিয়ে যে বেঁটে খাট প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি যাচ্ছেন, তাঁকে দেখেই আমাদের মাখনলালের বাবা গিরিধারী পোদ্দারের কথা মনে পড়ে গেল।

সে এক হাস্যকর ইতিহাস। যা অবলম্বন করে দিব্যি এক গল্প রচনা করা যায়।

মাখনলাল বি. এ. পাশ করবার পর, যখন এম. এ. পড়বার সঙ্কল্প করল, তখন তার বাবা বেঁকে বসলেন। ছেলেকে বি. এ. অবধি পড়ানোতেই তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। কারণ তাঁর মতে, তাঁরা যখন লেখাপড়া না শিখেও, ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ দু'পয়সা উপার্জন করতে পেরেছেন তখন মিছিমিছি কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে ছেলেকে স্কুল কলেজে পড়াবার কোনো সার্থকতা তিনি দেখতে পান না। কিন্তু ছেলে গোঁ ধরে বসেছে, পড়বেই। অতএব তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এই ক্ষতি স্বীকার করতে হ'ল।

গিরিধারীবাবু মাখনলালকে বলেছিলেন— আমাদের চৌদ্দপুরুষে যা কেউ কোনোদিন করেনি, তুই তা করেছিস। বি. এ. পাশ করেছিস। আর কি চাই?

গিরিধারীবাবুর ইচ্ছা, ছেলে এখন তার এই বিরাট তেজারতি কারবারটা বুঝে নেয় এবং তিনিও ছেলের হাতে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে, বুড়ো বয়সে পায়ের উপর পা রেখে দিব্যি বসে বসে তামাক টানেন।

কিন্তু মাখনলালের তেজারতির জাবেদা খাতার চেয়ে গল্প কবিতার প্রতিই ঝোঁক প্রবল দেখা গেল। মাখনলাল রীতিমত সাহিত্য নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আসছে। তার মনে মনে ইচ্ছা, এম. এ.-টা পাশ করতে পারলেই, বিলেত থেকে এক পাক ঘুরে এসে পাকা জার্নালিষ্ট হয়ে বসে।

এদিকে বাবাকে যখন সে কিছুতেই রাজী করাতে পারল না তখন একদিন মাখনলাল পালিয়ে কলকাতা চলে এল। কলকাতা

এসে প্রথম কয়েকদিন হোটেলে থাকবার পর, তাদেরই পরিচিত স্বজাতি বিখ্যাত এলাচ-ব্যবসায়ী, নীলরতন ভূঁইয়ার গ্রে-ষ্ট্রীটের বাড়ীতে তাঁর বড় মেয়ে এবং ছোট দু'টি ছেলেকে পড়াবার বিনিময়ে আহার এবং বাসস্থান দুইই মিলে গেল।

মাখনলাল এম. এ.-তে ভর্তি হ'ল।

ভূঁইয়া মশাই ঝুনো ব্যবসায়ী। তিনি ভাবলেন—এম্. এ. পড়ুয়া ছেলে, তার উপর গিরিধারী পোদ্দারের অমন ফলন্ত কারবার! এদিকে বড় মেয়ে আশাটা দেখতে যাই হোক্, অন্ততঃ পনেরটি হাজার টাকা না নিয়ে ঘাড় থেকে নামবে না। তাই ভগবান কোন্ সূত্রে কাকে যে কি লাভ করিয়ে দেন, বলা তো যায় না। ছাতার বাঁটের সন্ধানে আসামের জঙ্গলে গিয়ে আজ তিনিই না এক বিরাট এলাচ-বাগানের মালিক! অতএব ভগবান যা দেন বা ঘটান তাই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করা উচিত।

এদিকে গিরিধারী পোদ্দার, পুত্রের এরূপ অকস্মাৎ অন্তর্ধানে, প্রথমে খুব রাগলেন। মাখনলালের উদ্দেশ্যে বকাঝকা করলেন। এমন কি ত্যজ্যপুত্র করবার হুমকি পর্যন্ত দিতে ছাড়লেন না। তারপর পাঁচজনের প্রবোধবাক্যে রাগের মাত্রাটা কমে এলে, তিনি ব্যবসায়ী বুদ্ধি নিয়ে ভাবতে ব'সলেন—একে তারা মেদাকুলের পোদ্দার বংশ, তার উপর ছেলে বি. এ. পাশ। অতএব তার ছেলে যে বিয়ের বাজারে বেশ চড়া দামেই বিকোবে, এতে আর কিছুমাত্র সংশয় নেই। ইতিমধ্যে সোনারপুরের নবীন সাহা তো তার মেয়ের জন্যে মাখনলালকে চৌদ্দ হাজার টাকা পর্যন্ত দর দিয়ে গেছেন। কিন্তু পোদ্দার মশাই এতে সায় দেননি। তাঁর ব্যবসায়ী জীবনে তিনি বরাবর দেখে এসেছেন—চাহিদার মাল, যত চেপে রাখা যায়, ততই তার দর বাড়ে। চেপে যাবার আর একটি কারণ হ'ল—মাখনকে বি. এ. অবধি পড়াতে আজ পর্যন্ত যত খরচ লেগেছে, পোদ্দার মশাই তার একটা নিখুঁত হিসেব ক'রে

রেখেছেন। এর অন্ততঃ চারগুণ টাকা না পেলে, তিনি ছেলেকে বাজারে ছাড়বেন না। লাভের আশায়ই মানুষ টাকা খাটায়, তার উপর মালের গুরুত্ব তো আছেই।

তাই গিরিধারীবাবু যখন পুত্রের নীলরতন ভূঁইয়ার ওখানে আশ্রয় লাভের কথা শুনলেন, তখন এসব নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাটি না করে, ভূঁইয়া মশাইর ব্যাঙ্কের টাকার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াই প্রয়োজন মনে ক'রলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝলেন এ নীলরতন ভূঁইয়ারই মেয়ে গছাবার কারসাজি।

নীলরতন ভূঁইয়া আজ কলকাতাবাসী হ'লেও, গিরিধারীবাবুদের পাশের গ্রামেই তার পৈতৃক বাড়ী। এবং এই দুই পরিবারের মধ্যে বিলক্ষণ পরিচয়ও ছিল।

তার উপর গিরিধারীবাবুর ভয়ও হ'ল, পাছে ছেলে একেবারেই বিগড়ে গিয়ে একটা যা-তা কাণ্ড করে বসে! আজকালকার ছেলে ছোক্‌রাদের তিনি আধপয়সা দিয়েও বিশ্বাস করেন না।

অতএব অনেক ভেবে চিন্তে পোদ্দার মশাই দু'খানা চিঠি লিখলেন। একখানা নীলরতন ভূঁইয়াকে, অপরখানি পুত্র মাখনলালকে।

নীলরতনবাবুকে লিখলেন—

প্রিয়বরেষু,—

শুনিয়া খুবই সুখী হইলাম, আমার পুত্র শ্রীমান মাখন আপনার ওখানে থাকিয়াই পডাশুনা করিতেছে। অতএব তার বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হইলাম। কারণ আমার ছেলে, আমার কাছে থাকাও যা, আপনার কাছে থাকাও তাই। সুতরাং এ বিষয়ে অধিক কিছু লেখা বাহুল্য মনে করি। ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ করিবার বাসনা রহিল। প্রভুর ইচ্ছায় আমরা সকলে ভাল আছি, আপনারা—ইত্যাদি।

মাখনলালকে লিখলেন—

পরম কল্যাণীয় শ্রীমান মাখন,

তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো দিনই তো আমি যাই নাই। তুমি

পড়িবে, এ তো আনন্দের কথা। আমরা সকলেই তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আছি। তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল কর। তুমি মনোযোগ দিয়া পড়াশুনা কর। খরচপত্রের জন্য চিন্তা করিও না। যখন যা লাগিবে, জানাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পাঠাইয়া দিব। মনেপ্রাণে প্রভুকে স্মরণ রাখিও।—ইত্যাদি।

নীলরতনবাবু উত্তরে লিখলেন—

আপনার কোনো চিন্তা নাই। শ্রীমান মাখনলালকে আমি পুত্রাধিক স্নেহ করি।

মাখনলাল তার বাবাকে লিখল—

ঠিক করিয়াছি বাড়ীর খরচে আর পড়িব না। নিজেই যা হোক করিয়া এম. এ. পরীক্ষাটা দিব। অতএব টাকা পাঠাইবার দরকার নাই।

গিরিধারীবাবু পুত্রের এই চিঠি পেয়ে, তার শত অপরাধ মুহূর্তে ক্ষমা করে ফেললেন। যদি খরচ না দিতে হয়, আর এদিকে যদি ছেলেটা আর একটা পাশ দিতে পারে, তবে মন্দ কি! এদিকেও আরো কিছু দর চড়াতে পারা যাবে। সোনারপুরের নবীন সাহাকে আর একটু মোচড় দিতে পারলেই হেসে-খেলে বিশটি হাজার তার সিন্দুকে এসে যাবে। সবই প্রভুর ইচ্ছা, মানুষ তো নিমিত্ত মাত্র।

দিন চলতে থাকে। মাখনলাল, আশা আর তার ছোট দুটি ভাই শান্তি এবং দুলালকে নিয়মিত পড়ায়, নিজে পড়ে আর সাহিত্য করে। ইতিমধ্যে হাঁটাহাঁটি করে দু'একটা কাগজে সে নিয়মিত লেখা দিতেও আরম্ভ করেছে। তাছাড়া আরও গোটাদুই টিউশনি সে যোগাড় করে নিয়েছে। অতএব তার আনুষঙ্গিক খরচ বেশ ভালভাবেই চলে যেতে লাগল।

ক্রমে যতই দিন যেতে লাগল, বড় মেয়ে আশার পড়বার সময়টা ততই সন্ধ্যা থেকে রাত্রের দিকে গড়িয়ে যেতে লাগল। আশার আর দুটি ভাইকে সন্ধ্যার সময়ই পড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। পড়বার ঘর থেকে আশার বাড়ীর মধ্যে যেতে প্রায়ই বিলম্ব হতে লাগল।

এর কারণ সম্বন্ধে মাখন আশার মাকে বোঝাল—আশার পড়ার চাপটা বেশী। তাই ছেলে দুটিকে আগে পড়িয়ে নিয়ে আশাকে বেশী সময় বসে পড়াতে হয়।

আশার মা আরও যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আশার বাবার ইঙ্গিতে তাকে থামতে হ'ল। নীলরতনবাবু কথার মাঝখানেই বললেন—ঠিকই তো, ভাল করে না পড়ালে পাশ করবে কি করে? তোমার মেয়ের যা মাথা! ওর ভেতর শুধু ঘুঁটে ভর্তি! হুঁ!

এদিকে আগুনের তাতে, মাখন গলে গেল। এবং পাড়া-প্রতিবেশী কর্তৃক দু'চারটে কেলেঙ্কারী হাতেনাতে ধরা পড়বার পর আর চুপচাপ থাকা গেল না।

আশার মা বললেন—অমন লম্পট ছেলের হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে দড়ি-কলসী দিয়ে বিদেয় দেওয়াও ভাল। অমন বিদ্বানের মুখে আগুন!

নীলরতনবাবু চাপা গর্জনে বললেন—আহা-হা, এটা তোমার কাছে দড়ি-কলসী দিয়ে বিদেয় করা হ'ল! স্ত্রী বুদ্ধি আর কাকে বলে! এদিকে যে অন্ততঃ পনেরটি হাজার টাকার গলায় দড়ি পড়বে তা খেয়াল আছে! আমি কোথায় ভাবছি জলে ফুলে সারব। আর উনি এদিকে—হুঁ! যত সব!

· স্ত্রীবুদ্ধির উপর নীলরতনবাবু হাড়ে হাড়ে চটে গেলেন এবং বিয়ে করে যে কি ঝকমারিই করেছেন, তা এই পঞ্চাশ বছর বয়সে আজ তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন।

স্ত্রী বললেন—সে তুমি যাই বল না কেন, এ কিছুতেই হতে পারে না।

নীলরতনবাবু বললেন—তুমি বল কি? এম. এ. পড়ছে ছেলে—

স্ত্রী মুখ ঘুরিয়ে বললেন—বলি এম. এ. ধুয়ে জল খেলেই চলবে নাকি? ও ছোড়াটার মতিগতি যা দেখছি, তাতে কক্ষণো ব্যবসা-

ট্যাবসার ধার ধারবে না। বাপের সঙ্গেও তেমন বনিবনা নেই। ওর হাতে মেয়েটাকে দিয়ে কি শেষে ভিখারী সাজাবে?

নীলরতনবাবু বললেন—পাড়ায় যেরকম কানাঘুষা হচ্ছে, তাতে—

স্ত্রী বললেন—ও দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ওকে এখান থেকে বিদেয় করে দাও।

এইবার যে কথাটা বলি-বলি করেও নীলরতনবাবু বলতে পারেন নি, তাই বলে ফেললেন—এদিকে আমি যে গিরিধারীবাবুকে চিঠি লিখে দিয়েছি, এখন তুমি কি আমাকে অপমান করতে চাও নাকি?

এরপর আর কথা চলে না। স্ত্রী ঝাম্‌টা দিয়ে বললেন—বেশ! যা ভাল বোঝ কর। কিন্তু আমি বলে রাখলুম, এর ফল ভাল হবে না।

নীচের ঘরে তখন মাখনলাল তার সাহিত্যিক সুলভ ভাষায় আশালতার হাত ধরে বললে—আশা, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র আশাভরসা, প্রেরণা। তোমাকেই যদি না পেলুম, তবে জীবনের আর বাকী রইল কি? এই হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকিটুকু? ও আমি এক নিমেষেই—

মাখনলাল বলতে চেয়েছিল—আশাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

কিন্তু নারীসুলভ দুর্বলমনা আশালতা মাখনলালকে আর এই অলক্ষুণে কথাটা শেষ করতে দিলে না। সে চোখ ঘুরিয়ে বললে—আর যদি না পাওয়া কেন? তোমার আমার মধ্যে এক ইঞ্চিও তো তফাৎ নেই। শুধু-শুধু—। বলে যেটুকু ফাঁক ছিল, সেটুকুও ভরাট করে আশালতা মাখনলালকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল।

বসন্তকালটা নিয়ে লোকে কম দাপাদাপি করছে না। বিশেষ করে লেখক মহল।

বসন্তের ছোঁয়াচ থাকে বাতাসে, থাকে ফুলের গন্ধে, থাকে কোকিলের কণ্ঠে। তারই প্রভাব পড়ে মানুষের মনে। অকারণ পুলকে হৃদয় ওঠে ভরে।

বসন্ত আসে মহারাণীর সাজে, তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দিকে দিকে সাড়া জাগে। তাই ফুল দেয় সৌরভ, কোকিল দেয় কণ্ঠ, বাতাস দেয় স্নিগ্ধ পরশ, মানুষ দেয় অন্তর, লেগে যায় আনন্দের মহোৎসব।

মহারাণী দরবারে বসে ঘোষণা করেন—হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় মিলাও, কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ, আঁখিতে আঁখি দিয়ে পান কর আকণ্ঠ প্রেমের অমৃত, আকাশ বাতাস মুখরিত করে গাও মহামিলনের গান।

কিন্তু আমার মতে, বসন্ত কালটা কোনো বিশেষ সময়ের নির্দিষ্ট বাঁধাধরা নিয়মে আসে না। ফুল, কোকিল বা দখিনা বাতাসেই তার অভিব্যক্তি সীমাবদ্ধ নয়।

তার আগমন ঘটে, দীর্ঘ প্রতীক্ষমাণ ক্ষণিক অবসরে, প্রেমিক প্রেমিকার সচকিত মিলন মূহূর্তে। শঙ্কায়, লাজে, স্বরে, ছন্দে, মোহে, রসে, মুহূর্তটা হ'য়ে ওঠে কাব্যময়। বসন্তকাল তখন প্রেমিক-যুগলকে ঘিরে রেখে, বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কানে কানে শুধু একথাই ব'লতে থাকে—সমাজ, সংসার, সংস্কার, মিছে সব, সত্য শুধু দুটি যৌবনের মিলন।

সেইদিনই গিরিধারীবাবুর চিঠি এল। তিনি নীলরতনবাবুর পত্রের উত্তরে লিখলেন—

> আপনার পত্র পাইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইলাম। আপনার মেয়ে আমার ঘরে আসিবে, এ তো সুখের কথা। তবে সম্বন্ধ পাকাপাকি করিবার পূর্বে, দেনা-পাওনার কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেই ভাল হয়।

প্রসঙ্গক্রমে, সোনারপুরের নবীন সাহার চৌদ্দ হাজার টাকা দর দেওয়ার কথাটাও জানিয়ে দিলেন, এবং তিনি যে তাতে স্বীকৃত হননি, তাও জানাতে ভুল করলেন না।

এই চিঠিখানা নীলরতনবাবু তাঁর স্ত্রীর কাছে চেপে গেলেন। তিনি যে জোর দিয়ে বলেছিলেন—বিনাপয়সাতেই মথুরা পার হ'তে পারবেন—এটা তাহলে আর খাটবে না।

নীলরতনবাবু গিরিধারীবাবুকে লিখলেন—

এতদিন লজ্জায় কথাটা লিখিতে পারি নাই আজ বাধ্য হইয়া লিখিতেছি। আপনার পুত্র শ্রীমান মাখনলাল এমন সব কেলেঙ্কারী করিয়াছে যে আমার মান-সম্ভ্রম সকলই ডুবিতে বসিয়াছে। এমত অবস্থায় আপনি যদি আমার পূর্ব প্রস্তাব অনুযায়ী আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলের বিবাহ না দেন, তাহা হইলে আমি আইনের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইব। তাতে আমার যত কলঙ্কই প্রচার হউক না কেন, আপনিও তাহা হইতে রেহাই পাইবেন না। অতএব দেনা-পাওনার কথা আর তুলিবেন না। একটা কথা মনে রাখিবেন—আমরাও গোসাঁঞপুরের ভূঁইয়া বংশ। ধনে, মানে, তেজে, কাহারও চাইতে হীন নই, অতএব এটা ঠিক জানিবেন, আমি মরিলে, আপনাকেও জ্যান্ত রাখিয়া যাইব না, বুঝিয়া কাজ করিবেন।

এই চিঠি পেয়ে, পড়তে পড়তে গিরিধারী পোদ্দার, ক্রোধে অগ্নিশর্মা হ'য়ে চশমাটা একটানে কপালে তুলে দিলেন। খানিক বাদে চশমাটা নাকের ডগায় লাগিয়ে ঘরময় দ্রুত পায়চারী করতে লাগলেন। সারা দিনরাত ভেবে স্থির করে পরদিন তিনি লিখলেন—

নীলরতনবাবু, আপনি স্বচ্ছন্দে আইনের আশ্রয় লইতে পারেন। আমার তাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। আমার ছেলেকে ওখানে বিবাহ করাইব না, আর ইহাও জানিবেন, আপনারা যেমন গোসাঁঞপুরের ভূঁইয়া বংশ, আমরাও তেমনি মেদাকুলের পোদ্দার।

চিঠিখানা লিখেই এক কর্মচারীকে ডেকে তক্ষুণি ডাকে দিতে বলে জোরে জোরে তামাক টানতে লাগলেন পোদ্দার মশাই। কর্মচারীটি জামা গায়ে দিতে ঘরের মধ্যে গেল। এমন সময় মাখনলালের চিঠি এসে হাজির হ'ল। মাখন তার মাকে লিখেছে—

মা, আমি নিশ্চয় জানি, তোমাদের অমত হইবে না। আশা তোমাদের ঘরের উপযুক্তই হইব। বাবাকে আসিয়া দেখিয়া যাইতে বলিও।

গিরিধারীবাবু তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলেন। কর্মচারীটি চিঠি ডাকে দিতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে নীলরতনবাবুকে লেখা চিঠিখানা ফেরত চেয়ে নিলেন। তারপর এঘর ওঘর পায়চারী করতে করতে তিনি ভাবতে লাগলেন—একদিকে নীলরতন ভূঁইয়ার শাসানি, অন্যদিকে পুত্রের চিঠির বয়ান, এই ছু'য়ে মিলে যা যোগফল হয়, তাতে তার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান মাখনলালের সঙ্গে নীলরতন ভূঁইয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশারাণীর শুভ যোগাযোগটাই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, পুত্রের বিনিময়ে বিশটি হাজার প্রাপ্তির আশা করবার প্রশ্ন তো অবান্তরই, সোনারপুরের নবীন সাহার চৌদ্দ হাজারও চুলোয় যাক্, এ যে ছেলেই বেহাত হয়ে পড়বার অবস্থা!

অতএব মনের ছুঃখ মনে চেপে, পোদ্দার মশাই নূতন করে চিঠি লিখলেন—

ভূঁইয়া মশাই,

আপনি যে আমার কতদূর রসিক বেয়াই হইবেন, তাহা আপনার চিঠি পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন আপনারা গোসাঁঞ পুরের ভূঁইয়া বংশ। আরে সেটা কি কেউ অস্বীকার করিতেছে? আমার ভাবী পুত্রবধূ যে গোসাঁঞপুরের নীলরতন ভূঁইয়ারই ঔরসজাত সন্তান, তাতে সন্দেহ থাকিলে কি আর বিবাহের কথাবার্তা চালাইতাম নাকি?

তবে আমিও একটু রসিকতা না করিয়া পারিলাম না। আপনিও জানিয়া রাখিবেন আমরাও মেদাকুলের পোদ্দার, এবং আমার পুত্র শ্রীমান মাখনলাল, আমারই ঔরসজাত সন্তান। অতএব আমরাও কাহারও চাইতে কোনো বিষয়ে খাটো নয়। যাক রসিকতা অনেক করা হইল। এইবার কাজের কথা বলি। আপনার সঙ্গে আত্মীয়তাটাই, আমি আমার বড় পাওনা বলিয়া মনে করি। অতএব আপনি বিবাহের সমস্ত আয়োজন করুন, আমি আসিয়া শ্রীমতীকে আশীর্বাদ করিয়া যাইব।

মাখনলালকে লিখলেন—

বাবাজীবন, তোমার বাড়ীতে আসিবার দরকার নাই। তোমার মাতাকে নিয়া অমি যথাসময়ে কলিকাতায় তোমার মামার বাসায় যাইব। সেখান হইতেই তুমি যাত্রা করিয়া যাইবে।

গিরিধারীবাবু ঝোঁকের মাথায় চিঠি দুখানা লেখেননি। দস্তুর-মত দুদিন ধরে ভেবেচিন্তে স্থির মস্তিষ্কে চিঠি লিখলেন।

কাজেই উভয় কূলেই আনন্দের বান ডাকল। সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মাঝখানে গিরিধারীবাবু নীলরতনবাবুকে লিখে জানালেন—কাজের চাপ বশতঃ এখন আসা সম্ভব হ'ল না। বিবাহের সময়ই আশীর্বাদের কাজটা পূর্বাহ্নে সেরে নেবেন।

মাখনলাল এবং আশা আশার স্বর্ণচূড়ায় গিয়ে বাসা বাঁধল।

এই মাখনলালের সঙ্গে আমার বন্ধুটির সাহিত্যিক হিসাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাখন প্রায়ই আমাদের বাসায় আসত। আমরাও তার ওখানে যেতুম। সুতরাং এই উদ্বাহ পর্বের আগা-গোড়া সমস্তই আমরা জানতুম। অতএব বিয়ের দিন বিয়ের সভায় আমরাও যে বরযাত্রী রূপে বিরাজ করব এতে আর আশ্চর্য কি! কিন্তু আশ্চর্য হবার তখনও কিছু বাকী ছিল।

শুভদিনে শুভক্ষণে, বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ বিয়ের আসরে মুখোমুখি হ'ল। বরবেশী মাখন বিয়ের আসনের উপর বসে। পুরুতঠাকুর তাঁর প্রাথমিক কার্য সম্পাদন করে, কন্যাকে সভাস্থ করতে বললেন।

আমরা বিয়ের পূর্বেই ইতরজনের প্রাপ্যটা ষোলআনা আদায় করে টই টম্বুর উদরে, বিয়ের সভায় এসে শোভা বর্ধন করে বসেছি। সভার এক কোণে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসে গিরিধারীবাবু এবং নীলরতনবাবুর এক জ্ঞাতি ভাই খোসগল্প ও তামাক সেবন দুইই করছেন। তাঁদের ঘিরে উভয় পক্ষের জন-কয়েক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্পে রসান দিচ্ছে। মোটামুটি

বিয়ের সভার বর্ণনাটি এরূপ। আমি একবার গিরিধারীবাবুর দিকে একবার সম্প্রদানরত নীলরতনবাবুর দিকে চেয়ে একটা কথা ভাবতে লাগলুম—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে। এদের দুজনের যুদ্ধ হয়েছে কলম কাগজে। পত্রের পর পত্রাঘাতে উভয়েই জর্জরিত হয়ে অবশেষে সন্ধি।

আমরা মগ্ন হয়ে বিয়ের ক্রিয়াকলাপ দেখছি। পুরুতঠাকুর আর একবার হুঙ্কার ছেড়ে বললেন—লগ্ন বয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি মেয়ে আনুন।

হঠাৎ একটা গোলমালে সচকিত হয়ে সেই কোণের দিকে চেয়ে দেখি—গিরিধারীবাবু হুকো হাতে নিয়ে এই মারি তো এই মরি অবস্থায় তারস্বরে চীৎকার করছেন এবং যতদূর সম্ভব হাত-পা ছুড়ছেন। আর প্রতিপক্ষ, নীলরতনবাবুর জ্ঞাতি-ভাইও দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাফাতে লাগলেন। এতক্ষণ যারা শুধু শ্রোতা হিসাবে তাঁদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তারা দুপক্ষে ভাগ হয়ে, যার যার আস্তিন গুটিয়ে লড়াইয়ের সৈনিক হয়ে গেল।

সবাই সেই দিকে ছুটে গেলুম। নীলরতনবাবুও গেলেন। মাখনও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরুতঠাকুর তাকে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বললেন বিবাহের পূর্বে আসন ত্যাগ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এদিকে কনে আশাকে সাজিয়ে পুরমহিলারা অর্ধেকটা পথ মাত্র এনেছেন, কিন্তু এই আকস্মিক গোলমালে হতবুদ্ধি হয়ে মাঝপথেই থমকে দাঁড়ালেন তারা। পুরুতঠাকুর শুধু এক হাতে মাখনকে ধরে রেখে, আর এক হাত উঠিয়ে মেয়েদের উদ্দেশে যথাসম্ভব চড়াগলায় বলতে লাগলেন—লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, শীগগীর মেয়ে নিয়ে আসুন।

আর লগ্ন! বলে ওদিকে যাচ্ছে দক্ষযজ্ঞ হয়ে!

সমবেত চীৎকার আর লাফালাফির মধ্য থেকে যেটুকু সার

অংশ উদ্ধার করতে পারলুম তা হল এই—কথায় কথায় পোদ্দার মশাই নীলরতনবাবুর সেই জ্ঞাতি-ভাইকে শ্লেষের সঙ্গে বলেছেন—জানি মশাই, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার মত কেলেঙ্কারী, গোসাঁঞপুরের ভূঁইয়াদের এই নূতন নয়।

এই ঈঙ্গিতে যে-কোনো ভদ্রলোকই অপমান বোধ না করে পারেন না। অতএব গোসাঁঞপুরের ভূঁইয়াদের একজন হ'য়ে, জ্ঞাতি-ভাইটিও এত বড় অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি ফোঁস ক'রে উঠে উত্তর দিলেন—মেদাকুলের পোদ্দারদের কথাও জানতে বাকী নেই। মেদাকুল আর গোসাঁঞপুর তো বেশী দূর নয়।

ব্যস্! পোদ্দারমশাই আর বসে থাকতে পারলেন না। তিনি হুকো হাতে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে ব'ললেন—কি! এত বড় কথা! কি করেছে মেদাকুলের পোদ্দাররা, তা বলতে হবে।

জ্ঞাতি ভাইও হঠবার পাত্র নন। তিনিও সমান ভাবে গলা চড়িয়ে ব'ললেন—মেদাকুলের সুরথ পোদ্দারের বিধবা মেয়ে—

তার কথা শেষ না হ'তেই পোদ্দারমশাই হাত-পা ছুড়ে বললেন—কোন হারামজাদা বলেছে, এক্ষুণি তার জিভটা টেনে ছিড়ে ফেল্‌ব!

গালি খেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে জ্ঞাতি-ভাই ব'ললেন—মুখ সাম্‌লে পোদ্দারমশাই! মেদাকুলে আবার ভদ্রলোক আছে নাকি? সব ব্যাটা ছোট লোক।

এর পর তো আর চুপ করে থাকা যায় না। অতএব মেদাকুলের যে যেখানে ছিল, আস্তিন গুটিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে হুঙ্কার ছেড়ে পটা-পট ঘুসি চালাতে লাগল। গোসাঁঞপুরের অধিবাসীরাও এর উপযুক্ত জবাব দিতে লাগল। ইতিমধ্যে পোদ্দারমশাই হাতের থেলো হুকোটা মাটিতে আছড়ে ফেলে খান খান করে দিয়ে, বাবারে মাগোরে ব'লে চীৎকার দিতে দিতে মাটিতে বসে পড়লেন।

নীলরতনবাবু কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে, সক্রিয় হয়ে উঠলেন। একে থামান তো ও ঘুসি মারে, ওকে ধরেন তো এ তেড়ে আসে। একটা হৈ-হট্টগোলের ব্যাপার। রাস্তার লোক এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এই ডামাডোলের মধ্যে পোদ্দার মশাই তাঁর সঙ্গীদের হুকুম দিলেন—ওরে তোরা শীগ্‌গীর মাখনকে নিয়ে পালিয়ে যা! ওরা তাকে খুন করে ফেলবে রে—খুন করে ফেলবে!

এই অবস্থায় মাখনের আশা-ভরসা সিঁকেয় উঠল। চার পাঁচ জন লোক তাকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গাড়ীতে ওঠাল।

বন্ধুটি এক-ফাঁকে আমাকে বললে—কাজটা কিন্তু ঠিক হল না। বিয়েটা হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল।

আমি তাকে টানতে টানতে এনে গাড়ীতে উঠিয়ে বললুম—মাখনলালের বিয়ের চিন্তাটা মুলতুবী রেখে, এখন মাথাটা বাঁচানো আশু প্রয়োজন।

আমরা মাখনকে উদ্ধার করে, বীরদর্পে সদলবলে বিয়ের সভা ত্যাগ করে চলে এলুম।

আসবার পথে গিরিধারীবাবু থানায় নীলরতনবাবু আর তার জ্ঞাতি-ভাইর নামে এক এজাহার দিয়ে এলেন যে, তাঁদের বিয়ের নাম করে ডেকে নিয়ে অন্যায়ভাবে মারপিট করেছে, এবং তাদের কাছে যা কিছু ছিল সমস্ত কেড়ে রেখেছে।

মাখন আগাগোড়া গুম্ হয়েই ছিল, একটি কথাও বলেনি।

তারপর এজাহারের ফল কি হল, মাখনের কি হল, আশারই বা কি হল, তা আর খোঁজ নিইনি। মাখনের সঙ্গে সেইদিন থেকে আর দেখা হয়নি।

তার প্রায় মাস পাঁচ ছয় পরে, হঠাৎ একদিন মাখন এসে আমাদের বাসায় উপস্থিত।

মাখনের কাছে যা শুনলুম তাতে তাজ্জব ব'নে গেলুম!

ব্যাপারটা হচ্ছে এই—সেদিনকার বিয়ের সভার ঝগড়াটা পোদ্দার মশাইর স্বেচ্ছাকৃত ও পূর্বপরিকল্পিত। এইজন্যই তিনি গাঁট থেকে গাড়ী ভাড়া দিয়েও, দেশ থেকে বাছাই বাছাই সব বরযাত্রী নিয়ে এসেছিলেন।

কারণ কুড়ি হাজার টাকার আশা ছেড়ে দিলেও সোনারপুরের নবীন সাহার চৌদ্দ হাজারও ঘরে আসে না যে! তাই ভবিষ্যতের চৌদ্দ হাজার টাকার লোভে, দু' একশ টাকা গাড়ী ভাড়ায় খরচ করাটা এমন কিছু বেশী নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারেন বলেই না আজ তিনি এত বড় তেজারতি কারবারের মালিক। টাকা আগে ছড়াতে হয়। তারপর দু'হাতে কুড়াতে হয়। আর এম. এ. পড়ুয়া ছেলেকেও তিনি এক হাত দেখিয়ে দিলেন—আরে বাপু, এম. এ.-ই পাশ কর আর ডেপুটিই হও, এই মুখ্‌খু বাপের কাছে তুমি চিরদিনই শিশু।

আমি মাখনকে বললুম—তা হঠাৎ এলেন কেন?

মাখন বললে—এসেছি, বিয়ের পাত্রী খুঁজতে।

বন্ধুটি বললে—সে কি! এখনও তাহ'লে তোমার বিয়ে করবার সাধ যায়নি?

মাখন বললে—আমার গেলেও, আমাকে বিয়ে করাবার সাধ বাবার যায়নি। তিনি ঐ সোনারপুরের নবীন সাহার কাছে আমাকে চৌদ্দ হাজার টাকায় বিক্রী করতে কৃতসঙ্কল্প। তাই আমি ঠিক করেছি, বিয়ে ক'রব। তবে ঐ নবীন সাহার মেয়েকে নয়। এমন একটি মেয়েকে আমি খুঁজছি, যার বাবার থাকবে প্রচুর টাকা, আর সেই টাকার একটা প্রধান অংশ দেবে আমার বাবাকে। মেয়েটির কোনো রূপ বা গুণ থাকবে না। শুধু প্রকৃতিটা হবে দজ্জাল ধরনের। পারিস এমন একটি মেয়ে খুঁজে দিতে?

আমি ব'ললুম—তাহ'লে তো খবরের কাগজে 'খাণ্ডার প্রকৃতির একটি পাত্রী চাই' বলে বিজ্ঞাপন দিতে হয়।

, তারপর থেকে মাখনের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তবে লোক-পরম্পরায় শুনেছি, সে তার মনোমত পাত্রীই নাকি খুঁজে পেয়েছে এবং প্রচুর টাকা ও গয়না পোদ্দার মশাইর সিন্দুকে স্থান পেয়েছে। তবে পুত্রবধূর গুণের প্রথম ধাক্কাতেই গিরিধারী পোদ্দার ব্যবসা বাণিজ্য পুত্রের হাতে ছেড়ে দিয়ে সস্ত্রীক বৃন্দাবনবাসী হ'তে বাধ্য হয়েছেন।

আর নীলরতন ভূঁইয়ার মেয়ে আশা, সেই বিয়ের রাত্রেই সবার অলক্ষ্যে গলায় কাপড় বেঁধে নীলরতন ভূঁইয়াকে পনের হাজার টাকার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

বন্ধুটি বলেছিল—মাখনের প্রতিভার ঘটল অপমৃত্যু। আর এমনি করে ও করল আত্মহত্যা। এর চেয়ে গলায় ফাঁসি লাগিয়ে বা পটাসিয়াম খেয়ে, জীবনটাকে শেষ করে দেওয়া মাখনের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল।

মাখনলালের প্রতি আমার যে সহানুভূতি জাগেনি তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী সহানুভূতি জাগল আশার প্রতি। সেই নিরপরাধিনী মেয়েটির শোচনীয় পরিণতির কথাটা ভেবে, কেন জানি না, বুকের মধ্যে একটা ব্যথা পেলুম।

এখানে যে আমাদের মাসীমাকে দেখতে পাব, তা আশা করিনি। গরদের একখানা কাপড় পরা, সিল্কের চাদর গায়ে জড়ানো। গলির ভেতর থেকে এসে রিক্সায় উঠলেন।

আমাদের বাসার ঠিক বিপরীতদিকের বাড়ীতে উনি থাকেন। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু চেহারাটি একেবারে নিটোল। মাথার চুলে পাক ধরেছে। কাঁচা সোনার মত গায়ের রং।

রোজই ভোরে তাঁকে গঙ্গাস্নান করে বাড়ী ফিরতে দেখতুম। বন্ধুটি তাঁকে দেখিয়ে, আমাকে একদিন বলেছিল—বুঝলি, একেই

বলে দেবীমূর্তি। এঁকে মা ছাড়া আর কিছুই ডাকা যায় না। ইচ্ছে হয় মা বলে একদিন ডেকেই ফেলি।

আমি তার ইচ্ছাটাকে আর একটু সীমাবদ্ধ করে দিয়ে ব'ললুম—আজ থেকে এঁকে মা-সীমা বলে ডাকা হোক।

সেই থেকে আমরা ওঁকে মাসীমা বলে ডাকতুম। অবশ্য নিজেদের মধ্যেই সেই ডাকটা সীমাবদ্ধ ছিল। তখন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয়ই হয়নি।

একদিন বেলা প্রায় দু'টোর সময় দুই বন্ধু বাসায় ফিরে, রান্না করবার উদ্যোগ করলুম। সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করে যখন আমাদের গৃহিণীর কাছে এলুম, তখন দেখি তিনি ধর্মঘটের নোটিশ দিয়ে বসে আছেন।

আমাদের একান্ত নির্ভরস্থল, প্রাইমাস্ ষ্টোভটিকে, আমরা গৃহিণীর পদে বরণ করে নিয়েছিলুম।

বন্ধু ও আমি, কত করেই না তার মান ভাঙাতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু সে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মত, সেই যে গোঁসা করে বসে রইল, বার কয়েক ফোঁস ফোঁস করে ওঠা ছাড়া আর কিছুই তার কাছ থেকে আদায় করা গেল না। রেগে গিয়ে বন্ধুটি জোরে জোরে বার কয়েক পাম্প দিতেই, সেও রাগে দপ্ করে জ্বলে উঠল। বন্ধুটি সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে, গৃহিণীর আগ্নেয়-পরশ থেকে আত্মরক্ষা করলে। শেষে বিরক্ত হয়ে বললে—ধ্যেৎ, তোর রান্নার নিকুচি করি। যা, চিড়ে নিয়ে আয়, তাই খাব।

এই সংবাদে পেটের মধ্যের বাইশ ফুট নাড়িটা বাইশ পাক্ দিয়ে যেন ব'লে উঠল—না, না, চিড়ে ফিড়েয় হবে না, আমরা বাঙ্গালীর পেটের নাড়িভুঁড়ি, ভাতই চাই।

আমি বললুম—আচ্ছা, কোনো বাড়ীতে জ্বলন্ত উনুন পাওয়া যায় কিনা, একবার দেখলে হয় না?

বন্ধু বললে—এই ভর দুপুরে কার কাছে বাপু উনুন চাইতে যাবি?

আমি বললুম—ওই মাসীমার বাড়ীতে।

বন্ধু বললে—মাসীমার বাড়ী! কোনো দিন আলাপ নেই পরিচয় নেই, উনি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হবেন, উনুন চাই। যত সব বোগাস্ আইডিয়া! তার চেয়ে চিড়ে খেয়ে থাকা ঢের ভাল।

এসব কাজে বন্ধুর চেয়ে আমিই অগ্রণী। আমি ব'ললুম—তোমার বাপু, চিড়েতে হলেও আমার চলবে না। আমার ভাতই চাই।

দুর্গা বলে মাসীমার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ীর দোর গোড়া পর্যন্ত ঝোঁকের মাথায় এলুম। কিন্তু ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ এসে আমার পা দুটোকে অচল করে দিল। অথচ ফেরবার উপায় নেই, তাহ'লে বন্ধুর কাছে ছোট হ'তে হয়। অতএব সমস্ত সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে একরকম জোর ক'রেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়লুম। এসব ক্ষেত্রে 'ঝাঁ' ক'রে বলে না ফেলতে পারলেই অবস্থাটা আরো করুণ হ'য়ে ওঠে। তাই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যথাসম্ভব কণ্ঠের জড়তা পরিষ্কার ক'রে ডাক দিলুম—মাসীমা বাড়ী আছেন?

অবিলম্বে উপর থেকে সাড়া পেলুম—কে? এবং পরক্ষণে তিনি নীচে নেমে এলেন।

আমাদের পরস্পরের আলাপ না থাকলেও, মুখ চেনা ছিল। তাই হঠাৎ আমাকে দেখে বিস্মিত হ'লেও বিরক্ত হ'লেন না।

তিনি সস্নেহে বললেন—কি বাবা?

আমি একেবারে ঝপ্ ক'রে বলে ফেললুম—উনুন চাই। মানে আপনার উনুনে আঁচ্ আছে তো?

তারপর তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন করবার অবসর না দিয়েই গড়্‌গড়্ ক'রে আমাদের দুরবস্থার কাহিনীটি একরকম মুখস্থ আউড়ে গেলুম।

সমস্ত বিবরণ শুনে, আমাকে যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত ক'রে দিয়ে তিনি বললেন—তোমার বন্ধুটিকে ডেকে নিয়ে এস, আমি

এখানেই সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। তোমাদের আর কষ্ট ক'রতে হবে না। আহা-হা! বেলা গড়িয়ে গেছে! এখনো তোমাদের খাওয়া হয় নি? যাও বাবা, আর দেরী ক'র না।

আমি কিছুক্ষণ 'হা' করে থেকে চট্ ক'রে একটা প্রণাম ক'রেই নাচতে নাচতে বন্ধুকে এই সুখবরটা দিতে ছুটলুম।

কিন্তু বন্ধুটি কোথায় আমার এই কৃতিত্বের জন্যে বাহবা দেবে তা নয়, উল্টে আমাকে যা-তা বলে গালাগাল দিতে শুরু করল! শেষে রেগে বললে—তোর ইচ্ছে হয়, যত খুশি খা গে যা, আমি যাব না। এই ভরদুপুরে একজন ভদ্রমহিলাকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আমি এবার দস্তুরমত রেগে গেলুম—ছ্যাখ্, তোর এই উদ্ভট নীতিজ্ঞানটা মাঝে মাঝে একটু পকেটে পুরে রাখতে পারিস? আরে আমিই কি ছাই বুঝতে পেরেছি, যে তিনি জ্বলন্ত উনুন না দিয়ে, একেবারে আমাদের জ্বলন্ত জঠরে খাদ্য আহুতি দিতে চাইবেন? এখন যদি তাঁব ওখানে না যাওয়া হয়, তাহলে তাঁকে কি অপমান করা হয় না?

বন্ধুটি খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললে—ইডিয়েট!

ইতিমধ্যে সস্নেহ আহ্বান এল—কই, এস বাবা?

উভয়ে চেয়ে দেখি, মাসীমা তাঁর বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের ডাকছেন।

আমি বন্ধুর দিকে আড় চোখে চেয়ে, ঝুপ্ করে ব'সে পড়লুম। বন্ধুটি চট্ করে দাঁড়িয়ে জামাটা পরতে পরতে ব'ললে—ওকি? ব'সলি যে? উনি ডাকছেন—নে চল্।

আমি ব'ললুম—ডাকুন গে—আমি যাব না।

বন্ধুটি আর একবার আমার দিকে রোষকশায়িত নেত্রপাত ক'রে ব'ললে—ইডিয়েট! এবং পর মুহূর্তে সবেগে বের হয়ে গেল। আমিও একগাল হেসে অনুসরণ ক'রলুম।

তারপর কত যত্নেই না মাসীমা আমাদের খাওয়ালেন! আর সেদিন থেকে কি হ'ল জানি না, মাসীমা যে কি চোখেই আমাদের দেখলেন—ব'লতে পারি না। সব সময়ই আমাদের খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন। আমাদের অসুখে বিসুখে অত্যন্ত আকুল হ'তেন। মাসের মধ্যে সাত আট দিন তো তাঁর ওখানে নিমন্ত্রণ বাঁধাই ছিল, তার উপরও ডালের উপর শাকচচ্চড়ি হ'লেই তিনি আমাদের পাঠিয়ে দিতেন। আমরা আপত্তি ক'রলে, তিনি হেসে ব'লতেন—আমার হু'টো লক্ষ্মীছাড়া ছেলেকে না দিয়ে কি খেতে পারি?

ক্রমে বিপদে আপদে আমাদের একটা নির্ভরযোগ্য স্থল হ'য়ে দাঁড়ালেন ঐ মাসীমা।

আমার বন্ধুটি তো এই বলে আমাকে ধন্যবাদ দিত—সত্যিই তুই না হ'লে আমি কিছুতেই যেচে আলাপ করতে পারতুম না। আর তাহলে এরকম একটা মহৎ প্রাণের সান্নিধ্য থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকতুম।

আমিও সময় বুঝে ঠোক্কর দিয়ে বলতুম—কেন, তখন যে বড় 'ইডিয়েট' বলে গালাগাল দেওয়া হ'য়েছিল!

কিন্তু বন্ধু তো বটেই, আমিও যেন মাসীমার সব কথার ভেতর কেমন যেন একটা চাপা তুঃখের আভাস পেতুম।

অবশেষে একদিন মাসীমার সব চেয়ে ব্যথার ইতিহাসটি উদ্ঘাটিত হ'ল। সেই ইতিহাসেব নায়ক হলেন মাসীমার স্বামী অতীশবাবু। আব আমার বন্ধু হ'ল তাঁরই পার্শ্বচরিত্র।

অতীশ চক্রবর্তী। সেই বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অতীশ চক্রবর্তী, যাঁর মাথার মূল্য বৃটিশ সরকারের কাছে দশহাজার টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। বন্ধুটি তাঁর নেতৃত্বেই কাজ ক'রত।

বন্ধুটি তাঁর সম্বন্ধে বলেছিল—আমাদের অতীশদা, যাঁর ডাকে একদিন দেশের যুবশক্তি একই পতাকা-তলে সমবেত হ'য়েছে, যার ইঙ্গিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে, আমরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে

প'ড়েছি। যাঁর পরিচালনা-নৈপুণ্যে কত বড় দুর্ধর্ষ কাজ কত সহজেই না সম্পন্ন ক'রেছি! এই সেই অতীশদা।

মাসীমার পরিচয় আবিষ্কৃত হওয়ার পর অতীশদা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বড় তীব্র হ'ল। বিপ্লব যুগের এদের ক্রিয়া-কলাপগুলো আমার কাছে রহস্য উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর মনে হ'ত। তাই অতীশদা সম্বন্ধে নানা কথা আমি বন্ধুকে খুঁচিয়ে জেনে নিতুম।

এইরকম একদিন আমার প্রশ্নের জবাবে বন্ধুটি অতীশদার স্থিতধী সম্বন্ধে বলেছিল—তবে শোন্, একবার এক মেল ডাকাতির কথা মনে আছে। অতীশদা পূর্বাহ্ণে ম্যাপ প্রস্তুত করে আমাদের স্থান কাল বুঝিয়ে দিলেন। যথাসময়ে আমরা ট্রেনের মেল কামরার আশেপাশের কামরায় উঠে বসলুম। নির্দিষ্ট জায়গায় আসামাত্র, অতীশদা শিকল টেনে গাড়ী থামিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজও শুরু হয়ে গেল। ঠিক চার মিনিটের মধ্যে কাজ সমাধা ক'বে, আমরা ঝুপঝাপ লাফিয়ে পড়ে, জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়লুম। কিন্তু ট্রেনের গার্ড ও অন্যান্য যাত্রীদের চেঁচামেচিতে, ওখানকার স্থানীয় লোকজন এসে জড় হ'তে লাগল। একে দিনের বেলা, তাতে জঙ্গল খুব ঘন নয়, অতএব আমাদের গতিবিধি তাদের কাছে অগোচর রইল না। তারা দ্বিগুণ উৎসাহে আমাদের তাড়া ক'রতে লাগল। আমরা প্রাণপণে ছুট্‌ছি আর অতীশদার নির্দেশে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে আকাশের দিকে গুলি করছি। কিন্তু ফল তাতে মোটেই আমাদের পক্ষে অনুকূল হ'ল না। অনুসরণকারীরা এতে ভীত তো হ'লই না উপরন্তু তারা ক্রমশই দলে ভারী হয়ে আমাদের পেছন পেছন আসতে লাগল। অতিশদা একবার পেছন ফিরে বলতে চেষ্টা করলেন—ভাইসব, আপনারা কেন আমাদের ধরতে চেষ্টা করছেন? আমরা স্বদেশীর লোক। কিন্তু কে কার কথা শোনে! অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের লোক,

অত স্বদেশী ফদেশী বোঝে না। ক্রমে ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমরা একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে পড়লুম। এবার বিপদটা আরো ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল। যাও বা একটু আড়াল আবডাল ছিল, এবার তাও আর রইল না। এদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুট্‌তে গিয়ে, সকলেরই দেহ ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেছে। আমরা অতীশদাকে শেষ চেষ্টাস্বরূপ অনুসরণকারীদের আক্রমণ করতে বল্‌লুম। অতীশদা বললেন—না, দৌড়াও। অতীশদার আদেশ অমান্য করবার সাধ্য আমাদের ছিল না। আমরা যেমন ছুটছিলুম তেমনি ছুটে চ'ললুম। একটু পরে অতীশদা জানতে চাইলেন কার কাছে ক'টা কার্তুজ আছে। দেখা গেল অতীশদাকে নিয়ে মাত্র তিনটে কার্তুজ তিনজনের কাছে অবশিষ্ট আছে। অতীশদা বললেন—এই ক'টা কার্তুজ নিয়ে ওদের আক্রমণ ক'রতে চাও? পেছনের দিকে চেয়ে দেখেছ? দেখেছি তো বটেই, প্রায় পাঁচশ লোকের এক জনতা হাতে লাঠি, বল্লম, বর্শা নিয়ে আমাদের পেছন পেছন আসছে। ক্রমে আমরা একটা বাগানের কাছে এসে পড়লুম। বাগানের ও পাশেই আমাদের শেল্‌টার আছে। অতীশদা হঠাৎ বললেন—ঘুরে দাঁড়াও।

অতীশদা আমাদের একহাতে রিভলবার একহাতে ভোজালি নিয়ে রুখে দাঁড়াতে বললেন। আমরা চট্‌পট্‌ তাই ক'রলুম, এবং এক পা সামনের দিকে দিয়ে, স্পোর্টস্‌ প্রতিযোগিতার মত একসারে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্‌ ক'রতে লাগলুম, কখন ঝাঁপিয়ে পড়বার হুকুম হবে। অতীশদা সবার আগে রিভলবার হাতে দাঁড়ালেন। ইয়া লম্বা পালোয়ানী চেহারা ছিল অতীশদার। পরনে ছিল তাঁর মিলিটারী পোশাক। আমাদের হঠাৎ এভাবে যুদ্ধং দেহি ভাবে দাঁড়াতে দেখে, প্রতিপক্ষ হক্‌চকিয়ে গেল এবং একটা বড় রকমের সংঘর্ষের আশঙ্কা ক'রে, তারা আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে আগে প্রাণ হাতে ক'রে এগিয়ে আসবে—এই নিয়ে ওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে

গেল। এই ভাবে মুখোমুখি আমরা প্রায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইলুম। কোনোদিক থেকেই কোনো কথা নেই। স্থানুর মত নির্বাক, নিষ্ক্রিয়।

হঠাৎ ওদের ভেতর থেকে এক মস্ত জোয়ান গোছের লোক, হাতে একটা বল্লম নিয়ে লাফাতে লাফাতে আমাদের দিকে আসতে লাগল। সে চীৎকার দিয়ে সঙ্গীদের বললে—এগিয়ে এস ভাই সব, গুলির ভয় ক'র না। ওদের গুলি সব ফুরিয়ে গেছে। পেছনের জনতাও এই কথায় চঞ্চল হয়ে উঠল। আমরা শুধু চেয়ে আছি আর অতীশদার হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে উদ্বেগ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছি। লোকটি প্রায় আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। পেছনের জনতাও একটু একটু করে এগিয়ে আসতে লাগল। অগ্রবর্তী লোকটি অতীশদাকে লক্ষ্য করে বল্লম তাক্ করতেই অতীশদার রিভলবার গর্জন করে উঠল।

অতীশদার অব্যর্থ লক্ষ্যে জোয়ান লোকটি ধরাশায়ী হ'ল। খুন হয়েছে দেখে, বাকী জনতা উলটে পেছন ফিরে মরি কি বাঁচি করে ছুটতে শুরু করল।

অতীশদার হুকুমে আমরা চীৎকার দিয়ে ওদের তাড়া করে নিয়ে গেলুম। একটু যেতেই অতীশদা বললেন—ফেরো।

অতীশদার চতুরতার জন্যেই সে যাত্রা আমরা বেঁচে গেলুম। তাঁর জীবনটা একটা ইতিহাস। কত আর বলব!

একসঙ্গে জেলে ছিলুম। জেলের ভেতরও তিনি ছিলেন আমাদের পুরোভাগে। সেখানে বিপদে-আপদে তিনি আমাদের বুক দিয়ে রক্ষা করতেন। চির-বিদ্রোহী মন নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। কোনো অবস্থাতেই তিনি কারো কাছে মাথা নোয়াতে জানতেন না। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, আবার '৪২-এর ডাকে একত্র হয়েছি। আবার জেলে গিয়েছি। তারপর এল স্বাধীনতা ঘোষণার দিন আসন্ন হয়ে। রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের সাফল্যের বার্তা। হাজার হাজার যুবশক্তির মহাযজ্ঞে আত্মাহুতির ফল।

অতীশদাকে বললুম—এবার আমরা ছাড়া পাব।

অতীশদা উত্তরে বললেন—ছাড়া পেয়ে কোথায় যাব? কিই বা করব?

আমরা বললুম—স্বাধীনতা পাচ্ছি—

অতীশদা এ কথায় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

অতীশদার দেহ তখন ভেঙে পড়েছে।

যাই হোক, আমরা ছাড়া পেয়ে যে যার মত যেখানে খুশি চলে গেলুম।

তারপর বহুদিন পর্যন্ত অতীশদার খোঁজ খবর রাখিনি। হঠাৎ একদিন অতীশদার সঙ্গে দেখা কলেজ স্কোয়ারের এক বেঞ্চিতে। দূর থেকে দেখেই আমার কেমন যেন খট্‌কা লেগেছিল। কাছে এসে দেখি, আমার অনুমান যথার্থ। এ আমাদের অতীশদাই। পরনে একটা আধময়লা কাপড়, গায়ে অল্প অল্প ছেঁড়া একটা পাঞ্জাবী, পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডেল, চোখে নিকেলের চশমা, হাতে একখানা লাঠি নিয়ে বসে আছেন। চেহারা জীর্ণ-শীর্ণ, গাল বসে গেছে, চোখ দুটো যেন প্রাণপণে কোটরে প্রবেশ করছে। আমার চোখে জল এসে পড়ল। এই কি সেই অতীশদা! এ যেন অতীশদার ছায়া। এ যেন অতীশদার অতীতের সাক্ষী। তিনি যেন দেশবাসীকে ডেকে বলছেন—আমিও একদিন ছিলুম।

প্রণাম করতেই, খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সে কি দৃশ্য! বহু দুদিনের বহু আপদ-বিপদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, একমাত্র সঙ্গী, অতীশদা! উভয়েরই চোখে অশ্রুর বান ডেকে গেল।

সেই অতীশদা এই! এই পর্যন্ত বলে বন্ধুটি রুদ্ধ গলাটাকে পরিষ্কার করে বললে, অতীশদা ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলেন—এখন কি করছ?

আমি বললুম—ইন্‌সিওরেন্সের দালালি।

সেদিন কথায় কথায় অনেক কিছুই জেনে নিলুম। তারপর আমি বললুম—কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

তিনি বললেন—এই সময় রোজ এখানে আসি, এখানেই এস।

তারপর যেখানে যত চেলা চামুণ্ডা তাঁর ছিল, যাকে পেলুম তাকেই অতীশদার খবরটা দিলুম। সেই থেকে কলেজ স্কোয়ারটাকে আমরাই গুলজার করে রাখতে আরম্ভ করলুম। আমরা প্রস্তাব করলুম—অতীশদাকে কিছু একটা কাজ করতে হবে।

তিনি বললেন—কি করা যায় বল দেখি? দেহেও তেমন আব শক্তি নেই—

আমরা বললুম—টিউশনি।

তিনি বললেন—তা হয়ত পারব।

অতীশদা ছিলেন এম. এ. পাশ। সুতরাং আমাদের সমবেত চেষ্টায় এক বড় লোকের আই. এ. পড়ুয়া মেয়েকে পড়াবার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে হয়ে গেল। মাইনে পঁচাত্তর টাকা। আমরা নিশ্চিন্ত হলুম। তার কয়েকদিন বাদেই, পূজোর আগে আমি বাইরে চলে গেলুম। সেখানে বসেই একদিন পত্রিকায় অতীশদার লোকান্তরের সংবাদটা পেলুম। সংবাদটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আমার চিত্তটাকে বিক্ষিপ্ত করে রাখল বহুদিন। এই পর্যন্ত বলে বন্ধুব গলাটা ধরে এল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধবা গলায় বললে—সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, জীবনের প্রধানতম অংশ যাঁর সাহচর্যে কেটে গেল, তাঁর জীবনেরই একটা প্রধান দিক, আমাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাঁর যে এমন বিদুষী স্ত্রী আছেন, এটা এই আকস্মিকভাবেই জানা গেল। এই পর্যন্ত বলে বন্ধুটি আমার দিকে চেয়ে বললে—মাসীমার সঙ্গে পরিচয়ের তুই হচ্ছিস একমাত্র যোগসূত্র, আর সেইজন্যেই তোর কাছে আমি চিরদিনের জন্যে কৃতজ্ঞ।

তারপরের ঘটনা মাসীমার কাছ থেকেই আমি ও বন্ধুটি শুনেছি। তা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি করুণ।

অতীশদার সঙ্গে মাসীমার বিয়ে হয় তাঁদের কলেজ জীবনে। তখনকার ছাত্র আন্দোলন থেকে উভয়ের হাতে খড়ি। তারপর অতীশদা এম. এ. পাশ করে দেশের কাজে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে, ঘর ছেড়ে বাইরে এলেন, আর মাসীমা বাইরে থেকে ঘরে গেলেন। তখন মাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ তাঁর সর্বাঙ্গে। আর তাঁদের নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য জীবনের ওইখানেই হ'ল সমাপ্তি। মাঝে মাঝে অতীশদা বাড়ী আসতেন, চুপি চুপি আত্মগোপন করে। প্রকাশ্য জীবনযাপন ছিল তাঁর পক্ষে বিপদসঙ্কুল।

তারপর দীর্ঘদিনের মেয়াদে অতীশদা গেলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। বাইরের জগৎ তাঁর কাছে গেল লুপ্ত হয়ে। সেই সময়েই অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে তাঁর বাবা মা পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। নিরূপমা দেবী রইলেন একমাত্র পুত্রকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে। দুঃখ দুর্দশা হ'য়ে রইল তাঁর চিরসঙ্গী।

মাঝখানে অতীশদা ছাড়া পেয়ে বাড়ী এলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই '৪২-এর ডাকে আবার তাঁকে সাড়া দিতে হ'ল।

তারপর এল সেই কালরাত্রি, দুর্যোগ ঘনঘটা যেন ঐ রাত্রিটার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিল।

মুমূর্ষু পুত্রের শিয়রে দীপ জ্বালিয়ে বসে আছেন নিরুপমা দেবী। বাইরে চলেছে ঝড় জলের রুদ্র তাণ্ডব। কেউ দেখবার নেই, খোঁজ নিতে আসবার কেউ নেই। কাউকে ডাকবার সাধ্য নেই। গ্রামের যুবক যারা ছিল, তারা কেউবা মরণপণ সংগ্রামে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছে, কেউ বা গেছে জেলে, কেউ বা পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে ; যারা অবশিষ্ট ছিল, তারাও প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য করতে আসতে পারছে না। কারণ অতীশদার বাড়ীটা ছিল তখন পুলিশের সতর্ক দৃষ্টির আওতায়। নিরুপমা দেবী অসহায়ের মত চেয়ে আছেন মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের মুখের দিকে।

হঠাৎ জানালায় শব্দ হ'ল। সঙ্গে ত্রস্ত চাপা কণ্ঠ। নিরুপমা

দেবী চম্‌কে উঠলেন! আবার শব্দ হ'ল। কে যেন ডেকে উঠল—নিরু!

নিরুপমা দেবীর বুকের মাঝখানটা ধ্বক্ করে উঠল। তিনি উঠে জানালা খুলে দিলেন। পরক্ষণেই একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টার সঙ্গে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন অতীশদা। তাঁর সর্বাঙ্গ বেয়ে যেমন জল পড়ছিল, তেমনি ক্ষত স্থান থেকে পড়ছিল রক্ত। এ যেন লড়াইয়ের সেনাপতি, সদ্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগমন করেছেন।

নিরুপমা দেবী শুধু ব'লতে পারলেন—এসেছ!

অতীশদা মুখে আঙ্গুল দিয়ে ব'ললেন—চুপ! খোকা কই?

নিরুপমা দেবী হাত বাড়িয়ে নীরবে রোগশয্যায় শায়িত পুত্রকে দেখিয়ে দিলেন। অতীশদা ছুটে গেলেন এবং ঝুঁকে দেখতে গিয়েই চম্‌কে বলে উঠ্‌লেন—নিরু, খোকা—!

নিরুপমা দেবী আর্তচীৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুত্রের উপর। কিন্তু তখন সে সকল মায়া মমতার বন্ধন মুক্ত হয়ে পরপারে চলে গেছে। অতীশদা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় সুমুখের দরজাটা ভারী লাথির ঘায়ে মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। ঢুকল সদলবলে পুলিশ অফিসার। এই দুর্যোগও তাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাতে পারে নি। তারা স্ব-স্ব হাতের অস্ত্র উঁচিয়ে অতীশদাকে ঘিরে দাঁড়াল।

অতীশদা পালাবার কোনো চেষ্টা করলেন না, এমন কি পকেটের ভেতর দুটো টোটা-ভর্তি রিভল্‌বারেরও সদ্‌ব্যবহার তিনি করলেন না।

বিষ্ণুদূত যখন তাঁর পুত্রের আত্মাকে ঘর থেকে বের ক'রে স্বর্গের দিকে নিয়ে চল্‌ল—ঠিক তখনই এইসব যমদূতের সঙ্গে অতীশদা ধীরে ধীরে নির্বাক ভাবে বের হয়ে গেলেন জেলখানার দিকে। পিছনে পড়ে রইল মৃত পুত্র আর পুত্র-শোকাতুরা মায়ের মর্মভেদী তীব্র আর্তনাদ!

তারপর স্বাধীনতা লাভের পর, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, অতীশদা নিরুপমা দেবীকে নিয়ে কলকতায় এলেন, এবং এক বস্তী বাড়ীতে একখানা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতে শুরু করলেন। মাসীমা সেলাইয়ের কাজ করতেন, তাই দিয়ে কোনো-মতে তাদের দিন চলতে লাগল।

তার কিছুদিন বাদে, কলেজ স্কোয়ারে বন্ধুর সঙ্গে অতীশদার সাক্ষাৎ, এবং তাদের সমবেত চেষ্টায় এক বড় লোকের বাড়ীতে টিউশনির যোগাড় হ'ল।

কিন্তু সেই টিউশনির টাকা আর অতীশদা ভোগ ক'রে যেতে পারলেন না।

সেই বড় লোকটি কর্মজীবনে ছিলেন একজন নিখাদ ইংরেজ-সেবক, কাজ করতেন বিচার বিভাগে। স্বদেশীওয়ালাদের যেমন তিনি ঘৃণা করতেন মনে প্রাণে, তেমনি উপরওয়ালাদের খুশি করবার জন্যে তাদের শাস্তির ব্যবস্থাও করেছেন মুক্ত হস্তে। এখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত।

কিন্তু অবাক কাণ্ড! স্বাধীনতা পাবার দিন থেকেই তিনি রাতারাতি গোঁড়া দেশভক্ত সেজে বসলেন। গান্ধী-টুপী মাথায় দিয়ে তিনি সভা সমিতিতে বক্তৃতা পর্যন্ত দিতে শুরু করলেন। মনের বাসনা, আগামী নির্বাচনে তিনি দাঁড়াবেন। কি শোক সভায়, কি ভোজ সভায়, কি ঘরোয়া বৈঠকে, পাঁচজন লোকের সামনে কিছু বলতে গিয়েই মাঝখানে তাঁর নিজের কথাটি ঢুকিয়ে দেন—দেখুন, সারা-জীবন বিচার বিভাগে থেকে দেশের সেবা করেছি। এখনো আমার মনে দেশসেবার জ্বলন্ত আগ্রহ র'য়েছে। সত্যি কথা ব'লতে কি, যতই আমার বয়স বাড়ছে, ততই দিন দিন দেশসেবার ইচ্ছাটা তীব্রতর হচ্ছে। আপনাদের পাঁচজনের অনুগ্রহে সে সুযোগ যদি পাই তো ধন্য হব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাই হোক, অতীশদার নাম শুনেই তিনি চিনলেন, এবং

বললেন—Oh! I see! Once he was a great terror to the British Government!

তারপর চাক্ষুস পরিচয়ে একেবারে বিগলিত হ'য়ে গেলেন, এবং বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, তাঁর দৃঢ় মত ব্যক্ত করলেন যে অতীশদার মত লোকদের, দেশের লোকের মাথায় ক'রে রাখা উচিত।

অতীশদা প্রত্যহ নিয়মিত যান। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মশাই, অতীশদার সঙ্গে দেশের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সম্বন্ধে নানারকম গবেষণামূলক আলোচনা করেন। দিন চলতে থাকে।

এদিকে রোগ ব্যাধি যেন সুযোগের অপেক্ষা করেই ছিল। নিরুপমা দেবী পড়লেন কঠিন অসুখে।

ডাক্তার ওষুধের ফর্দ দিলেন। কিন্তু টাকা? অতীশদার টিউশনির এক মাস পূর্ণ হয়েছে। অতএব তিনি ছুটলেন সেই বিচারকের বাড়ীতে। গিয়ে ছাত্রীর মুখে শুনলেন তার বাবা তিনদিনের জন্যে বাইরে কোথায় যেন গেছেন। তিনি না ফেরা পর্যন্ত ও-সম্বন্ধে কিছু হবার উপায় নেই।

কিন্তু রোগ তো এই তিনদিন অপেক্ষা করবে না। সে তার বাহু বিস্তার ক'রে নিরুপমা দেবীকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরল।

তিনদিন কোনোমতে কাটিয়ে অতীশদা আবার ছুটলেন সেই বাড়ীতে। এবারে ভদ্রলোক বাড়ীতেই ছিলেন। দেখা হ'তেই তিনি রূঢ়কণ্ঠে বললেন—আমি অত্যন্ত offended হয়েছি মাষ্টার মশাই! আমার অনুপস্থিতিতে আমার মেয়ের কাছে আপনি টাকা চেয়েছেন! ছিঃ ছিঃ! এ বড় লজ্জার কথা! আর আদব-কায়দা শিখবেনই বা কোত্থেকে! চিরদিন তো জেলে জেলেই কাটালেন।

তাঁর বক্তৃতা-স্রোত থামবার পর, অতীশদার টাকা চাইবার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ চলে গেল। তিনি ফিরে এলেন।

কিন্তু বাড়ীতে এসে স্ত্রীর অবস্থা দেখে, আবার তাঁর চৈতন্য হ'ল—ন্যায্য পাওনা চাইব, এতে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। তিনি আবার গেলেন।

এবার ভদ্রলোককে বাড়ীর সামনে লনেই পাওয়া গেল। তিনি রেগে বললেন—দেখুন, টাকার জন্যে এভাবে যদি তাগাদা দিতে শুরু করেন তো আমি কিছুতেই সেটা বরদাস্ত করব না। তাছাড়া আপনার বোঝা উচিত, এটা পূজোর মাস। ছেলেমেয়েদের জামা শাড়ী কিনতে কিনতেই দফা শেষ। তার উপর বড় মেয়েটার নূতন বিয়ে হয়েছে, সেখানে তো পূজোর তত্ত্ব পাঠাতে এক কাঁড়ি টাকা লাগবে। তাছাড়া বাড়ীটার চারতলার প্ল্যান্ স্যাংশন্ হয়েছে, সেটা আরম্ভ করতে হবে। আপনি বরঞ্চ পূজোর পরই দেখা করবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা, খুকীর জন্যে আর একজন নূতন মাষ্টার রেখেছি। আচ্ছা, নমস্কার।

অতীশদার চোখ দুটো ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ব'ললেন—আমার ন্যায্য পাওনাটা মিটিয়ে দিয়ে, তবে নমস্কারটা দেবেন মশাই।

এতে ভদ্রলোক রেগে গেলেন—কি, আপনি আমাকে শাসাচ্ছেন! সব জায়গাতেই সেই স্বদেশী আমলের গুণ্ডামি পেয়েছেন?

অতীশদা গর্জন করে উঠলেন—শাট্ আপ্! বাজে কথা ব'লবেন না বলে দিচ্ছি। আমার পাওনা টাকা দিন, দিতে হবে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, অতীশদাকে ভালভাবেই চিনতেন। বহু ইংরেজের মুণ্ড নিপাতকারী অতীশদার চোখের দিকে চেয়ে নরম স্বরে ব'ললেন—আমি দেব না কি বলেছি—তবে পূজোটা—

অতীশদা ব'ললেন—আপনার পূজো; তাতে আমার কি? আমার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে, আপনি পূজো করতে পারেন করবেন, না হয় করবেন না।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মশাই ব'ললেন—একটু আস্তে কথা বলুন, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। এত চেঁচালে আমি দরোয়ান ডাকতে বাধ্য হব।

অতীশদার যেন সম্বিৎ ফিরে এল, তিনি টলতে টলতে বাড়ী চলে এলেন। এসে দেখেন তাঁরই এক সহকর্মী কি ক'রে যেন খোঁজ পেয়ে এসে ডাক্তার, অষুধ, পথ্যের ব্যবস্থা করে নিরুপমা দেবীর শুশ্রূষার ভার নিয়েছেন।

অতীশদা তাকে দেখেই আত্মহারা হ'য়ে ব'ললেন—আমাদের জেলে বসেই মরা উচিত ছিল বীরু, জেলে বসেই মরা উচিত ছিল। তারপর সেই ঘটনা আনুপূর্বিক ব'লে তিনি ব'ললেন—আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছিল বীরু। চিরদিন দেশের স্বার্থে লড়াই করেছি, সেখানে কিনা নিজের স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া ক'রে ফেললুম! ছিঃ ছিঃ! নিজেকে বড়ই ছোট মনে হতে লাগল! তাই চলে এলুম।

এই ঘটনার পর থেকেই অতীশদা একেবারে ম্রিয়মান হয়ে পড়লেন। কিছুদিন ধরেই তাঁর পুরোনো হৃদ্‌রোগটা মাঝে মাঝে দেখা দিচ্ছিল। একদিন সে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে অতীশদাকে কাবু করে ফেলল এবং কথা বলতে বলতেই অতীশদা প্রাণত্যাগ করলেন।

যে হৃদয় দিয়েছে তাঁকে বল, দিয়েছে মরণজয়ী সাহস, দিয়েছে অদম্য বিপ্লবী প্রেরণা; যে হৃদয়ে ছিল দেশপ্রীতির অশ্রান্ত প্লাবন, ছিল বন্ধুবাৎসল্যের প্রস্রবণ, সেই হৃদয়, সেই হৃতস্বাস্থ্য অবসরকামী হৃদয়, চিরদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করল। জাতীয় আন্দোলনের একটা বিরাট স্তম্ভ সকলের অলক্ষ্যে ধ্বসে পড়ল। এ যেন প্রবল প্রতাপান্বিত কোনো মহারাজার বহু কীর্তির সাক্ষী, তার বিরাট রাজধানী, মহাকালের কোলে বিলীন হ'য়ে গেল।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মশাই অতীশদার মূল্য দিতে পারলেন না। বোধহয় অমূল্য বলেই, যুগে যুগে প্রতিভার মূল্য কেউ দিতে পারে

না। অথচ অতীশদা দেশকে দিলেন অনেক অমূল্য সম্পদ। তাঁর শক্তি, সামর্থ্য, যৌবন, তেজ, কর্মপ্রেরণা, সমস্ত একত্র ক'রে ত্ব'হাত ভবে তিনি দেশমাতৃকার পায়ে অঞ্জলি দিয়েছেন।

অতীশদার মৃত্যুসংবাদ কাগজে দেখে, বন্ধুটি কলকাতা চলে এল। এসে দেখল শোকসভার আয়োজন করা হয়েছে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, শোকসভায় সভাপতি হলেন সেই ভোট-কামী অবসরপ্রাপ্ত বিচারক মশাই!

বন্ধুটি বীরুবাবুর কাছে সব শুনে মাসীমার খোঁজে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তিনি কলকাতার বাইরে কোনো আত্মীয়ের আশ্রয়ে চলে গেছেন।

অবশেষে তিনি আবিষ্কৃত হলেন আমাদেরই বাসার সুমুখে। ঐ বাড়ীর মালিক মাসীমার এক জ্ঞাতি ভাই। তাঁরা সপরিবারে পশ্চিমে থাকেন। মাসীমার উপর ভার বাড়ীটি দেখাশুনা করা আর ভাড়া আদায় করা।

রিক্সা ঠুন্‌ঠুন্ করে চলে গেল। আমি মাসীমার দিকে চেয়ে চেয়ে অতীশদার বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিলুম। দেখলুম—যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যারই যোজনা হয়েছে। মাসীমার কথা অতীশদার কথা ভাবতে ভাবতে চললুম।

একদিন এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটেছিল এবং সেদিনও এই মাসীমাই আমাদের মত এই ত্ব'টি বেওয়ারিশ জীবের উদরের ক্ষুধা, নিজেব অন্ন দিয়ে মিটিয়েছিলেন।

ঘটনাটি এই—রোজকার মত সেদিনও বন্ধুটি তার কাজের ধান্ধায় টো-টো করতে বেরিয়েছে। আমি আমাদের ষ্টোভটির সাহায্যে ত্বপুরের রান্না প্রস্তুত করে যখন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম, তখন বেলা প্রায় একটা বেজে গেছে। সতৃষ্ণ নয়নে মাছের কালিয়াটার দিকে চেয়ে, জিভটা সজল হয়ে উঠল। কিন্তু প্রথম ভাগে পড়েছি 'স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখিবে'। কারণ তখন পর্যন্ত বন্ধুটির দেখা

নেই। তাই রান্না-বান্না সব ঢেকে রেখে, দুয়ারটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গলির মোড়ে বিড়ি কিনতে গেলুম।

সেখানে গিয়ে পড়লুম আর এক বিপত্তিতে। আমার এক পাওনাদারের সঙ্গে একেবারে চারচোখে মিলন হয়ে গেল। সে কি মধুর দৃশ্য! দুইজনের চোখই বড় হয়ে উঠল। পাওনাদার মনে মনে বললে—এইবার পেয়েছি! আর আমি মনে মনে বললুম—এইরে, সেরেছে!

কিন্তু উভয়েই মনের ভাব গোপন করে একগাল হেসে প্রীতি বিনিময় করলুম। তারপর দু এক কথার পর যতবারই সে টাকার কথা বলতে লাগল ততবারই বাজারের দুর্দিন, সরকারের দোষ ত্রুটি এমন কি মাঝখানে স্বামী বিবেকানন্দের একটা বাণীও আউড়ে ফেললুম। কোনদিকে তার ঝোঁক, সেটা বুঝতে চাইলুম। দেখলুম লোকটার ধর্মের দিকে একটু মতিগতি আছে। অতএব আমিও ঝপ্‌ঝপ্‌ করে ধর্মের সার সার কথাগুলো নানা কথার ছলে বলতে লাগলুম। দেশের ছেলে ছোকরাদের ধর্মের দিকে মতিগতি না থাকার দরুণই যে দেশের এত অধোগতি হচ্ছে তা বিড়িওয়ালাকে সাক্ষী মেনে বুঝিয়ে দিলুম। হিন্দুস্থানী বিড়িওয়ালাও আমার কথা সমর্থন করে মাথা নেড়ে নেড়ে তুলসীদাস থেকে একটা দোহা আউড়ে ফেললে।

যাই হোক, এইভাবে পাওনাদারকে মিষ্টি কথায়, শিষ্ট ভাবে, রুষ্ট না ক'রে, তুষ্ট ক'রে বিদায় দিতে আমার প্রায় এক ঘণ্টা লেগে গেল।

পাওনাদারটি বিদায় হতেই, মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে, বাসার উদ্দেশ্যে গলির ভেতর ঢুকে পড়লুম। পাছে সেই লোকটি পুনরায় ডাক দিয়ে বসে, এই ভয়েও বটে, ক্ষিধের তাড়নায়ও বটে, দ্রুত পদে বাসার দিকে চলতে লাগলুম।

দূর থেকে দেখলুম, আমার বন্ধুটি ঘরের ভেতর না ঢুকে,

বাইরে দরজার পাশে, শুক্‌নো মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি নূতন কোনো বিপদের আশঙ্কায় আরো জোরে পা চালিয়ে দিলুম। কাছাকাছি এসেই উদ্বিগ্ন ভাবে বন্ধুকে জিজ্ঞেস্ করলুম—কিরে, কি ব্যাপার ?

সে ইসারা করে আমাকে ডাকলে। আমি কাছে যেতেই ঘরের ভেতরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিলে। ঘরের ভেতরটায় একবার চোখ বুলিয়েই আমি প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলুম—এরা কারা ?

বন্ধুটি অসহায়ের মত বললে—আমার কোনো আত্মীয় নয়, গ্রাম্যসুবাদে, পিসী বলে ডাকতুম শুধু।

আমি আর একবার ঘরের ভেতরটায় দৃষ্টি পরিক্রমা করে দেখলুম—বন্ধুর পিসী বলে বর্ণিত, স্থূলকায়া হিড়িম্বা সদৃশা মহিলাটি, তার গোটা চার উলঙ্গ ছেলে মেয়েকে আমাদের জন্যে তৈরী দু'বেলাব রান্না কিছু কিছু ভাগ করে তাদের বিরাট 'হা'র ভেতর গুঁজে দিচ্ছেন। তারপর ছেলে মেয়েগুলোকে সেই বাসনের মধ্যেই মুখ ধুইয়ে দিলেন। পরে নিজে সিংহ ভাগ নিয়ে বসলেন। ওর ভেতর থেকে সাত বছরের ছেলেটা বায়না ধরে বললে—মা—আরো খাব।

এতে তার অংশের খাবারে ঘাটতি পড়বার আশঙ্কায় মহিলাটি তার পিঠের উপরে দুম্‌দাম্ করে গোটা কয়েক কিল মেরে তার এই অবৈধ দাবীর শাস্তি দিয়ে, আবার নির্বিকার চিত্তে খেতে লাগলেন। দেখলুম—ডাল, ভাজা, মাছের কালিয়া, একে একে উদর বিবরে চালান হ'য়ে গেল।

ছেলেটা কিল খেয়ে, বিশ্বযোড়া হা করে বিকট চীৎকার করে, মায়ের উদ্দেশ্যে নানা অশ্রাব্য ভাষা প্রয়োগ করতে লাগল। এদিকে তার মেজ ছেলেটা, ছোট ছেলের মাথাটা টপ ক'রে

হাঁটুর নীচে চেপে ধরে মনের আনন্দে তবলা বাজাতে আরম্ভ করল। ছেলেটা তার মাথাটাকে উদ্ধার করবার জন্যে প্রাণপণে হাত পা ছুড়ে চীৎকার দিতে লাগল, মেয়েটা তার মায়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করবার জন্যে সমানে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে শুরু করলে!

মাতৃদেবী কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, গপাগপ্ গ্রাস কটা মুখে পুরে দিয়ে, সেই থালার মধ্যেই মুখটা কোনো মতে ধুয়ে উঠে, ছেলেমেয়েগুলোকে এলোপাথাড়ি কয়েকটা কিল চড় মেরে বিচার পর্ব শেষ ক'রলেন এবং পা ছড়িয়ে বসে পানের ডিবা খুলে পান দোক্তা খেতে বসলেন।

ছেলেমেয়েগুলো একটু পরে চেঁচানি বন্ধ করে, সমস্বরে বলতে শুরু করলে—মা, বড্ড শীত করছে।

কারণ কালটা ছিল মাঘ মাসের পড়ন্ত বেলা।

মহিলাটি পানের ডিবা বন্ধ করে, বললেন—দাঁড়া দেখছি। ঘরের চারদিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—আহা-হা ঘরের যে ছিরি! এখানে কি মানুষ থাকে! ছ্যাঃ ছ্যাঃ!

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল বন্ধুটির সদ্য লণ্ড্রী থেকে আনা ঢোলা পাঞ্জাবীটির উপর। তিনি সেটাকে নামিয়ে পটাপট সূতো ছিড়ে সেই পাঞ্জাবীটার মধ্যে ছোট ছোট ছেলে দুটোকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। নিজে ঘরের কোণ থেকে মাদুরটা বিছিয়ে বাকী ছেলে ও মেয়েটাকে নিয়ে কম্বল মুড়ি দিলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধুটি ও আমি পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম।

বন্ধুটি বললে—এখন উপায় কি করি?

আমি বললুম—কিসের?

বন্ধুটি বললে—আমি যেন না খেয়েও পারলুম কিন্তু তুই?

আমার এমনিতেই পিত্তি তেতে আগুন হয়েছিল, তার ওপর

বন্ধুর এই কথায় আমি হাড়ে হাড়ে চটে গেলুম। বললুম—তুই না খেয়ে থাকতে পারিস, আর আমি পারি না?

বন্ধুটি থতমত খেয়ে বললে—না-না—তা বলিনি—

আমি বললুম—হয়েছে থাম।

এমন সময় ছোট্ট একটি দাঁড়ি চিহ্নের মাথায় ততোধিক ক্ষুদ্র একটি 'ফুলষ্টপ্' বসিয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি আকৃতির একটি পাতলা বেঁটে খাট লোক, মুখময় আধ-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, আধ-ময়লা একটা ফতুয়া গায়ে, কোমরে একটা নীল র‍্যাপার জড়ান, কাপড়টা হাঁটু অবধি তোলা, কেশবিরল চক্‌চকে মাথার উপর ভাঁজ করা একখানা লাল গামছা, কানে একটি পোড়া বিড়ি গোঁজা, পায়ে এক জোড়া রবাব স্যু, এক গাল পান চিবুতে চিবুতে, গোটা চার পাঁচ বোঁচকা দুই কাঁধে ও হাতে ঝুলিয়ে, পিছনে কুলির মাথায় গোটা পাঁচ বাক্স চাপিয়ে এসে উপস্থিত হ'লেন।

এসেই বোঁচকাগুলোকে দুপ্‌দাপ্ ক'রে ঘরের মধ্যে ছুড়ে ফেলে নিজে বোঁচকামুক্ত হয়ে, কুলির মাথা থেকে বাক্সগুলোকে নামালেন। তারপর বহু বাকবিতণ্ডা দরকষাকষি ক'রে তাদের পাওনা থেকে দুটো পয়সা কমে রফা করে তাদের বিদায় দিলেন। তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বললেন—এই যে বাবা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে। এই এলে বুঝি? তা তোমার পিসীর সঙ্গে দেখা হ'ল তো? শিয়ালদা এসেই তোমার পিসী তোমার নাম করে বায়না ধরে বসলে—যদি যাই তো আমার সেই ভাইপোর ওখানেই যাব। কিন্তু তোমার ঠিকানা কোথায় পাই? হঠাৎ দেখা আমাদের নরুর সঙ্গে, সেই সে আমাদের মিত্তির বাড়ীর নরু? তোমরা তো এক সঙ্গেই স্বদেশী করতে। সে-ই তোমার ঠিকানাটা বলে দিলে। এসে দেখি, তুমি নেই, কিন্তু দরজাটা খোলাই ছিল। ঢুকব কি না ভাবছি, তোমার পিসী ব'ললে—ওর ঘরে ঢুকব তাতে কি আর কিন্তু

করবার আছে নাকি! তাই এদের এখানে রেখে, আমি ছুটলুম শিয়ালদা এই মালপত্তর আনতে। তা এস—এস—।

যেন আমরা অতিথি, আর তিনিই গৃহস্বামী। তিনি ঘরের মধ্যে বাক্সগুলোকে ঢুকিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীর দিকে চেয়ে সভয়ে আস্তে আস্তে ডাকলেন—ওগো ঘুমোলে নাকি গো? তা তোমরা তো দেখছি খেয়েছ? কিন্তু আমার জন্যে—ব'লে এঁটো বাসনগুলোর দিকে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চাইলেন।

এমন সময় মেয়েটি কম্বল থেকে মাথা বের করে বললে—মাকে ডাকতে বারণ করেছে। তোমাকে রুটি খেতে বলেছে। বলেই মেয়েটি আবার কম্বলের ভিতর ঢুকে গেল।

ভদ্রলোকটি বোঁচকা খুলে আধ পাউণ্ডের ছুটো রুটি শুধু জলের সাহায্যেই গলাধঃকরণ করে, এক ঘটি জল ঢক্‌ঢক্ করে সাবাড় করে দিলেন। তারপর আর একটা বোঁচকা খুলে হুকো, কল্কি, তামাক, টিকে, বের করে যুৎ হয়ে তামাক সাজতে বসলেন।

বন্ধুটি বললে—এ হচ্ছে ওঁর স্বামী।

আমি বললুম—তা বুঝেছি।

বন্ধুটি বললে—টাকার কুমীর। কিন্তু হাড়কেপ্পন। স্বামী-স্ত্রী মিলে গ্রামটা ভেজে খেয়েছে। হারামজাদার একশেষ। টাকা পয়সা সোনাদানাগুলো বহু আগেই এখানে পাচার করেছে, এখন নিজেরা—

ঘরের ভেতর থেকে পিসে তামাক টানতে টানতে বললেন—বুঝলে বাবা, সব ফেলে একরকম শুধু হাত পায়েই চলে আসতে হ'য়েছে। কিছুই আনতে পারিনি। তা হ্যাঁ বাবা, তোমাদের এখানে আবগারী দোকানটা কোথায়? হেঃ হেঃ জানই তো, তোমার পিসের ওর ছু'এক দম না হলে চলে না।

এমন সময় সস্নেহ আহ্বান শুনে, পেছনে ফিরে দেখি, মাসীমা তাঁর বারান্দা থেকে আমাদের ডাকছেন। আমরা ছুজনেই সেখানে

গেলুম। মাসীমার কাছে গিয়ে রাগে, দুঃখে, পাগলের মত আমি খানিকক্ষণ যা খুশি বললুম।

মাসীমা হেসে বললেন—ছিঃ! খেয়েছেন তো কি হয়েছে।

আমি বললুম—খেয়েছে বলে আমার ক্ষোভ নেই। খাক্, আরো খাক, ঘরের দরজা-জানালাসুদ্ধ খাক্, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওদের ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছে, ওরা এখানেই ওদের পাকাপাকি ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলেছে। কিন্তু তাহলে আমাদের যে বাস্তুচ্যুত হ'তে হ'বে।

বন্ধুটির কাছে ওদের সমস্ত বিবরণ শুনে মাসীমা বললেন—তাহলে এখন আর কিছু বলে কাজ নেই। বিকেলে সুযোগ সুবিধা মত বলে দিলেই হবে। সে কথা যাক্, আর দেরী কর না, হাত মুখ ধুয়ে এস, বেলা যে আর নেই। বলে মাসীমা হেঁসেলে ঢুকলেন।

খাওয়া দাওয়ার পরে, আমি আব বন্ধুটি ভাবতে ব'সলুম—কি উপায়ে এই শ্মশানকালীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মনে মনে অনেক কিছু তর্জমা করতে করতে ঘরের কাছে এসে দেখি, পিসী তার ঘুমন্ত স্বামী বেচারাকে, প্রাণপণে ঠেলছেন এবং নানা রুচিকব ভাষা প্রয়োগ করে তার ঘুম ভাঙাতে.চেষ্টা করছেন।

ঘুমপাড়ানী গান শুনেছি, কিন্তু ঘুমভাঙানী গান যে এত মধুবর্ষী হতে পারে, তা ইতিপূর্বে আর শুনিনি।

কিন্তু ধন্য পিসের ঘুম! যে চীৎকারে 'ফায়ার ব্রিগেড' পর্যন্ত ভুল করে এসে পড়তে পারে, সেরূপ চীৎকারকেও উপেক্ষা করে নির্বিবাদে তিনি নাসিকাগর্জন করতে লাগলেন।

অবশেষে পিসি এক রামঠ্যালা দিয়ে বললেন—মর মিনসে, আমি চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললুম, আর পোড়ারমুখো শুধু নাকের ভেতর হাঁপরই চালিয়ে যাচ্ছে।

পিসে এবার হক্চকিয়ে উঠে, নিদ্রাজড়িত চোখে বোকার মত ফ্যাল্ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন।

পিসী গর্জন করে বললেন—ঘুমোলেই চলবে, না কোথাও একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে?

পিসে বললেন—কেন, এখানে কি হ'ল?

পিসী নাক কুঁচকে বললেন—এখানে! এই নরককুণ্ডের মধ্যে! কক্ষণো না। ওঠ শীগগীর, এক্ষুণি বেরুতে হবে।

পিসে শেষ চেষ্টা করে বললেন—কেন, হ'ল কি তাই বল না?

পিসী বললেন—হ'ল কি! বলি এখানে থেকে কি ছারপোকার পেটে রক্তটুকু দেব না কি? এই দেখ দেখি, কামড়ে কি করেছে? বলে হাতখানা বের করে পিসের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

দেখি, পিসীর হাত ছুখানা চক্কর চক্কর দিয়ে ফুলে উঠেছে।

আমাদের মাছুর ছুটোয় ছিল অসম্ভব ছারপোকা। আমরা ওছু'টো ব্যবহার করতুম না। দেখলুম এতদিন একাদশীর পর ছারপোকাগুলো বেশ তাজা রক্ত দিয়েই পারণ করেছে।

পিসে বললেন—কিন্তু কই—আমাকে তো তেমন—

পিসী ঝঙ্কার দিয়ে বললেন—তোমার তো গণ্ডারের চামড়া। ছারপোকার বাপের সাধ্যি কি ওতে দাঁত ফোটায়!

পিসে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন—তবে কোথায় যাব?

পিসী বললেন—বেলুড়ে আমার ছোট বোন থাকে, সেখানে চল। এক্ষুণি, বেলা থাকতে রওনা হতে হবে। যাও, একটা ঘোড়ারগাড়ী নিয়ে এস।

অতএব পিসেকে উঠতেই হ'ল। পিসীর কথা তো নয়, যেন হাকিমের হুকুম।

আমি বন্ধুকে চিমটি কাটলুম।

অবিলম্বে একখানা ঘোড়ারগাড়ী এল। পিসী তৎপরতার সঙ্গে ছেলেমেয়েগুলো কাউকে ঠ্যাং ধরে, কাউকে চুল ধরে উঠিয়ে বোঁচকা বাঁধতে বসলেন।

ওরে বাবা! চেয়ে দেখি, বন্ধুর সেই পাঞ্জাবীটাও তাদের বোঁচকাবন্দী হতে চলেছে।

আমি বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে তড়াক্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললুম—ও জামাটা দয়া করে নেবেন না।

হঠাৎ আমাকে দেখে পিসী চম্‌কে গেলেন, এবং খন্‌খন্ করে বললেন—ও মা, এ আবার এল কোত্থেকে?

বন্ধুটি পেছন থেকে বললে—ও এখানেই থাকে। এ জামাটা—

পিসী ঝাম্‌টা মেরে বললেন—জামাটা কি আমি গিলে খেয়েছি, না মাথায় করে বিন্দাবন চলেছি! এই নাও না তোমাদের জামা। হুঁ! বলে জামাটা বাঁহাত দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন।

আমি দ্বিরুক্তি না করে ওদের বোঁচকাবুঁচকি এনে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলুম।

সপরিবারে পিসে গাড়ীতে উঠে বন্ধুকে বললেন—যাই বাবা, তোমার পিসীকে নিয়ে আবার একদিন বেড়াতে আসব।

আমি চট্ করে বললুম—আমরা কালই এ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

পিসী বললেন—ভয় নেই বাছা, আমরা হাড়হাবাতে নই। আহা হা—কথার কি ছিরি! হুঁ!

কোচম্যান গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

আমরা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। বললুম—বাব্বাঃ! মস্তবড় একটা ফাঁড়া কেটে গেল!

বন্ধুটি বললে—সত্যিই ওই মাদুর দু'টো ফেলে দে। যা ছারপোকা!

আমি বললুম—উহুঁ। আমি অত অকৃতজ্ঞ নই বাপু। বরঞ্চ মাদুর দুটোকে আমি যত্ন করে টাঙিয়ে রাখব। ছারপোকাগুলো এতদিনে নিমকের দাম রেখেছে।

বন্ধুটি হেসে বললে—নে, ঘেমে গেছিস। সিগারেট খা।

চিন্তায় মগ্ন ছিলুম। বুঝতে পারিনি যে এতটা পথ এসেছি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, এক বিখ্যাত থিয়েটার হলের সামনে এসে পড়েছি।

দেখলুম, তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলেই থিয়েটার দেখতে এসেছে। কেউ একক, কেউ বা সসঙ্গী। আনন্দ উপভোগ করবার, আনন্দ পাবার আগ্রহ সকলেরই সমান। গ্রহণ করবার ক্ষমতা হয়ত সবার সমান নয়। কিন্তু সমস্যা-বিক্ষুব্ধ অন্তরকে, ক্ষণিক আনন্দ দিতে সকলেই সমান তৎপর।

এই থিয়েটার হলে আমি ও বন্ধুটি কত অভিনয় দেখেছি! তাই একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। চেয়ে রইলুম হলটার দিকে।

থিয়েটারের গেটের মাথায় নিয়ন লাইটে লেখা নাটকের নামটা দেখছি, এমন সময় দেখি প্রাণেশবাবু এসে ঢুকলেন। প্রাণেশ মুখার্জী অপেশাদার নাট্য সমাজের একজন প্রখ্যাত অভিনেতা ও পরিচালক। এঁরই পরিচালিত ও অভিনীত একখানা নাটক দেখতে নিমন্ত্রিত হয়ে আমি ও বন্ধুটি এই থিয়েটার হলেই এসেছিলুম। এক দৃশ্যে এক বিকলাঙ্গ সন্তানকে দেখাতে গিয়ে, এরা সত্যিসত্যিই এক বিকলাঙ্গ ছেলেকে একটি দৃশ্যে হাজির করেছিলেন।

তা দেখে বন্ধুটি ব'লেছিল—এ অমানুষিক প্রচেষ্টা এবং শুধু তাই নয়, এরা আর্টকে অপমান করছেন।

আমি বললুম—কেন, বেশ তো বাস্তব প্রয়োগ হচ্ছে।

বন্ধুটি ব'ললে—তাহলে খুনের দৃশ্যেও এরকম বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাব আশা করি।

আমি ব'ললুম—ও বাবা! সেকি!

বন্ধুটি ব'ললে—তাহলেই দাঁড়াচ্ছে আমরা এখানে অভিনয় দেখতে এসেছি। বাস্তবের প্রতিফলন দেখতে এসেছি, বাস্তবকে

নয়। যে অভিনেতা চরিত্রানুযায়ী নিজেকে উপস্থাপন করতে পারে, সে-ই হ'ল সত্যিকারের আর্টিষ্ট। সৃষ্টিকেই বলে আর্ট। খনির সোনা হ'ল বাস্তব, আর সেই সোনা দিয়ে তৈরী গয়না হ'ল আর্ট। এই সুন্দরকে সৃষ্টি করার কৌশল যার যত বেশী আয়ত্ব, সে তত বড় আর্টিষ্ট, তত বড় শিল্পী।

যাই হোক, বন্ধুর কথা ভাবতে ভাবতে তন্ময় হ'য়ে গেলুম। হঠাৎ চম্‌কে উঠলুম, দেখি সেই মহিলাটি এসে রিক্সা থেকে নামলেন। পরক্ষণেই যিনি নামলেন তিনি মহিলাটির স্বামী নন। সেই ভদ্রলোকটি, মহিলাটি যাকে বেণুদা বলে ডাকেন। বেণুবাবু মহিলাটির স্বামীর বন্ধু। পাছে চোখাচোখি হ'য়ে যায়, এই ভয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আড়চোখে তাকিয়ে রইলুম। মহিলাটি বেণুদাকে নিয়ে প্রেক্ষাগৃহের দিকে গেলেন। ভেতরে ঢুকতে গিয়ে কি একটা কথা বলে তুজনেই হেসে উঠলেন। এবং সেই হাসিমুখ নিয়েই প্রেক্ষাগৃহের গর্ভে অদৃশ্য হলেন। বুঝলুম ওদের আনন্দ আজ সীমার মধ্যে বাঁধা নয।

মহিলাটির স্বামী বীরেশ্বরবাবু, এম. এ পাশ, স্বভাবে গোবেচারী, করেন স্কুলের মাষ্টারী, থাকেন সস্ত্রীক বেলেঘাটায়।

মহিলাটির বাবা কেন যে এমন মেয়ের জন্যে অমন একটি নিরেট ভালমানুষ বেছে নিলেন, এর কারণটা কিছুটা হয়তো তিনি জানেন, আর বেশী করে জানেন ঐ বেণুবাবু। কারণ তিনিই তাঁর একদা-সহপাঠী বন্ধু এই বীরেশ্বরবাবুকে খুঁজে বের করে ঘটকালি করেছিলেন।

বীরুবাবু বেলেঘাটায় যে বাড়ীতে বিবাহিত জীবন কাটাচ্ছেন, সেই বাড়ীরই অপর ভাড়াটে অশোকবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুটির ছিল ঘনিষ্ঠতা। সেই সূত্রে, তাঁর ছেলের অন্নপ্রাশনে বন্ধুর সঙ্গে আমিও নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গিয়েছিলুম। আয়োজন সামান্য। নিমন্ত্রিতও বেশী নয়, তাই বেলা এগারটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়ার

পাট চুকে গেল। আমরা দুই বন্ধু, গুরুভোজনের পর, অশোক-বাবুর সামনের ঘরখানা দখল করে খাটের উপর দেহের গুরুভার এলিয়ে দিলুম। আমি চিৎ হয়ে চোখ বুজে, ক্ষণপূর্বের ভুক্ত দ্রব্যের তালিকাটা, মনে মনে পর্যালোচনা করছিলুম, কারণ ভোজ্যবস্তুর এইরূপ পর্যালোচনায় আমি গিলিতচর্বণের সুখ অনুভব করে থাকি।

এমন সময় ঠুং ঠুং চুড়ির আওয়াজ করতে করতে, লঘুপদ সঞ্চারে, কে যেন এসে মিহি কণ্ঠে ডাক দিলেন—ঘুমুচ্ছেন ?

চোখ খুলবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমি জানতুম, এ সম্বোধন আমাকে নয়, আমার পার্শ্ববর্তী লম্বমান বন্ধুকে।

তথাপি কৌতূহল হ'ল। চোখ পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়েই, চোখ বড় করে ফেললুম। দেখলুম এক নারীমূর্তি। একে দুপুরের কড়া রোদ, তার উপর নারীর চোখ-ঝলসান রূপ, সঙ্গে গুরু ভোজনের আয়েশ, সবটা মিলে আমার ডাক ছেড়ে কবিতা ব'লতে ইচ্ছা করতে লাগল। তাই জেনেশুনেই বোকার মত বললুম—আমাকে বলছেন ?

মহিলাটি আমতা আমতা করে বললেন—হ্যাঁ, মানে—

মানেটা অবশ্য আমি বহু পূর্বেই বুঝেছিলুম। তাই তন্দ্রাচ্ছন্ন বন্ধুকে একটা ঠেলা দিয়ে বললুম—ওঠ্, ডাকছেন।

বন্ধুটির তন্দ্রা গেল টুটে। মহিলাটিকে দেখেই ব্যস্তভাবে উঠে বসে বললে—আমাকে ডাকছেন! কেন বলুন তো ?

মহিলাটি বললেন—অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটালুম। কিন্তু কি করব ? আমারও যে এইটুকুই মাত্র অবসর। হ্যাঁ, অশোকবাবুর 'ওয়াইফের' কাছে শুনলুম, আপনি নাকি রেডিওতে গান দেন ? (স্ত্রী এবং বাবা, এই দু'টি কথা বাংলা ভাষায় বলাটা একটা লজ্জার ব্যাপার!)

বন্ধুটি বুঝতে পারল না, কথাটার গভীরতা কতটুকু। তাই বন্ধুটি বললে—হ্যাঁ, তা গান দিই বৈকি!

মহিলাটি বললেন—আচ্ছা, কি রকম প্রোগ্রাম পান ?

বন্ধুটি বললে—মানে, আমার কয়েকজন শিল্পী বন্ধু আছেন। তারা মাঝে মাঝে আমাকে দিয়ে গান লিখিয়ে নেন। তা তারা কোন্ কোন্ মাসে প্রোগ্রাম পান, তা তো জানি না।

মহিলাটি বললেন—ওঃ—, আপনি গান লেখেন! আচ্ছা আপনি মাধুরী মুখার্জীকে চেনেন ? আমার বোন, বেশ ভাল গায়। প্রত্যেক মাসেই ওর প্রোগ্রাম থাকে।

বন্ধুটি তার স্মৃতির সাগর মন্থন করে দেখল, কিন্তু মাধুরীকে কোথাও খুঁজে পেল না। তবু একেবারে নিরাশ করল না। বললে—তা দেখলে নিশ্চয়ই চিনব।

মহিলাটি বললেন—বিয়ের আগে আমিও গাইতুম। তখনকার প্রোগ্রাম দেখে থাকলে মৃদুলা মুখার্জী, মানে আমার নামটা, নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

বন্ধুটি এবার বেশ জোর দিয়েই বললে—হ্যাঁ, দেখে থাকলে নিশ্চয়ই দেখেছি।

মৃদুলা দেবী সখেদে বললেন—বিয়ের আগে সবই ছিল। বেণুদা আমাকে গান শেখাতেন। বেণুবাবুর নাম শোনেন নি ?

বন্ধুটি এবারে আর তত জোর দিয়ে বলতে পারল না। বললে—বেণুবাবু ? মানে আমার সঙ্গে বেণুবাবু নামের দু'তিন জনের পরিচয় আছে। তার মধ্যে কোন্ বেণুবাবু যে আপনার—

মৃদুলা দেবী বললেন—ওই যে গায়ক বেণুবানু, অবশ্য প্রফেশনাল নয়, কিন্তু বড় ভাল গায়। মস্ত ওস্তাদ। বিয়ের আগে কত স্বপ্নই না ছিল! ওঁর সঙ্গে—মানে বেণুদার সঙ্গে, সিনেমা কোম্পানীগুলোর খুব খাতির। আমাকে প্লে-ব্যাকে চান্স দিয়ে দেবেন এতো প্রায় ঠিকই হ'য়ে গেছিল। কিন্তু তখনই বাবা এই বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন।

এমন সময় অশোকবাবুর স্ত্রী কি একটা কাজে এই ঘরে এসে

বললেন—ভাল লোকের সঙ্গেই কথা ব'লছ দিদি। ইনি বড় গুণী লোক। হাত দেখতে জানেন। বলে হেসে চলে গেলেন।

অশোকবাবুর স্ত্রীর এই ইঙ্গিতের অর্থ ছিল—বন্ধুর লোক চিনবার অদ্ভুত ক্ষমতা। কিন্তু মৃদুলা দেবী সে ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন না। তিনি বললেন—না না, আমি কাউকে হাতটাত দেখানো পছন্দ করি না বা বিশ্বাসও করি না। আমাব কপালে কি লেখা আছে, তা আমার জানা হয়ে গেছে। না হ'লে এমন লোকের হাতে পড়ব কেন?

আমি ব'ললুম—তা আপনাকে বুঝি এখন আর তেমন বেরুতে দিচ্ছেন না!

মৃদুলা দেবী বললেন—না না, তা নয়, বাইরে আমি এখনো বেরুই বা বেরোতে পারি, কিন্তু তেমন আর ইচ্ছে হয় না। কি আর হবে, সবই তো গেছে! ব্যর্থ জীবনেব ব্যথা তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠল।

আমি বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখি, তার মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে।

এমনি মনের একচোখা বিচার। ক্ষণপূর্বে যাকে দেখে মনটা তৃপ্তিতে ভ'রে গিয়েছিল, এখন তাব উপস্থিতিটাই যেন অরুচিকর খাদ্যের মত ঠেক্‌ল।

বন্ধু একটা সিগারেট ধরিয়ে বেরিয়ে গেল।

মৃদুলা দেবী বললেন—কোথায় যাচ্ছেন? সত্যিই আপনি হাত দেখতে জানেন না কি?

আমি বাধা দিয়ে বললুম—না না, ও নয়, আমিই যা হোক, একটু-আধটু পারি।

মৃদুলা দেবী আমার দিকে চেয়ে বললেন—তাই নাকি?

তারপর মনের ব্যগ্রতা চেপে রেখে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাতখানা আমার সামনে মেলে ধরলেন।

আমি মৃতুলা দেবীর প্রসারিত হাতের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলুম—গায়ে প'ড়ে আলাপ জমিয়ে, যে মহিলা একজন পুরুষ মানুষের কাছে, তার জীবনের গোপন কথা অসঙ্কোচে ব'লে দিতে পারেন, তিনি কোন শ্রেণীর জীব! অতএব ঝাঁ করে বলে ফেললুম—আপনি জীবনে একটা গুরুতর শক্ পেয়েছেন।

মৃতুলা দেবী প্রতিবাদ করে বললেন—না না, শক্ পাবার মত এমন কিছু আমার জীবনে ঘটেনি।

আমি বললুম—হাতের রেখা কি তাহলে মিথ্যে ব'ল্‌ছে, বল্‌তে চান? সত্যি করে বলুন তো আপনার ঐ বেণুদার সঙ্গে—

মৃতুলা দেবী তাড়াতাড়ি বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা একটু—

আমি বললুম—একটু না, বেশ গভীর।

মৃতুলা দেবী বললেন—দেখুন, সত্যিই ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বাবা কিছুতেই অসবর্ণে মত দিলেন না। তা এখন আর তাকে আমি তু'চোখে দেখতে পারি না। অমন কাওয়ার্ডকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। এখনো মাঝে মাঝে ওঁর বন্ধুর কাছে, মানে আমার স্বামীর কাছে আসেন বটে, কিন্তু আমি—

এমন সময় কিছু দূরে গাড়ীর তীব্র হর্ণ বেজে উঠল। মৃতুলা দেবী হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন—আচ্ছা, বড্ড বিরক্ত করলুম। আমার এক্ষুণি বেরুতে হবে। বেলা দেড়টা! মাই গড! উনি গেলেন কোথায়? বাইরে বুঝি? আচ্ছা ব'লবেন তাঁকে। নমস্কার।

মৃতুলা দেবীর প্রসাধনের জন্যে ঘরের মধ্যে গমন, বন্ধুর প্রবেশ, আর আমার বাইরে নির্গমন, প্রায় একসঙ্গেই ঘটে গেল। আমার মাথায় এক শয়তানী বুদ্ধি জাগল, আমি রাস্তার দিকে দ্রুতপদে গেলুম। গিয়ে দেখি, এক মোটর-আরোহী যুবক অসহিষ্ণুভাবে পথের দিকে চেয়ে আছেন।

আমি গিয়ে ভাল-মানুষের মত বললুম—আপনার নাম বেণুবাবু তো ?

যুবকটি থতমত খেয়ে বললেন—হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

আমি বললুম—মৃদুলা দেবী আজ যেতে পারবেন না—বলে পাঠিয়েছেন। আমি সেই সংবাদবাহক মাত্র।

এ সংবাদে বেণুবাবুর মাথায় বজ্রপাত হল। খানিকক্ষণ হা করে থেকে হঠাৎ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন—এটা কি রকম হল ? টিকিটের দামগুলো জলে গেল তো ? যত সব ইয়ে—

এই পর্যন্ত বলে বোধ হয় তাঁর বুদ্ধি ঘটে এল। বললে না—তা আপনি তার কে হন ?

এবার আমি পলায়নই উচিত মনে করলুম। ফিরে যেতে যেতে বললুম—না তেমন কিছু হই না, তবে মৃদুলা দেবীকে নিয়ে আমাদের আজ বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার—

ও বাব্বাঃ ! চেয়ে দেখি, স্বয়ং মৃদুলা দেবী হেলেদুলে এদিকেই আসছেন ! আমি পাশ কাটিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলে গেলুম।

ঘরে এসে দেখি, বন্ধুটি চোখ বুজে পুনরায় লম্বমান হয়েছে। আমার আগমন অনুভব করে বললে—কোথায় গিয়েছিলি ?

আমি বললুম—একটা নাটক করে এলুম। এ নাটকের নায়ক বেণুবাবু, নায়িকা মৃদুলা দেবী আর আমি সেজেছিলুম বেণুবাবুর রাইভেল—উপনায়ক। নিখাদ একটি হিন্দী সিনেমার প্লট। শেষে বললুম—এই সব মেয়েদের কিন্তু চিরকুমারী থাকাই উচিত।

বন্ধু বললে—তাতে অসুবিধে আছে। তাই এরা দেখে-শুনে একটা নিরেট খুঁটা বেছে নেয়। তারপর যদৃচ্ছা চরে বেড়ায়।

সেই মৃদুলা দেবী, সেই বেণুবাবু, কিছুমাত্র বদলাননি। অনুমান করলুম মৃদুলার স্বামী সেই বীরেশ্বরবাবু এখনো ছাত্র পড়াচ্ছেন। লোকটার উপর আমার বড় সহানুভূতি জাগল। সেই বাউল গানের পদটা মনে পড়ল—

"এই দুনিয়া ভাই আজব কারখানা।
কেউ শুধু দিয়ে যায়, ফিরে পায় ফাঁকি ষোলআনা।"

বাসার প্রায় কাছাকাছি এসে দেখি, গলির মুখে মাসীমা রিক্সা থেকে নেমে, মুদী দোকান থেকে কি যেন কিনছেন। হঠাৎ আমার খেয়াল হ'ল, মাসীমার কাছেই তো ব্যাপারটা শুনতে পারি। মাসীমা নিশ্চয়ই সব জানেন। ছুটে গেলুম তাঁর কাছে। তিনি যা বললেন—তাতে দেহ আমার হিম হয়ে এল।

বাসার কাছে এসে দেখি, যা ভেবেছি তাই। আমাদের ক্ষুদ্র ঘরখানি কেন্দ্র করে এক ক্ষুদ্র জনতা ঘিরে রয়েছে। দূর থেকে মনে হ'ল, তারা আমার বন্ধুর অদর্শনে হায় হায় করছে। কাছে এসে দেখলুম—তাই বটে।

বাড়ীওয়ালা সুরেনবাবু থেকে আরম্ভ করে চাওয়ালা, পানওয়ালা, বিড়িওয়ালার এক আন্তর্জাতিক 'হায় হায়' সম্মেলন। আমি ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে হবে। ভাবলুম একপা দুপা করে চম্পট দিই। কিন্তু উপায় নেই। আমি একেবারে ওদের দৃষ্টির ভেতর পড়ে গেছি। অতএব দেখামাত্র শত মুখে সহস্র প্রশ্ন আমাকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

সুরেনবাবু উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে গজ দুই দূর থেকেই বললেন—এই যে, কি ব্যাপার মশাই?

আমার উত্তর শুনবার আর তর সইল না। চাওয়ালা-পঞ্চানন একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে, এবং আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় মুখে কিছু না বলতে পেরে, আমার চোখের সামনে খাতাখানা খুলে ধরলে। দেখলুম—বন্ধুর কাছে পাওনা ষাট টাকার এক হিসেব।

সুরেনবাবু বললেন—বলুন দেখি, ব্যাপারটা কি? আরে মশাই

কালও যে আমি তার সঙ্গে কত কথা বললুম, কিন্তু এরই মধ্যে যে সে এরকম একটা কিছু করে বসবে, তা কি ভাবতে পেরেছি ? এইটুকু বলে সুরেনবাবু বোধ হয় শোকের আবেগ সামলাবার জন্যে একটু থামলেন।

এদিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে আমি কুরুক্ষেত্রের ভীষ্মের মত হয়ে উঠলুম। অবস্থাটাকে আয়ত্তে আনবার জন্যে, কারও কোনো প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গম্ভীরভাবে বললুম—ভয় কি, আমি তো আছি।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলে যে আমি আছি। কিন্তু তা কতক্ষণ ! মানুষের কখন যে কি হয়, বলা তো যায় না।

তাই বিচক্ষণ সুরেনবাবু বললেন—তা তো বটেই। তবে ঘর ভাড়া দু মাসের বাকী।

আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললুম—ঘাবড়াবেন না মশাই। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এর উপরে আর কোন কথা চলে না। সকলে আরও দু'চারটা সমবেদনা জানিয়ে প্রস্থান করল, আমিও ঘরের তালাটি খুললুম।

এই তালাটির একটু ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস বলতে গেলে বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কাহিনীটি আগে ব'লে নিতে হয়।

গলির মুখে ঐ পঞ্চাননের চায়ের দোকানে বসেই বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

আমি তখন আমার প্রাক্তন বাসস্থান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে, আশ্রয়স্থল খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার এই বাস্তুচ্যুত হওয়ারও একটু কারণ ছিল।

আমি যে-বাড়ীতে ভাড়াটেরূপে থাকতুম, সেই বাড়ীর বর্তমান মালিক প্রথম যৌবনে পিতৃসঞ্চিত অর্থের সদ্‌গতি করেছেন, চারিত্রিক অধোগতির মাধ্যমে। তারপর অর্থের টানা-

টানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌবনেও টান পড়ল। এই দোটানায় পড়ে ভদ্রলোকটি বেশ কিছু যৌতুকের বিনিময়ে বিয়ে করে একেবারে ভাল মানুষ সেজে বসলেন। কিন্তু নিয়তি বোধ হয়, তার সঙ্গে কৌতুক করবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই ছিল। তাই বিয়ের বছর দুই না যেতেই, বিশেষ কোনো কারণ না দর্শিয়েই স্ত্রীটিকে হরণ করে নিয়ে গেল।

অলক্ষ্মী যখন ঘরে প্রবেশ করে, তখন সে একটার পর একটা দুর্দৈব ঘটাতে থাকে।

যাই হোক, এই ধাক্কায় ভদ্রলোক এক নাগাড়ে প্রায় পাঁচ বছর লক্ষ্মীছাড়ার মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর অলক্ষ্মীটা বোধ হয় পা দু'খানা তার কাঁধ থেকে নামাল, তখন ভদ্রলোক আবার ঘরে ফিরে এলেন। কিন্তু ঘরে থাকতে হ'লে ঘরনীর একান্ত আবশ্যক।

যারা চিরকুমার থাকার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে থাকেন, তাদের অবশ্য গৃহিণীর অভাব তেমন অনুভূত হয় না। তারা অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে, অন্যভাবে তা পূরণ করে থাকেন।

কিন্তু যারা একবার গৃহিণীর স্বাদ পেয়েছেন, গৃহিণীর অবর্তমানে তারা মুখে বলেন বটে—ও ঝঞ্ঝাটের ভেতর আর মাথা দিচ্ছি না। কিন্তু একদিন শুভরাতে দেখা যায়, সেই ঝঞ্ঝাটই কাঁধে করে বাড়ী নিয়ে এসেছেন।

অতএব আমার সেই বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকও একদিন এক গরীবের অষ্টাদশী কন্যার পাণি পীড়ন করে বসলেন। এতে এক দিকে যেমন ভদ্রলোকের অস্তোন্মুখ যৌবনের পীড়া নিরসন হ'ল, অপরদিকে তার যুবতী স্ত্রীর নবোদগত যৌবনের পক্ষে একটা স্থায়ী পীড়ার কারণ হ'য়ে রইল। অতএব এই দুই বিরুদ্ধ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া যা হ'ল, তার ধাক্কায় একদিন আমি ঘর থেকে ছিটকে পড়লুম।

ভদ্রলোকটি নীড় বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে বাড়ীর কোটরে তিনি নীড় বাঁধতে চেয়েছিলেন সে বাড়ীটি জীর্ণ। পিতামহের আমলের বাড়ী, দোষও দেওয়া যায় না। ছাদ দিয়ে জল পড়া, চুন বালি খসে পড়ে হাড়গোড় বের হওয়া, দেওয়ালের কোণে বট অশ্বত্থ ডুমুর গাছের বাগান ও চড়াই কবুতরের আবাসস্থল হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদিও এর প্রতিকার আছে, কিন্তু টাকা! টাকা কোথায়?

ভদ্রলোকের এহেন ঝঞ্ঝাটের সময় আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। আমি ঘর খুঁজতে খুঁজতে ঘরভাড়ার এক হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন দেখে, নির্দিষ্ট বাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হ'লুম, এবং কড়া নাড়ব—এমন সময় 'হুম্' করে একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, এক বোঝা আবর্জনা নিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে হাঁপাতে হাঁপাতে একজন লোক বেরিয়ে এলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন—কি চাই?

আমি বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করে ব'ললুম—বাড়ীওয়ালাকে চাই।

লোকটি বললেন—আমিই বাড়ীওয়ালা।

আমি হেসে বললুম—তাই নাকি! নমস্কার, তা ঘরখানা কি একটু দেখতে পারি?

বাড়ীওয়ালা বললেন—বিলক্ষণ, আসুন। বলে সেই আবর্জনা-রাশি হাতে করেই ডানদিকের একটা দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—এই ঘর।

আমি যতদূর সম্ভব চোখ বিস্ফারিত করে তাকালুম, কিন্তু একটি পার্বত্য গুহার ভেতরের জমাট অন্ধকার ছাড়া, আর কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। নাকে এল একটা ভ্যাপসা গন্ধ। বাড়ীওয়ালা তাড়া দিয়ে বললেন—যান, ভেতরে চলে যান।

আমি বললুম—কোথায় যাব? পাতালে কি স্বর্গে, কিছুই যে ঠাহর করতে পারছি না।

বাড়ীওয়ালা আমাকে সমর্থন করে বললেন—তা বাইরের আলো থেকে এলে, প্রথমটায় একটু অন্ধকার লাগে বৈকি।

দেখলুম, ঘরখানা আয়তনে নেহাত ক্ষুদ্র নয়, চলনসই। ঘরের ভেতর পা বাড়াতেই 'হুস্' করে একটা চাম্‌চিকে আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি সভয়ে পিছিয়ে এলুম।

ভদ্রলোকটি বললেন—ঐ হারামজাদাকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না। এতক্ষণ ওর সঙ্গেই যুদ্ধ করছিলুম। আর আছে গোটা চারেক ধেঁড়ে ইঁদুর। তা কোনো ভয় নেই। যান ভেতরে।

আমি বললুম—আপনি যান আগে।

ভদ্রলোক হাতের আবর্জনাগুলি দরজার পাশে রেখে, আগে ঢুকলেন, আমি অনুসরণ করলুম। ভেতরে গিয়ে দিয়াশলাইর কাঠি জ্বেলে দেখি, ঘরখানিতে সৌখিনতার ছাপ এখানে ওখানে। কিন্তু বর্তমানে চাম্‌চিকে ইঁদুর কাঁকড়াবিছের রাজত্ব। ঘরে জানালা আছে, বাড়ীর ভেতরে যাবার জন্যে দরজাও আছে।

ভদ্রলোক বললেন—দেখুন, দরজা জানালা সবই আছে। তবে বহু বছর ধরে খোলা হয়নি বলে মর্‌চে ধরে আছে। অনেক টানাটানি করলুম, পারলুম না। আপনি ভাববেন না। আজকেই মিস্ত্রি ডেকে, জানালা দরজা ঠিক করে ঘরটা ধোয়া মোছা করে রাখব। আপনি-অমনি কাল চলে আসবেন।

আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম, ভদ্রলোকও এলেন। আমি একটি বিড়ি ধরাতেই তিনি হেসে বললেন—আছে নাকি আর একটা? আমি বললুম—নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন—কাল তাহলে আসছেন তো?

আমি বললুম—হ্যাঁ, প্রয়োজন বলেই তো ঘর খুঁজছি।

ভদ্রলোক বললেন—আপনার ফেমিলি মেম্বার ক'জন?

আমি বললুম—আমি একজন।

ভদ্রলোক বললেন—তাহলে তো বাড়ীর ভেতরের দরজাটা আপনি খুলতে পারবেন না।

আমি বললুম—তবে কল-পায়খানার কি হবে ?

ভদ্রলোক এবার চিন্তায় পড়লেন। সত্যই তো ভাড়াটে হলেও কল-পায়খানার তো দরকার হবেই। তবে।—? অনেক ভেবে চিন্তে বললেন—আচ্ছা ঠিক আছে, বেলা আটটার মধ্যে আপনার প্রাতঃক্রিয়া স্নানাদি সারতে হবে। আর ওদিকে রাত আটটার পর থেকে নয়টার মধ্যে, কেমন ?

আমি বললুম—তাই হবে, কিন্তু ভাড়া কত দিতে হবে ?

ভদ্রলোক একটু চুপ করে থেকে বললেন—তা ভাড়ার জন্যে কিছু আটকাবে না, ও একটা হবেই। আপনি এসে তো যান।

তারপর বিড়িতে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়ে মুখখানাকে কালো করে বললেন—দেখুন, এ বাড়ী ভাড়া দিতে হবে একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। দাদুর আমলের বাড়ী। দাদু বাড়ীর মধ্যে অপর লোক আনার বিরোধী ছিলেন। বাবার আমলে তো সে প্রশ্নই ছিল অবান্তর। তিনি খুব জাঁকের সঙ্গেই কাটিয়ে গেছেন। এখন আমার আমলেই—কথাটা শেষ না করেই ভদ্রলোক সখেদে বললেন—আমার সংসার করবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছে. আবার সংসাবে ঢুকতে হল। অথচ অবস্থা তো আর আগের মত নেই। আমার বরাত খারাপ। তাই না আজ ঘর ভাড়া দিতে হচ্ছে। বাড়ীটা মেরামত করা প্রয়োজন। কিন্তু কি দিয়ে করব বলুন, বাজার যা পড়েছে !

আমি এক লহমায় ভেবে নিলুম—আমার প্রয়োজন ঘরের, ওঁর প্রয়োজন বাড়ী মেরামতের। অতএব আমি বললুম—মেরামতের জন্যে চিন্তা নেই, আমি গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর। সরকারী কাজই আমি করে থাকি। উপরওয়ালাদের সঙ্গে আমার বেদম দহরম মহরম। ওখানকার মন্ত্রী, সান্ত্রী, যন্ত্রীদের সঙ্গে একসঙ্গে

আমি ওঠ-বোস করি। আমি এলে পর, চুন বালি সিমেণ্ট যা আমার উপরি পাওনা থাকে, তা দিয়ে আপনার বাড়ী মেরামত করে দিতে পারব।

ভদ্রলোক আমার স্যুট্ বুট্ দেখে কথাটা বিশ্বাস করলেন এবং হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। খপ্ করে আমার হাত ছ'খানা ধরে বললেন—তাহলে তো বেঁচে যাই মশাই। সে কথা যাক্। আসছেন তো বলুন?

আমি যেন কতকটা তাকে কৃতার্থ করে দিয়ে বললুম—তা আসতে পারি।

পরদিনই আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে আমি শ্রীমান গভর্নমেণ্ট কণ্ট্রাক্টর, নিধুবাবুর বাড়ীতে ভাড়াটে হিসাবে সসম্মানে প্রবেশ করলুম।

তারপর মাঝে মাঝেই নিধুবাবু আমাকে তাগিদ দিতেন—কই দাদা—

আমি তক্ষুণি ব্যস্ততার সঙ্গে বলতুম—এইতো অমুক মন্ত্রী সফরে গেছেন, তিনি ফিরে এলেই তমুক জায়গার কলোনী তৈরীর কণ্ট্রাক্টটা পেয়ে যাব। তখন এই বাড়ীটা –, আর আপনার ভাড়াটাও সেই সময়—

নিধুবাবু মাথা নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলতেন—আরে ভাড়ার জন্যে কি হয়েছে? ও আপনি সময় মত যখন হোক দেবেন, কিন্তু সেই কণ্ট্রাক্টটা পাবেন তো?

আমি জোর দিয়ে বলতুম—বিলক্ষণ।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললুম—বাড়ীর ভেতরের ঘরগুলো ভাড়া দিন না!

নিধুবাবু সজোরে মাথা নেড়ে বললেন—না মশাই। খাল কেটে কুমীর আনতে চাই না।

তার এই আপত্তির কারণটা পরে জেনেছি। তার প্রথম পক্ষকে

হরণ করেছে যম, কিন্তু এ-পক্ষ সম্বন্ধে তার যমের চেয়েও মানুষের ভয় বেশী। কিন্তু তার আশঙ্কাটা যে একদিন আমাকে নিয়েই দেখা দেবে, তখন কি ছাই জানতুম!

যাই হোক ক্রমেই নিধুবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলুম। আমি শর্ত ভঙ্গ করে দু'বারের জায়গায় চারবারও কল বাথরুমে যেতুম। নিধুবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে মাঝে মাঝে কলতলায় হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেও তিনি একটু মুচকি হেসে পাশ কেটে দাঁড়াতেন। আমি আমার কাজ সেরে চলে আসতুম।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাথরুমে ঢুকেই চম্‌কে উঠলুম! দেখি নিধুবাবুর দ্বিতীয়-পক্ষ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যতদূর জানতুম, সে সময় কেউ কলতলায় বা বাথরুমে থাকবার কথা নয়। তাই অসঙ্কোচে ঢুকে পড়েছিলুম। অতএব আত্মদোষ স্খালনের জন্যে চাপা গলায় বললুম—দেখুন, আমি বুঝতে পারিনি যে এসময়—

আমার কথা শেষ না হতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয়-পক্ষ খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলেন এবং আমার পাশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বললেন—আপনি ভারী বোকা!

আমি একেবারে বোবা হয়ে গেলুম।

খোঁজ নিয়ে জানলুম—নিধুবাবু তখন বাড়ী নেই। আমি প্রমাদ গণলুম। ঘরের ভেতর এসে ভাবতে লাগলুম—কি উপায়ে এই উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। যথানিয়মে দিন যেতে লাগল। মাঝে মাঝে চকিতে দ্বিতীয়-পক্ষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও আমি সাধ্যমত এড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলুম।

সেদিন অতিরিক্ত হাঁটাহাঁটিতে শরীরটা ছিল খুবই কাহিল। অতএব রাত্রে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

শীতের অন্ধকার রাত। আন্দাজ দুটো বাজে, হঠাৎ বাড়ীর

ভেতরকার দরজার উপর টোকা মারবার শব্দ হ'ল। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসে কান খাড়া করে রইলুম। হুঁ, ঠিকই, বাড়ীর ভেতরকার দরজার উপরই শব্দ হচ্ছে। ব্যাপার কি? একটা কৌতূহল হ'ল। আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলতেই ভূত দেখার মত চম্‌কে উঠলুম! নিধুবাবুর দ্বিতীয়-পক্ষ এই কৃষ্ণপক্ষের নিশুতি রাতে আমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। দ্বিতীয়-পক্ষ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে চাপাগলায় বললেন—বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে সত্যিই ভালবাসি।

কি জ্বালাতন! রাতদুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে, ভালবাসাটা জানাতে না এলেই কি হ'ত না?

কি করব, ঠিক পাচ্ছিলুম না। একটি তরুণী প্রেম নিবেদন করতে এসেছে। আমার তা গ্রহণ করতে আপত্তির কি থাকতে পারে? কিন্তু অনুভব করলুম, আমার পায়ের নীচের মাটিটা যেন থর্‌থর্ করে কাঁপছে! ঘর বাড়ীগুলো যেন বন্‌বন্ করে ঘুরছে! বুকের ভেতর যেন একটা কামারশালা বসেছে! আমি চোখে অন্ধকার দেখলুম।

ঠিক এমনি সময়, আমার বাড়ীওয়ালা নিধুবাবু, আমার প্রণয়-আকাঙ্ক্ষিণীর গলাটা পেছন থেকে টিপে ধরলেন। আমি দড়াম্ করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তক্ষুণি আমার পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লী বাঁধতে বসে গেলুম। মনে মনে বউটার বাপান্ত করে বললুম—মাঝখান থেকে আমাকে উদ্বাস্তু করে ছাড়লি তো! কি দরকার ছিল বাপু এসবের? যত সব!

রাত ফর্সা হবার আগেই আমি লম্বা দিলুম।

এই পাড়ায় যাতায়াতের ফলে, জানাশুনা থাকায়, পঞ্চাননের চায়ের দোকানে আমার যথাসর্বস্ব রেখে ঘরের সন্ধানে বের হলুম। খোঁজও পেলুম। কিন্তু বাড়ীওয়ালা সুরেনবাবুর সঙ্গে আলাপ করে ঘাবড়ে গেলুম। দেখলুম এ বড় শক্ত ঠাঁই। আমার গভর্নমেণ্ট

কণ্ট্রাক্টরীতে কুলোবে না। এ এত কড়া যে মাস মাস ভাড়ার টাকাটি পাইপয়সা অবধি বুঝে নিয়ে তবে ছাড়বে। মস্তিষ্ক পরিচালনা করে দেখলুম—উঁহুঁ, কোনো ফাঁক-ফন্দীই টিকবে না।

তবে ঘরখানা আমার ভারী পছন্দ হয়েছে। একেবারে বাহির মহলে। কল প্রভৃতি আবশ্যকীয় ব্যবস্থাগুলোও বাইরের দিকেই আছে। অতএব রাতত্বপুরে ঘুম ভাঙিয়ে প্রেম নিবেদন করতে কারও আসবার সম্ভাবনা নেই। সবই ভাল। কিন্তু ঘরের ভাড়া দিয়ে বাস করতে হবে, এ যে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ পর্যন্ত তো কাউকে দিইনি, আর এখন দিতে হবে? আর হবে বললেও তো চলে না। হবে কোথেকে। এদিকে সুরেনবাবুকে ঘর নেব বলে কথা দিয়ে এসেছি। চাওয়ালা পঞ্চাননের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে এই সমস্তই চিন্তা করছিলুম।

কিন্তু এতে ঘটল আর এক বিপত্তি। পঞ্চানন ভাবল, আমি বুঝি তার ঐ খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা গালভাঙা নাক-থ্যাবড়া মুখখানা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি।

সে একমুখ হেসে গর্বের সঙ্গে বললে—একি দেখছেন দাদা। পঞ্চার চেহারার তো আধখানাও নেই! হ্যাঁ, ছিল বটে বছর কয়েক আগে। এই ইয়া ছিল বুকের ছাতি। হাতের গোছা ছিল লোহার মত। আরে পালোয়ান ছাম্‌বাবু তো আমার মেছোমছাই হতেন। যিনি নাকি হাতীগুলো পিঁপ্‌ড়ের মত বুকে নিতেন আর নামাতেন, নিতেন আর নামাতেন। তিনিই আমার মেছো। সেই যে সেবার হাড়ী পাড়ার সঙ্গে মারামারিতে ছেলেদের বোম মেরে—বলে পঞ্চানন এমনভাবে হাত ঝাড়া দিলে যে সত্যিই যেন তক্ষুণি একটা কিছু করে বসবে। আর করলও বটে। উনুনের উপর দুধের কড়াটা পঞ্চাননের হাতের ঠ্যালায় সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল। মেঝেতে দুধের স্রোত বইতে লাগল। ভূতপূর্ব রোস্তম্, বোম্-মারা পঞ্চানন, আহা-হা করে উঠেই বোম্ হয়ে গেল। কম ত নয় এক কড়া দুধ!

ঠিক এমনি সময় বন্ধু এসে ঢুকল চায়ের দোকানে। বললে—এক কাপ চা দেখি।

দেখলুম বেশ হৃষ্টপুষ্ট ফর্সা টক্‌টকে চেহারা, বলিষ্ঠ তার চাউনি। কণ্ঠে নির্ভীক স্বর। বুকখানা যেন তেজে ভরপুর। ত্বনিয়ার বিপদ-আপদগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবাব জন্যেই যেন সে জন্মেছে।

পঞ্চানন মুখখানা গামলার মত করে চা বানাতে লাগল।

বন্ধুটি আমাব দিকে ফিবে বললে—আপনি কি এ পাড়ায় থাকেন?

আমি বললুম—কেন বলুন তো?

বন্ধুটি বললে—এখানে কোনো ঘরটব ভাড়া পাওয়া যায়?

আমি যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বললুম—বাঘের ত্বধ চান তো মিলিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কলকাতায় ঘব ভাড়া পাওয়া—বলে একটু হেসে ডাইনে বায়ে মাথা নাড়লুম।

বন্ধুটি বললে—তা আমি হাড়ে হাড়েই জানি। তবু বাসা ভাড়া কবে লোক আছেও তো!

আমি বললুম—তা বটে! তা আপনাব ফেমিলি-মেম্বাব ক'জন?

বন্ধুটি বললে—আমি একাই থাকব।

আমি বললুম—ওইটি আব এক মুস্কিল। কলকাতায় ফেমিলি কোয়ার্টার হয় তো বা পাওয়া যায়, কিন্তু লক্ষ্মীছাড়াব জন্যে ঘব পাওয়া বড়ই মুস্কিল। তবে আছে একখানা।

বন্ধু অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে বললে—আছে নাকি! কোথায়? কত টাকা ভাড়া? ঘব কেমন?

একসঙ্গে বহু প্রশ্ন।

আমি আড় চোখে চেয়ে দেখে স্থির কবলুম—এইবার দাও লাগাবার সময় হয়েছে। আমি বললুম—ঘরখানা আমার খোঁজেই আছে, তবে এক শর্তে সেখানা আপনাকে দিতে পারি।

বন্ধুটি বললে—বলুন।

আমি বললুম—আমাকেও থাকতে দিতে হবে।

বন্ধুটি সানন্দে রাজী হয়ে ব'ললে—তা থাকবেন, এতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে? তা আপনি কি করেন?

আমি বললুম—ব্রোকারী। ঘুঁটে থেকে আরম্ভ করে, চাক্‌রী-বাক্‌রী মায় সাপের পাঁচ পা পর্যন্ত যা চাইবেন, তাই মিলিয়ে দিতে পারি। তা আপনি?

বন্ধুটি বললে—আমি ইন্‌সিওরেন্সের এজেণ্ট।

আমি হেসে বললুম—তার মানে আমরা দুজনেই দালাল।

বন্ধুটি হেসে ফেল্‌লে। তাবপর শুরু হ'ল ব্যক্তিগত পরিচয়ের পালা। দুজনের ঠিকুজি কুষ্ঠির খবর জেনে দু'জনেই সন্তুষ্ট হ'লুম।

ব্যস্‌, তক্ষুণি ঘর দেখালুম। পছন্দও হ'ল। ঘরখানা মোটা-মুটি ভালই বলতে হবে। মেঝে পাকা, উপবে টালি, দরজা জানালা আছে। আলো হাওয়া দিব্বি হেসে খেলে বেড়ায়।

বাড়ীওয়ালা সুরেনবাবুর সঙ্গে কথাটা পাকাপাকি হবার পর বন্ধুটি একমাসের ভাড়া আগাম দিয়ে রসিদ নিল।

কিন্তু তালা ব্যতীত ঘরের অধিকার সাব্যস্ত হয় না। তালা কোথায়?

বন্ধুটি বললে—একটা কিনে আনা যাক।

আমি বললুম—তা ছাড়া উপায় কি?

বলে ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ চেয়ে দেখি—ঘরের এক কোণে স্কন্ধহীন, পেটসর্বস্ব একটা কালো ঢাউস্ কুঁজো, কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তারই পাশে একটা দেড়পো ওজনের তালা কয়েক ইঞ্চি জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। আমি সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। এটি আকারে বৃহৎ হলেও, এর কলকব্জার শক্তি অন্তর্হিত হয়েছে। হঠাৎ আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে সেটা বন্ধ হয়ে গেল। শত টানাটানিতেও সেটা আর খুলল না। ভাবলুম,

অটোমেটিক তালা নাকি? কিন্তু আবার অবাক হ'তে হ'ল, একটু কাৎ ক'রে টান দিতেই সেটা আবার খুলে গেল। তারপর বারবার এটির উপর পরীক্ষাকার্য চালাতে লাগলুম। দেখলুম সোজাভাবে তালাটি লাগিয়ে একটু নাড়া দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। আবার একটু কাৎ করে টান দিলেই খুলে যায়।

তালার মালিকটি হয়ত এর বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হ'য়েই একে পরিত্যাগ ক'রে গেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের আকস্মিক আবিষ্কারের মত এই কৌশলটি আবিষ্কৃত হওয়ায় আমাদের খুব কাজে লেগে গেল।

বন্ধুটিকে বললুম—এই তালাটিকেই আপাততঃ কাজে লাগনো যাক।

সেই থেকেই তালাটি আমাদের তার প্রভুভক্তির ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে আসছে। যে চাবিটি লাগিয়ে সকলের সামনে তালা খুলবার অভিনয় করে থাকি, তাও একদিন রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। এই হ'ল তালা প্রাপ্তির ইতিকথা।

ঘরের সামনে সেই তালাটি ধরে একটু দাঁড়িয়ে রইলুম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনা থেকেই বেরিয়ে এল। তারপর তালাটি খুলে ঘরে ঢুকলুম। দেখলুম যা কিছু ছিল, সবই আছে। কিন্তু সব চেয়ে যার থাকবার প্রয়োজন, সেই শুধু নেই। আমার বন্ধুটি নেই। চলে গেছে। এই 'নেই' শব্দটা যেন আমার কানের কাছে সংকীর্তন জুড়ে দিলে। মুহূর্তে আমার কাছে সব ফাঁকা হয়ে গেল। আবার চারদিকে তাকালুম। ঐ তো সুটকেসটি, তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিস্তার ক'রে জেঁকে বসে আছে। এই সুটকেসটি নিয়ে বন্ধুটি বিষম চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কারণ সুটকেসটির তালা লাগাবার অংশটি বহু পূর্বেই বিদায় নিয়েছিল। ইদানীং নাড়াচাড়ায় উপরের ডালাটির পেছনের দিকের কব্জা হু'টো ভেঙে গিয়েছিল। আমিই এই চিন্তা থেকে বন্ধুকে মুক্তি দিয়েছিলুম।

এক গাছা ছোলার দড়ির সাহায্যে, স্যুটকেসটিকে ঘিরে, কি করে তালা চাবি এবং কব্জার প্রয়োজন এক সঙ্গে মেটাতে হয়, তা হাতে কলমে দেখিয়ে দিয়েছিলুম। বন্ধুটি আমার মস্তিষ্কের উর্বরতা দেখে আমাকে ভূয়সী প্রশংসা তো করলই, উপরন্তু বেঁচে থাকলে আমি যে কালে কালে একজন জাঁদ্রেল বৈজ্ঞানিক হব, তারও আভাস দিল।

ঐ তো আমাদের গৃহিণী ষ্টোভটি মুখ কালো করে বসে আছে।

ঐ ষ্টোভটি দেখিয়ে, বন্ধুর অজান্তে, কত লোকের কাছ থেকে টাকাটা সিকিটা ধার করেছিলুম। ষ্টোভটি বিক্রী ক'রে তাদের পাওনা মিটিয়ে দেব, তাই ছিল খুচরো পাওনাদারদের ভরসা। কিন্তু বিক্রী করিনি, করব বলে কোনোদিন মনেও স্থান দিইনি। বন্ধুটিই একদিন পাওনাদারদের সমস্ত দাবী মিটিয়ে দিয়েছিল।

বাঁ দিকে চেয়ে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। দেখি সেই পেটসর্বস্ব ঢাউস কুঁজোটা, পেট ফাঁসিয়ে সংসারের অসারতা প্রমাণ করেছে।

এই কুঁজোটাকে বন্ধু অনেকদিন ফেলে দিতে বলেছিল। আমি বাধা দিয়ে বলেছিলুম—না রে, কুঁজোটার কাছে অনেক কিছু শেখবার আছে। দেখছিস না কুঁজোটা কত উদর নৈতিক। এর মুখটা একদম পেটের উপর চেপে বসেছে! এর ভাষ্য হ'ল—এ প্রমাণ করতে চায়, জীবের যখন উদরই আসল, এবং তার সঙ্গে যখন মুখের নিকট-সম্বন্ধ, তখন উদর ও মুখের মধ্যে অনাবশ্যক গলাটা থাকার কোনো মানে হয় না। মাঝখানে থেকে একসঙ্গে বেশী কিছু গিলবার অসুবিধার সৃষ্টি করে মাত্র, যত পার হা বড় করে পৃথিবীর ভাল ভাল জিনিসগুলো গিলে খাও। ভুঁড়ি বৃদ্ধি কর।

অতএব এমন উদর-পন্থীকে কিছুতেই অপমান কবা যায় না, বরঞ্চ রোজ এক ছড়া ফুলের মালা এর ভুঁড়িতে লেপটে রাখব।

সেই থেকে কুঁজোটা ঘরে থেকে গেছে। আজ ভুঁড়ি-বিরোধীদের পাল্লায় পড়ে হয় তো ভুঁড়িটাকে খুইয়েছে।

কুঁজোটার পাশে ধপ করে বসে পড়লুম। হঠাৎ হাতে ঠেকল একখানা খাম। কার চিঠি, কাকে লিখেছে, বুঝবার উপায় নেই। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আলোটা জ্বালিয়ে দেখি, বন্ধুর নামে একখানা চিঠি। খুলে পড়লুম। বন্ধুর মেজদা কানপুর থেকে লিখেছেন—কেমন আছ ? টাকার দরকার হলে জানিও, পাঠিয়ে দেব।

চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে রাখলুম। হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে একটা গোলমালের মত শুনে, বেড়ায় কান পেতে রইলুম। বাড়ীব ভেতর ঝগড়া বেঁধেছে। ঝগড়াব মর্ম যা উদ্ধাব কবলুম—তা আমি বুঝলেও অপরকে বোঝান যাবে না, যদি না সুবেনবাবুর সম্যক পবিচয়টা দাখিল করি।

এই সুবেনবাবুব দুটি সংসার। দুই পক্ষই বর্তমান এবং সুবেনবাবুর দুই পক্ষপুটে বহাল তবিয়তে চেপে বসেছে। অতএব সুরেনবাবুব নড়াচড়া কববার সাধ্য নেই।

নিঃসন্তান প্রথম পক্ষেব পিত্রালয়ে গমনের সুযোগ নিয়ে, সুবেনবাবু সন্তানলাভেব আশায় দ্বিতীয়াকে বিয়ে কবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে সোজা কলকাতায় চলে এলেন। নববধূকে নিয়ে নিরাপদে কলকাতায় বসে মধুযামিনী উপভোগ করতে লাগলেন।

কিন্তু কপালে যার সুখ না থাকে, তাকে বেটে দিলেও ফেটে পড়ে। প্রথমা এই বিয়ের কথা পিত্রালয়ে বসে শুনে, কোনোক্রমে ঠিকানা সংগ্রহ কবে, কলকাতায় এসে একদিন উপস্থিত হ'ল। তারপর যা আরম্ভ হ'ল তাতে কুরুক্ষেত্র এর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। সুবেনবাবুর নববধূব সুখ-সান্নিধ্য সিঁকেয় উঠল। ওষ্ঠাগতপ্রাণ সুরেনবাবু বাসায় থাকাই ছেড়ে দিলেন। সকাল আটটায় বের হয়ে রাত বাবটায় ফিরতে লাগলেন এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে, কোনোমতে রাতটুকু কাটিয়ে দিয়ে জীবনের দিনগুলো ক্ষয় করতে লাগলেন।

স্বামীকে যমকে দেব, তবু সতীনকে দেব না—এই ফরমূলা অনুযায়ী ঝগড়াটা সতীনদের মধ্যে কোনো কোনো দিন যুদ্ধের আকারে প্রকাশ হত। একদিন স্বামীর অধিকার নিয়ে লড়াইটা প্রলয় আকার ধারণ করল ও চরম নিষ্পত্তি করবার জন্যে দুই সতীনে মিলে আপদ সুরেনবাবুর গলাটা টিপে ধরল।

সুরেনবাবু দেখলেন বিষম বিপদ। প্রথমপক্ষ, দ্বিতীয়পক্ষ এবং সুরেনবাবু নিজপক্ষ মিলে একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যোগ, যার ফলে সময় মত খাওয়া শোওয়া তো চুলোয় যাক, এ যে প্রাণটা নিয়েই টানাটানি!

অতএব সুরেনবাবু একটা বিলি ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করলেন। মাসের প্রথম পনর দিন প্রথমপক্ষের, বাকী পনর দিন দ্বিতীয়পক্ষের অধিকারে, স্বামী ও সংসার থাকবে। কোনোপক্ষই কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে না।

স্ত্রীকে বলে অর্ধাঙ্গিনী। অতএব দুই স্ত্রীকে দুই অর্ধ ভাগ করে দিয়ে, সুরেনবাবু দেখলেন তার নিজের জন্যে আর কিছুই থাকল না। তাই যে মাস একত্রিশ দিনে হয়, সেই বাড়তি দিনটি সুরেনবাবু নিজের জন্যে রাখলেন।

সেই থেকে চলছিল কোনো মতে মন্দ না। ফোঁস্ ফোঁস্ ভোস্ ভোস্ কিছু হলেও মারাত্মক আকারে কিছু হয়নি।

আজকের ঝগড়াটা খোদ সুরেনবাবুর সঙ্গে তার দ্বিতীয়পক্ষের। সুরেনবাবুর সন্দেহ তার দ্বিতীয়পক্ষের সঙ্গে বন্ধুর নিশ্চয়ই কোনো 'ইয়ে টিয়ে' ছিল। কারণ সুরেনবাবু বারে বারে তর্জন গর্জন করে এই কথাটাই বলতে লাগলেন—নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে ঐ লোকটার ইয়ে ছিল। কি ছিল তা স্পষ্ট করে বলার মত সাহস হয় তো সুরেনবাবুর ছিল না, কিন্তু জবাবে দ্বিতীয়পক্ষের মুখ দিয়ে যা খইর মত ফুটতে লাগল, তা শুনে কানে আঙ্গুল দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। স্ত্রীলোকের মুখ দিয়ে যে গালাগাল এমন

ছড়ার আকারে বেরুতে পারে, তা আগে কোনো দিন শুনিনি। সুবেনবাবু কেবলই একটা কথা চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—না হলে তুই সেই লোকটার জন্যে অত হায় হায় করছিস কেন তাই আগে বল্।

আমি ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলুম, এবং স্তূপাকৃতি বিছানার পাশে রেশনব্যাগ ভর্তি চাল দেখে, দ্বিতীয়পক্ষের 'হায় হায়' করবার কারণটা বুঝলুম, এবং একটু হেসে একটা বিড়ি ধরালুম।

আমার পূর্বের বাসায় ছিল বাড়ীওয়ালার দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রীর প্রেম নিবেদনের উৎপাত। এখানে ভাবলুম, সেরকম কোনো ঝামেলা হবার উপায় নেই। কিন্তু কথায়ই আছে, এই পোড়া কপালকে কোথাও রেখে পা বাড়াবার উপায় নেই। এখানেও এক প্রকার উৎপাত জুটল। অবশ্য এটা শুধু নিছক উৎপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমার পকেটে বিলক্ষণ কিছু মুদ্রাপাতেরও ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এ প্রেমের চাইতেও সাংঘাতিক। একেবারে চোবাই কারবার।

সুরেনবাবুর সংসারেব আইন অনুসারে, যে পক্ষের হাতে যে সময় সংসার থাকবে, তখন অন্যপক্ষ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোবে। কারুর বিষয় কেউ কিছু বলতে পারবে না।

অতএব একদিন রাত প্রায় নটার সময়, আমাদের ঘরের পেছনে খচ্‌খচ্‌ শব্দ ও সঙ্গে চাপাকণ্ঠের ডাক শুনে ঘাবড়ে গেলুম—দাদা শুনছেন ?

আমি বললুম—কে রে ?

বেড়ার ওপাশ থেকে উত্তর এল—আমি বাড়ীওয়ালার বড় বউ।

এই মরেছে ! আবার এখানেও সেই উৎপাত নাকি ! আমি যথাসম্ভব চড়া গলায় বললুম—আপনার কি দরকার ?

বাড়ীওয়ালার বড় বউ ব'ললে—আমার একটা উপকার করবেন ?

আমি বললুম—কি রকম ?

বাড়ীওয়ালার বড় বউ বললে—দেখুন, আমি তো মেয়েছেলে—

আমি বললুম—দেখবার উপায় নেই, কিন্তু বুঝতে পারছি।

বড় বউ ব'ললে—আমার চাল ক'সের বিক্রী করে দেবেন ?

তখন কিসের চাল, কি ব্যাপার সব বেড়ার এপাশ ওপাশ থেকে খবরাখবর চলল। আমার মাথায় এক ব্যবসা বুদ্ধি জাগল। দর কষাকষি করে সের প্রতি তিন আনা আমার কমিশন ঠিক হ'ল। পরক্ষণেই পেছনের বেড়ার বাখারি কিছুটা ভেঙে গেল। একটা ঘুলঘুলির সৃষ্টি হ'ল। আর সেই পথে ব্যাগ-ভর্তি চাল এসে উপস্থিত হ'ল। প্রথমা কাল এমনি সময় টাকা নিতে আসবে বলে প্রস্থান করল এবং যাবার সময় এই ব্যাপারটা যাতে সুরেনবাবু ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারেন তার জন্যে সকাতর অনুরোধ জানিয়ে গেল।

ভাগ্যিস বন্ধুটি বাসায় ছিল না। তাহলে আমার এই ফলন্ত কারবারটা এক্ষুণি ডকে উঠত। সে হয়ত ঘৃণায় মুখখানা বিকৃত করে বলত—তুই নীচ, তুই অতি জঘন্য। এতেও যখন সে দেখত আমার চামড়ায় কিছু মাত্র দাগ পড়ত না, তখন সে গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকত।

আমি তো বাপু এতে দোষের কিছু দেখি না। চাল কেনেন সুরেনবাবু সংসারের জন্যে, তা গোপনে বিক্রী করে তার বউ। মাঝখান থেকে আমার কিছু মধ্যসত্ত্ব ভোগ। না-না, এতে দোষের কিছু থাকতেই পারে না ; হোক না এটা চোরাই কারবার।

প্রথমার কীর্তি দ্বিতীয়া লক্ষ্য করেছিল। অতএব তার যখন পালা এল, সেও প্রথমার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ফলে আমার একটা স্থায়ী উপরি লাভের ব্যবস্থা হয়ে গেল। এরপর থেকে কোনো

পক্ষ থেকে কিছু বলতে হ'ত না। পেছনে এসে চাল সরবরাহ-কারিণী চুড়ির ঠুনঠুন্ আওয়াজ করলেই আমি নিরাপত্তা জ্ঞাপক শব্দ করতুম। অর্থাৎ হুঁ করে জানিয়ে দিতুম, ঘরে এখন কোনো লোক নেই। অল্‌ক্লিয়ার। তার মানেই আমার ভয় ছিল বন্ধুকে। আর ওদেরও এই সময়টা ছাড়া উপায় ছিল না। সুরেনবাবু রাত দশটার এদিকে বাসায় ফিরতেন না। আর যদি ঘরে বন্ধু বা অন্য কোনো লোক থাকত তবে আমার সিগন্যাল ছিল—আমি বলে উঠতুম—নাঃ আজ আর ছারপোকার জ্বালায় ঘুমোবার উপায় থাকবে না। তার মানে ডেঞ্জার! তাহলেই চাল প্রদান-কারিণী অদৃশ্য হত, এবং পরের দিন আবার চাল নিয়ে আসতো। সুরেনবাবু এই বস্তীটি কিনেছিলেন। ভেতরে তিনখানা ঘর, বাইরে একখানা। ভেতরের ঘর কখানা নিয়ে সুরেনবাবু থাকতেন। বাইরেরটা দখল কবেছিলুম আমরা। অতএব অন্য লোকের সমাগমটা কমই হ'ত বাড়ীতে। ফলে আমাদের কারবারটা একরকম নির্বিঘ্নেই চলে আসছিল।

এই চালও দ্বিতীয়া সেই উদ্দেশ্যে আমাকে না পেয়ে, বন্ধুর কাছেই দিয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিল সমস্ত ব্যাপারের মত এই কারবারেও বন্ধুটি ও আমি সমান অংশীদার।

বন্ধু হয়ত অবাক হয়েছিল। সে কি বলেছিল জানি না; বা আমার সঙ্কেত শব্দ না পেয়েও দ্বিতীয়া কেন চাল দিয়ে গিয়েছিল জানি না, হয়ত বা ঘুলঘুলি দিয়ে বন্ধুকে একা ঘরে দেখে, নিশ্চিন্ত মনে তার কাছে চালের ব্যাগটা দিয়ে চলে গেছে। এখন সেই বন্ধুর অবর্তমানে দ্বিতীয়ার সমূহ লোকসান হয়ে যাওয়াতে সে বার বারই সুরেনবাবুকে বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করতে লাগল। সুরেনবাবুর সন্দেহের উদ্রেক হবার এই কারণ।

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল। বারকয়েক ব্যর্থ টান দিয়ে ফেলে দিলুম এবং সুটকেসটির পাশে মেঝেতে পা ছড়িয়ে ব'সলুম।

স্যুটকেসটি খুলবার প্রয়োজন ছিল না। মূল্যবান বস্তুর মধ্যে আছে উঁইয়ে-কাটা একখানা ফটো ও তার সঙ্গে একখানা চিঠি। আর কয়েকখানা পুরোনো মাসিক পত্রিকা। বন্ধুর লেখা দু-একটা গল্প। ফটোর কথা মনে হ'তেই, স্যুটকেসটির দড়ির বাঁধন খুলে, ডালাটি খুললুম। দেখলুম ফটোর সঙ্গে চিঠিটা তেমনি প্যাক্ করা আছে।

ফটোখানা একটি মেয়েব। চিঠিখানাও তারই লেখা। এই ফটো ও চিঠিখানার মূল্য বন্ধুর কাছে অত্যন্ত বেশী, তাই এ দুটো সযত্নে রক্ষিত আছে।

বন্ধুদের গ্রামেরই মেয়ে। জন্ম থেকেই চেনা; কিন্তু যৌবনের সঙ্গে যৌবনেব পরিচয় ঘটল ঠিক যৌবন-আরম্ভেই।

মেয়েটি শ্যামা, তন্বী, পিঠের উপর এক রাশ কোকড়ান কালো চুল, আয়ত চোখ, তিলফুলের মত নাক, স্নিগ্ধ শ্যামলশ্রী তার সর্বাঙ্গে। চিঠিখানা খুললুম। চিঠিখানা আগেও পড়েছি। বন্ধুর কাছে সবই জেনেছি। তথাপি আর একবার আজ পড়লুম।

প্রিয় কাব্য—

তোমার কাছে চিঠি লিখছি। চিঠির আদিতে তুমি যে ডাকে খুশি হ'তে, তাই দিয়ে আরম্ভ করলুম, আর অন্তে যে ডাকে আমি খুশি হ'তুম তাই দিয়ে ইতি দিলুম। কেন লিখলুম জান? তোমাকে জ্বালা দেবার জন্যে। সত্যিকারের ভালবাসার জনই না কি সব চেয়ে বড শত্রু। সে জ্বালা দিয়েই আনন্দ পায় বেশী। তাই বোধ হয় ধর্মবিশ্বাসী লোকদের ভগবানকে পরম নিষ্ঠুর বলে সম্বোধন করতে শুনতে পাই।

আচ্ছা কাব্য, বলতে পার, মেয়েমানুষ জন্মেই মরে যায় না কেন? বলবে, তাহলে যে সৃষ্টি রক্ষা হ'ত না; কিন্তু তা নয়। আসলে তোমাদের সাহিত্যে, বসুমতীর সঙ্গে উপমার অভাব হ'ত বলে। কিন্তু সহ্য-শক্তিরও একটা সীমা আছে। তা না হ'লে, সর্বংসহা বসুমতীর বিদ্রোহের করাল মূর্তি দেখা যায় কেন? ভূকম্পনের প্রচণ্ড আলোড়নে পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে যায় কেন?

ঠিক এরই একটা প্রমাণ পেলুম, আমাদের পাশেব বাড়ীর এক নৃশংস বিভিষীকাময় ঘটনায়।

তোমরা আমাদেব নামেব শেষে দেবী' কথাটি কেন ব্যবহার কর, তার অর্থ যেন সেদিন বুঝতে পেরেছিলুম। দেবীত্বের আসনে বসিয়ে, আমাদেরে অবাধ প্রবঞ্চনার সুযোগ পাও বলে।

নিশ্চল, নিষ্প্রাণ মূর্তির সামনে, তুমি শুধু আতপ চালই দাও, না হয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠই নাচাও, সে তো আর হাত বাড়িয়ে তোমার আঙ্গুলটাকে মুচড়ে দিতে পারছে না। তাব সে ক্ষমতা নেই। তাব ক্ষমতাকে হবণ করেছ। তাকে যে পাষাণ করে ফেলেছ! কিন্তু পাষাণ যদি একবার সজীব হযে ওঠে, তাহলে? তাহ'লে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে। পুরাণে তো অনেক নজীর দেখতে পাই। ঐ পাষাণই নাকি সজীব হ'য়ে প্রলয়ঙ্করী বিধ্বংসী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ কবেছিল, যাঁর তাণ্ডব নর্তনে সৃষ্টি পর্যন্ত বিলুপ্ত হবাব উপক্রম হয়েছিল। যাঁর ধ্বংসোন্মত্ততা বোধ কবতে, মহাকালকে পযন্ত বুক পেতে দিতে হযেছিল।

এব কিছুট প্রকাশ কিন্তু সেদিনকার ঐ ঘটনায দেখেছিলুম। যাক সে কথা পবে ব'লছি।

এখন শোনো আমার বিয়ের কথা। আমাব বিয়ের সম্বন্ধ দেখবাব সময় বাবা দু'টো জিনিস দেখে ভুলেছিলেন। একটা জমিদার বংশ আর একটা কৌলিন্য। মূল পাত্রকে বিচাব ক'ববাব প্রয়োজন বোধ কবেননি। এ যেন বিখ্যাত অভিজাত বিলাতী হোটেলে ব সে শাক-চচ্চড়ি খাওয়ার মত সামাজিক মান বৃদ্ধিব গৌবব অনুভব করা। বাবাও তেমনি তার অর্থ ও কন্যাব জীবন বিনিময়ে, সামাজিক মযাদা কিনলেন।

তুমিও তখন কাবাগারে। আমাকেও ধবে বেঁধে চালান দেওয়া হ'ল কারাগাবে। তফাতেব মধ্যে এই তোমার মেযাদ একদিন ফুরোবে, আব আমার মেয়াদ যাবজ্জীবন।

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের সময় তোমাব জন্যে মনটা বড়ই আকুল হয়েছিল। কিন্তু শুনে আশ্চর্য হবে, বিয়ের তিন দিনের মধ্যে তোমার পরিচয় বেমালুম ভুলে গেলুম। তখন আমার একমাত্র কর্তব্য হ'য়ে দাঁড়াল, কি ক'রে আমার পতি-দেবতাকে খুশি ক'রব।

বলবে—ওটা বিবাহানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ক্রিয়া। কিন্তু ঠিক সবটাই তা নয়। কিছুটা আছে আমাদের সামাজিক শিক্ষার ফল। জন্ম থেকেই শুনে আসছি, স্ত্রীলোক হচ্ছে লতার মতন পরনির্ভরশীলা। তাই অবলম্বন স্বরূপ যাকে পেলুম, তাকেই জড়িয়ে জড়িয়ে উঠতে চাইলুম।

তোমার কাছে এই কাঁদুনি গাইতে লজ্জাও যেমন করছে, তেমনি হাল্‌কাও বোধ করছি। গহ্বরে আগুন পুষে পর্বতের অটল গাম্ভীর্যের চেয়ে, অগ্ন্যুদ্‌গার করে শূন্যগর্ভ হওয়া অনেক ভাল। মৌন বেদনার যে কি জ্বালা, এ ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।

তোমাকে আমি ভালবেসেছিলুম। এটা বুঝেছিলুম দুটো ঘটনায়। একবার সেই যুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্য আমাদের গ্রামের মধ্য দিয়ে মার্চ করে যাবার সময়, বাজারে ছাউনি ফেলল। গোরা সৈন্যরা যে ভাবে বাজার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করেছিল, তা লুঠতরাজেরই নামান্তর। আরও যে সব বর্বরতার পরিচয় দিয়েছিল, তা চুপ করে সহ্য করে গেলে যে কোনো দেশের পক্ষেই গভীর লজ্জার বিষয় হ'ত।

তুমি সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়ালে। ইংরেজ কম্যাণ্ডারের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদে গাঁয়ের লোক তো সব আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তুমি এক চুলও পিছু হটনি। হটনি বলেই শেষ পযন্ত তোমারই জয় হল। কম্যাণ্ডার বাধ্য হলেন সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করতে।

কম্যাণ্ডার বলেছিলেন—দেশকে বাঁচাবার জন্যেই এই যুদ্ধ।

তুমি দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলে—না, দেশকে ধ্বংস করবার জন্যেই হয় যুদ্ধের সৃষ্টি। যুদ্ধ হল দেশের, সমাজের, সভ্যতার, সংস্কৃতির, কৃষ্টির, শান্তির মৃত্যু-পরোয়ানা। যুদ্ধবাজরা শান্তির দূত নয়, তারা হ'ল শয়তানের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষ চিরদিন জগতকে শান্তির বাণী শুনিয়ে এসেছে। ভারতবর্ষ শান্তির অগ্রদূত। 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—এ এই ভারতেরই বাণী।

তোমার বলিষ্ঠ যুক্তির কাছে ইংরেজ কম্যাণ্ডার পরাজয় স্বীকার করলেন।

গাঁয়ের লোক যখন দিব্য চোখে তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে দেখেছিল, তখন তোমার এই জয়ের খবর শুনে আমার বুকখানা দশহাত ফুলে উঠল।

আর মনে পড়ে সেই '৪২-এর আন্দোলনের কথা। সেই রাতটি আমার জীবনে অক্ষয় স্মৃতি হয়েই রয়েছে। তোমাকে অত কাছে আর কোনোদিন পাইনি।

সেদিন আমাদের বাড়ীতে সকলেই ঘুমে অচেতন, রাত তখন আন্দাজ দুটো। হঠাৎ মৃদু আঘাত পড়ল আমাদের দরজার উপর, সঙ্গে সন্তর্পণ পদক্ষেপ। আমি জেগে উঠলুম। আমি যেন চিনতে পারলুম সেই পায়ের শব্দ! তাই চুপি চুপি উঠে দুয়ার খুলতে যাব, এমন সময় মা জেগে উঠলেন, বললেন—কে রে? আমি তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললুম—উঠে এস।

দুয়ার খুলতেই দেখি, দু'তিনজন লোক তোমাকে ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। আর তোমার সারা দেহে রক্তের আলপনা। মা তো তোমার ঐ অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেললেন। আমি কিন্তু কাঁদতে পারিনি। আমার যেন মনে হচ্ছিল—রাণা প্রতাপ বুঝি মুঘল বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে ফিরে এসেছেন। তারই জয়টীকা সর্বাঙ্গে বহন করে আমার সামনে সেই বীর সৈনিক তাঁর উদ্ধত মাথা তুলে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম। এ গৌরব যেন একা আমারই উপভোগের বস্তু। মাত্র দুটো দিন আর দুটো রাত তোমাকে সেবা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তৃতীয় দিন ভোর না হতেই পুলিশ ঘিরে ফেললে আমাদের বাড়ীর চারদিকটা, আর পুলিশের চারদিকটা ঘিরে ফেললে গ্রামের অধিবাসীরা। যখন তারা দেখল তোমাকে আমাদের বাড়ী থেকেই পুলিশ ধরে নিয়ে গেল, তখন তারা যেমন অবাকও হল, সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমাকে নিয়ে সরস আলোচনার একটা খোরাক পেয়ে খুশিও হ'ল কম নয়। তারপর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে, রংয়ের উপরে রং চড়িয়ে কাহিনীটি প্রচার করত এবং যেভাবে আমাকে দেখে চোখ টেপাটেপি করত, তাতে যে কোনো মেয়ের পক্ষেই রাগ হওয়া স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু আমার যেন কেন জানি না, খুবই ভাল লাগত। মন চাইত,

তোমাকে আমাকে নিয়ে গল্প বানিয়ে বলে বেড়াক। হোক তা মিথ্যা, তবু মনটা যেন বড় খুশিতে ভরে যেত।

তোমাকে আমি ডেকেছি। অন্তর থেকে ডেকেছি। কিন্তু সে ডাক হয়ত কোনো দিনই তোমার কানে গিয়ে পৌঁছেনি। তোমার মন প্রাণ তখন দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছে। তাই আমার প্রাণের কামনা চিরদিন মূক হয়েই রইল, মুখর হবার সুযোগ পেল না। কিন্তু আমার প্রাণে ছিল ভাবের চেয়েও আবেগের বন্যা, নেশার চেয়ে উন্মাদনা, আশার চেয়ে প্রত্যাশা।

যাক্‌গে—যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছিলুম তাই শোনো। আমার শ্বশুর বাড়ীর পাশের বাড়ীটা হল মিত্রদের। সেই বাড়ীরই বিনয়বাবু হলেন ডাক্তার। ন্যাশনাল স্কুলের পাশ করা। বাড়ীতেই ডিস্‌পেন্সারী দিয়ে বসেছেন।

তাঁর স্ত্রীটি অত্যন্ত ভাল, সাত চড়ে যারা রা' করে না, তারাই তো তোমাদের মতে ঘরের লক্ষ্মী। সেও অনায়াসেই সেই সার্টিফিকেট পেতে পারে। স্বামী তাকে ভালবাসতেন প্রাণের চেয়ে অধিক। এক কথায় স্ত্রীটি তার প্রাণাধিকা।

কিন্তু যেখানে আলো, সেইখানেই ছায়া। বউটির শাশুড়ী আর ননদিনী হলেন সেই আলোর মাঝে আঁধার। রাধাকৃষ্ণের নিবিড় প্রেমের মাঝে যেমন জটিলা কুটিলার অবস্থান। বউটিব যে অপরাধ ছিল না, তা নয়। প্রথম অপরাধ বউটির রং কালো, দ্বিতীয় অপরাধ বউটির বাবা দরিদ্র, তৃতীয় অপরাধ বউটি শিক্ষিতা ও রুচিবাদী, সবচেয়ে যেটা গুরুতর অপরাধ সেটা হল স্বামী তাকে ভালবাসেন।

স্বামীর ভালবাসার কথা বললুম কেন জান ? মেয়ে জাতটা স্বজাতির প্রতি বড় ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে থাকে। বিশেষ করে বিগতযৌবনা ও বালবিধবারাই হয়ে থাকে বেশী। শুনলে আশ্চর্য হবে যে মা পর্যন্ত ছেলেকে বিয়ে করিয়ে বউকে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে দেননি এবং রাত্রে বউকে পাহারা দিয়ে থাকতেন! ছেলে-বউর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পর্যন্ত চক্রান্ত চলে থাকে, এমন নজিরও আছে! ডিভাইড এণ্ড রুল যে শুধু ইংরেজদেরই পলিসি তা নয়, আমাদের সংসারগুলোও প্রতিনিয়তই এই পলিটিক্‌সের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

অবশ্য এক্ষেত্রে আরও একটা কারণ ছিল। বউটির বালবিধবা ননদিনীর স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছিল। কাজে কাজেই সবটা মিলিয়ে তার বিরুদ্ধে যা আরম্ভ হল, তা তোমাকে লিখে জানাতে পারব না, মোটের উপর তোমাদের সর্বংসহা বসুমতী হলেও এতদিনে দু'ফাঁক হয়ে যেত।

যদিও এটি একটি ঘটনামাত্র। এরূপ যে সর্বত্রই ঘটে, তা নয়। তবে এক জাতীয় লোক আছে, যারা ধ্বংসেব মাঝে একটা পৈশাচিক উল্লাস অনুভব করে, যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আনন্দের, যেখানে হাসি, যেখানে শান্তির নির্ঝর, সেইখানেই এরা একটা দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। এরা আসে আগুন লাগাতে, আগুন জ্বালাতে, এরা কুৎসিতের উপাসক।

যাই হোক, বউটির উপর এই নির্যাতনের কথা তার স্বামী প্রথমে কিছু জানতে পারেননি। বউটি নীরবেই সব সহ্য করে গেছে। সকলের খাওয়ার পর সে খেতে গিয়ে যে ডালের ভেতর লবণ বা জল মেশানো পেত, বা ভাতের হাঁড়ির ভেতর ধুলোবালি দিয়ে রাখা হত, অথবা স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে শাশুড়ী ননদিনীর সমবেত আক্রমণে তার মাথার চুল যে মুঠোমুঠো উঠে যেত, এসব কিছুই সে স্বামীকে বলেনি। অবশেষে একান্ত নিরুপায় হয়েই একদিন স্বামীকে সব কথা খুলে বললে। তাতে স্বামী তাকে সেই প্রথমভাগের নীতিকথা শুনিয়েই কর্তব্য শেষ করলেন—গুরুজনদের শ্রদ্ধা কবতে, তাদের আদেশ অবনতমস্তকে পালন করতে উপদেশ দিলেন।

অতএব স্বামীর উপদেশ ও শাশুড়ী ননদিনীর নির্যাতন সমানভাবেই চলতে লাগল।

একদিন বউটি মরিয়া হয়ে উঠল। সেদিন স্বামীটি ছিলেন বাড়ীতে অনুপস্থিত। ডাক্তারের আলমারীতে ছিল তীব্র বিষ। সেই বিষ দিয়েই তৈরী হল শাশুড়ী ননদের রাতের লুচি তরকারি সব। রাত্রে খেয়ে দুজনের শুরু হল বিষক্রিয়া। গ্রামে হস্‌পিটাল থাকে না। সেখানে নিভর করতে হয় ডাক্তার বা হাতুড়ের উপর। তাই বা কে খবর দেয়। এদিকে চলেছে ভরাভাদরের ঝরারাত্রি, অন্যদিকে শাশুড়ী, ননদিনী বিষক্রিয়ায় ঢলে পড়তে লাগল! বাড়ীতে আর কোনো দ্বিতীয় লোক

ছিল না। বউটি নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখল এই অসহায় মৃত্যু! তারপর নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হঠাৎ ঘরের পেছনে জলে উঠল আগুন দাউদাউ করে। সেই সর্বভুক অগ্নিদেবতার কাছে, আত্মসমর্পণ করল নির্যাতিতা, লাঞ্ছিতা বাংলার এক সতীসীমন্তিনী। আগুনের জ্বালা দিয়ে জীবনের জ্বালা জুড়াল।

বউটি সম্বন্ধে যা খুশি বিচার করতে হয় কর। কিন্তু যা ঘটেছিল তাই শুধু জানালুম।

এখন শোনো শ্বশুর বাড়ীতে আমার জীবনযাত্রার কাহিনী।

যেদিন এ বাড়ীতে প্রথম এলুম, সেদিন থেকেই এই বাড়ীটি সম্বন্ধে মনে একটা সশঙ্ক বিস্ময়ের ভাব বাসা বেঁধেছে।

প্রায় আধমাইল জুড়ে সুউচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত প্রকাণ্ড বাড়ী। সিংহদরজা পার হয়েই বা'র মহল। আব একটা অনুরূপ দরজা পার হলে তবে অন্দরমহলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রায় অর্ধশত অট্টালিকা বাড়ীটির সুবৃহৎ গোষ্ঠার সাক্ষ্য বহন করে আছে। বাগানে দেশী বিলাতী সৌখিন ফুলের গাছ বাগানের কৌলিন্য বৃদ্ধি করেছিল। এককালে যে এ বাড়ীর গগনচুম্বী স্পর্দ্ধা ছিল, বাড়ীটির পারিপার্শ্বিকতা তারই প্রমাণ দেয়।

আর এখন ?

যে প্রাচীর ডিঙিয়ে একদিন বাইরের বাতাস ঢুকত সন্তর্পণে, সেখানে আজ ভগ্ন দ্বারপথে গরু মোষ অবাধ গতিতে ঢোকে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। সেই পূর্বের সযত্নরক্ষিত বাগানের ভেতর মহানন্দে ঘাস খায়। কৃষকরা কর্মক্লান্ত হয়ে বাগানের নারকেল গাছে উঠে নারকেল পেড়ে খায়, কেউ দেখবার নেই, কেউ বলবার নেই। যিনি আছেন, তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই। যে সিংহদ্বারের শীর্ষে, নহবতখানায় বাজত নহবত, বাজত সানাইয়ে ভৈরবী রাগিনী, যে সিংহদ্বারে পাহারা দিত সঙ্গীনধারী পাহারাওয়ালা, বাজত প্রহরে প্রহরে সময় জ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি, রাত এগারটার সময় যে দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যেত, সেই সিংহদ্বার আজ জীর্ণ অবস্থায় এক পাশে হেলে পড়ে আছে। দরোয়ানদের থাকবার ঘরগুলোতে গ্রামের ছেলেরা তাস খেলে।

মাটির বুকে প্রাকৃতিক নিয়মে আগাছা জন্মেছিল, তাকে কৃত্রিম

উপায়ে নষ্ট ক'রে, সেখানে আমদানী করা হয়েছিল দেশী বিলাতী নানারকমের কুলীন গাছ। আগাছারা সেদিন হারিয়েছিল তাদের মাটির অধিকার। শুধু তাই নয়, তাদের কেটে পচিয়ে সার প্রস্তুত করে সেই বাবু গাছের গোড়ায় দিয়ে তাদের দেহ পুষ্ট করেছিল। তাদেরই হাড়মাস খেয়ে, সেই কুলীন গাছগুলো গর্বভরে উদ্ধত মাথা তুলে দাঁড়াল। সকলে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে সেই বাবুগাছগুলোর দিকে চেয়ে একবাক্যে স্বীকার করল—হ্যাঁ, গাছ বটে! সঙ্গে সঙ্গে সকলে এই মন্তব্যও করল—আগাছাগুলো নিতান্তই আগাছা। ওগুলোকে এমনি ভাবেই পায়ের নীচে দাবিয়ে রাখা উচিত। কিন্তু সেদিন সেই মন্তব্যকারীরা ভুল করেছিল যে এই আগাছার ভেতরই রয়েছে তাদের সঞ্জীবনী সুধা, তাদের বিকারের দাওয়াই। এই আগাছারাই নিজ প্রাণ বিনিময়ে নিষ্কাসিত হয়ে তৈরী করে দেয় নানা রোগের অমোঘ অষুধ।

কিন্তু মানুষ ভুল করলেও, আগাছারা এই অত্যাচার ভুলে যায় নি। তারা নীরবে মেনে নেযনি এই অমানবিক বিধান। তাই তারা তখন থেকে চেষ্টা করছিল তাদের সেই হৃত মাটির অধিকার পুনরুদ্ধার করতে। তারা বাব বার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, বার বারই তাদের বিনষ্ট হতে হল। এই ভাবে কত আগাছা যে শহীদ হল তার হিসেব নেই। কিন্তু তাদেব এই আত্মদান বিফলে যায়নি। তাদের মরণে আগাছারা পেল মরণজয়ী শক্তি। তাই আজ সুযোগ পেয়ে তারা একসঙ্গে মাথা তুলে দাড়িযেছে। তাদের সংঘবদ্ধ চাপে ক্ষীণপ্রাণ মুমূর্ষু বাবুগাছগুলোর দিকে চেয়ে বলছে—ভেবেছিলে আমাদের রক্ত চুষে তোমাদের দেহসৌষ্ঠব বাড়াবে, কিন্তু তা আর হবার নয়। আমরা সব মরা-প্রাণ একত্র হয়ে এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছি। তাই তো আমাদের এই অভ্যুত্থানে তোমরা ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়েছ! তোমাদেরও আমাদের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। তোমরা একান্ত ভাবে পরনির্ভরশীল। অপরে তোমাদের আহায যোগাবে, তাহ'লে তোমাদের খাওয়া হবে। পরিচারক পরিচযা করবে, তবে তোমরা সুস্থ থাকবে।

আর আমরা? আমাদের কারও পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। আমরা নিজেদের আহার্য নিজেরাই আহরণ করে খাই। আমরা

স্বাবলম্বী, তাই আমরা আজও বেঁচে আছি এবং ভবিষ্যতে আমরাই বেঁচে থাকব। এটা ঠিক জেনো, মাটির ধূলো যাদের অঙ্গের প্রসাধন, তাদেরই হবে মাটির অধিকার। আর যারা মাটিকে অস্বীকার করে মাটির উপসত্ব ভোগ করবে, তারা যাবে ধূলোর সঙ্গে মিশে।

তোমরা মরছ, মরবে। এ-ই নিয়ম। অত্যাচার অবিচার, চিরদিনের জন্যে নয়। এর প্রতিকার হবেই, এর অবসান হবেই।

এই আগাছাগুলোকে দেখলে মনে হয়, এরা কত শান্তিপ্রিয়! এরা কত সাম্যবাদী! গায়ে গায়ে লেগে আছে, অথচ কারো সঙ্গে কারো বিরোধ নেই। সকলেই সমান অধিকার ভোগ করছে।

বাড়ীময় আগাছার জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকাগুলো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে কোনোটা ধ্বসে প'ড়েছে, কোনোটা বা ধ্বংসোন্মুখ।

বাড়ীর অন্যান্য পরিজন সকলেই বহুদিন যাবৎ দেশছাড়া, এক আমার স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো বংশধর এই বিরাট বাড়ীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাড়ীর মধ্যে আমরা যে অট্টালিকায় থাকি, সেইটিই একমাত্র কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে কোনোমতে টিঁকে আছে।

রাজপুরী এখন রাক্ষসপুরীতে পরিণত হ'য়েছে। দারিদ্র্যের রূপ ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঐশ্বর্যের পতন বিভীষিকাময়!

এদের বাড়ীর চারপাশে বিত্তভোগী কয়েক ঘর প্রজা আছে। এদের বলে খানাবাড়ীর প্রজা। এরা পুরুষানুক্রমে যেমন বিত্ত ভোগ করে, তেমনি এরা এঁদের হ'য়ে লাঠি ধরে, পাল্‌কী বয়, ক্ষৌর কার্য, কাপড় কাঁচা, চাকর, ঝির কাজও করে। পাল্‌কী দু'খানা এখনও বা'র-বাড়ীতে পড়ে আছে, তার ভেতর গাঁয়ের লোকে হাঁস মুরগী পোষে।

এইরকম একটি বিত্তভোগী পরিবারের বৃদ্ধা ক্ষেমীর-মায়ের কাছেই এই বাড়ীর ইতিহাস শুনেছি। সে বলেছে, কর্তাদের আমলে এখানে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত। যেমন ছিল তাদের দোর্দণ্ডপ্রতাপ, তেমনি ছিল তাদের জাঁকজমক। পূজোর সময়

তাদের মত বিত্তভোগীদের ঝি বউরা তো বাবুদের সেবাতেই নিয়োজিত থাকত। এর নাকি কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের ঘরের পুরুষরাও এটাকে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিল। তারাই তদারক করে মেয়ে, বউদের পাঠিয়ে দিত নৈশবিহারের জন্যে বাবুদের আড্ডায়। এর জন্যে অবশ্য আলাদা পার্বণীর ব্যবস্থা ছিল। ক্ষেমীর-মা তো সগর্বে একখানা শাল দেখিয়ে কথাটার প্রমাণ দিয়েছিল।

এই ক্ষেমীর-মা আমাকে একদিন এই বাড়ীর কোণের দিকের একটা মজা কুয়া দেখিয়ে বলেছিল—এটার নাম মড়া খেকো কুয়া। ওর মধ্যে খুঁজলে অমন শত শত নরকঙ্কাল পাওয়া যাবে। এসব নাকি বাবুরা শুধু আক্রোশ বশেই খুন করে রাতারাতি হজম করেছিল।

এই ক্ষেমীর-মায়ের কাছে আর একটা গল্প শুনেছি। এই বাবুদেরই একজন নদীর ধাবে শিকার করতে গিয়ে নদীর ঘাটে মধু মোড়লের বউকে দেখে, তার শিকাবী চোখ প্রলুব্ধ হয়ে উঠল। তাকে শিস্ দিয়ে কাছে ডাকতেই বউটি সভয়ে বাড়ীর ভেতর অন্তর্ধান হ'ল। এতে বাবুটিব উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। তিনিও শিস দিতে দিতে বউটির পেছন পেছন বাড়ীর মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং অবতাররূপী জমিদারবাবুকে দেখে, মধু মোড়ল তো ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। জমিদারবাবুটি সোজাসুজি সেই বউটিকে দেখবার প্রস্তাব কবলেন, এসব তাদের কাছে ছেলে খেলা। এর যে কোনো গুরুত্ব আছে, তা তারা আমলই দিতেন না। মধু মোড়ল অনেক কাকুতি-মিনতি করে বাবুকে নিরস্ত হ'তে অনুরোধ করল, কিন্তু মধু যত বলে, বাবুটির জিদও তত বাড়ে। অবশেষে তখনকার মত বাবুটি চলে গেলেন।

ফিরে এলেন সন্ধ্যার পর, সদলবলে। কিন্তু ঘরে ঢুকে যেই বউটিব দিকে হাত বাড়াতে যাওয়া, অমনি ঘটল এক অঘটন। এত শক্তি, এত সাহস ওই গেঁয়ো চাষার-বউর বুকে কোথায় লুকিয়ে ছিল কে জানে? বউটি আঁশ বটি দিয়ে বাবুর প্রসারিত হাতের কব্জীর উপর মারল এক কোপ, বাবুর হাতখানা গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। ঝর্ ঝর্ করে রক্ত পড়ল ঝ'রে। আর সঙ্গে সঙ্গে বউটি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটির উপর।

যখন তার জ্ঞান হল, তখন সে জমিদারের বাগান-বাড়ীতে পাইক্‌দের আড্ডায়। পাইক্‌রা জমিদারবাবুদের প্রসাদ, বখশিসরূপে প্রায়ই পেয়ে থাকে।

তারপর? তারপরের ঘটনা ঐ ক্ষেমীর-মা জানে।

ক্ষেমীর-মা ঐ কুয়াটা দেখিয়ে বললে—খোদার উপর খোদ্‌কারী। বউটা শুদ্ধ সবকটাকে কেটে এই কুয়ার ভেতর ফেলে দিলে। সেই রাতের মধ্যেই তাদের বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে নিশ্চিহ্ন করে দিলে।

ক্ষেমীর-মায়ের মতে বউটিরই নাকি নেহাত অন্যায় হয়েছিল। অতএব ফলও পেয়েছে হাতে হাতে। যেমন কম্মো তেমনি ফল। একে জমিদার তাতে অন্নদাতা! তিনি না হয় একটা সাধ করেই ছিলেন। এত বড পুণ্যির কথা, দেব-ভোগে লাগা! তাতে আঁশ বটি দিয়ে কোপ!

যাক্‌গে ওসব।—আমার স্বামী জমিদার বটে, কিন্তু জমি নেই, আছে শুধু দার, এবং আমাকে নিয়ে ইনি এবার তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেন। মধ্যমা মরে গিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন, প্রথমা নিঃসন্তান হওয়ায় পরিত্যক্তা হয়ে বাপের বাড়ীতে সুখে দিন কাটাচ্ছেন। তৃতীয় শিকার আমি।

পুরুষানুক্রমে রক্ত-ধারাকে বহন করে, উত্তর পুরুষের ধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার আমার স্বামীর একটা পবিত্র দায়িত্ব রয়েছে। তাই আমাকে স্ত্রী রূপে নিয়ে আসা। তুমি ব'লতে পার, সবাই যখন বাড়ী ছেড়ে গেল, তখন আমার স্বামীইবা এখানে পড়ে রইলেন কেন?

তার কারণ তিনি এ তল্লাট ছেড়ে গেলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের সযত্নে রক্ষিত বাজারের সাহাদের মদের দোকানটির অবস্থা কি হবে? তারপর কয়েকজন অনুগৃহীতা আছে। তিনি চলে গেলে, এইসব অবলা রমণীরা কি অনাথা হ'য়ে পড়বে না? তাই প্রাণনাথ আমার এখানেই রয়ে গেলেন এবং নিয়মিত সন্ধ্যায়, কারণ পান করে কোনো দিন বা বাড়ী আসেন, কোনোদিন বা কোনো অনুগৃহীতাকে অনুগ্রহ বিতরণ করেন।

যেদিন বাড়ী আসেন, সেদিন পতির প্রেমালিঙ্গনের জন্যে তৈরী হ'য়েই থাকি।

নিজ হাতে মদ ঢেলে দিতে হয়, আর যদি কোনো অনুগৃহীতাকে বাড়ী নিয়ে আসেন, সেদিন আমার সেই বেসরকারী সতীনের ভোজ্য বস্তু নিজ হাতে প্রস্তুত করে পরিবেশন করতে হয়। শুধু তাই নয়, তাদের বাসর-শয্যাও আমাকেই রচনা করে দিতে হয়, "আমারই বঁধুয়া আন্ বাড়ী যায়, আমারই আঙিনা দিয়া"—শ্রীরাধিকার এই খেদোক্তির সঙ্গে আমার তফাৎ অনেক। এ আমারই স্বামী একই বাড়ীতে গণিকা নিয়ে রাত্রি যাপন করছেন, আর পাশের ঘরে আমি বসে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করছি। একবার চোখ বুজে দৃশ্যটা কল্পনা করে নাও।

মাঝে মাঝে পতি-দেবতার ক্রোধরূপ বৃত্তিকে শান্ত করবার জন্যে, পিঠখানা পেতে দিতে হয়। চাবুক বা পায়ের লাথি—না—না—পায়ের কথাটা হয়ত অসম্মানজনক কথা হ'ল। শ্রীচরণের লাথি বলাই উচিত, যা হোক একটা হলেই হ'ল। সব চেয়ে অবাক ব্যাপার, যে শ্রীচরণ দিয়ে স্বামী আমার লাথি উপহার দেন, সেই শ্রীচরণ আমাকেই আবার টিপে দিতে হয়, তাঁর আরামের জন্যে!

লক্ষ্মীর পাঁচালীর মধ্যে প'ড়েছি—"

"যেই নারী করে সদা পতিপদ সেবা,
নিশ্চয়ই জানিবা সতী, স্বর্গপুরে যাবা।"

তোমাদের সীতা সাবিত্রীর চুলের মুঠি ধরে এনে দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে, কি করে পতি সেবা করতে হয়!

আচ্ছা মনে পড়ে, আমি একদিন সাবান দিয়ে মাথা ধুয়েছিলুম। তুমি আমার সেই একরাশ রুক্ষ চুল দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে র'য়েছিলে। ভাবখানা ছিল—"কুচ বরণ কন্যা তোমার মেঘবরণ কেশ।"

এখন যদি আমাকে দেখ তো সেই রুক্ষ চুলই শুধু দেখতে পাবে না, তার সঙ্গে পিঠের উপর চাবুকের ডোরা ডোরা দাগও দেখতে পাবে।

কিন্তু আমি সত্যি জানি, এ দেখে তোমার ভাব, ভিরমি খেয়ে পড়বে।

ভাবজগতে উপদেশ দেওয়া চলে, উপমা দেওযা চলে, কিন্তু বাস্তবে তা নিস্ফল।

সূর্যকে সোনার বরণ বলে কল্পনা করা যায়, কিন্তু কাছে গেলে

পুড়ে মরতে হয়, হিমালয়ের তুষারধবল শৃঙ্গের দিকে চেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা সহজ, কিন্তু উপরে উঠলে হিমে জমাট বেঁধে যেতে হবে। সমুদ্রের তরঙ্গের অঙ্গভঙ্গকে রঙ্গ বলে ভাবতে পার, কিন্তু তার মধ্যে পড়লে মুহূর্তে ভবলীলা সাঙ্গ হ'য়ে যাবে।

তাই পূর্বের-আমি তোমার কাছে কল্পনা। বর্তমানের আমি বাস্তব।

কিন্তু কি করে বোঝাব, কেন আমি এত সয়েও এখানে প'ড়ে আছি, পালিয়ে যাইনি কেন? বাপের বাড়ী যাইনি কেন? বিষ খেয়ে মরিনি কেন?

তার কারণ, মিত্তির বাড়ীর বউটি যার জন্যে স্বামীকে বাঁচিয়ে রেখে অন্য সকলের সঙ্গে নিজেও মৃত্যুকে বরণ করেছিল। স্বামীকে যমের হাতে দেওয়া যায়, তবু সতীনের হাতে দেওয়া যায় না। মেয়েদের স্বামী সম্বন্ধে এমনি দুর্বলতা। আমার কিন্তু উল্টা, আমি যমকে দিতে চাই না, বরঞ্চ সতীনকে দিতে চাই। সেই জন্যে আমার বড় সতীনের কাছে এখানে আসবার জন্যে চিঠি লিখেছিলুম। কিন্তু তিনি আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছেন—তিনি আর এই স্বর্গসুখ ভোগ করতে আসতে রাজী নন।

সমস্ত সংস্কার ত্যাগ করলেও, আমি তো কিছুতেই আমার স্বামীকে নিজ হাতে যমের হাতে ঠেলে দিয়ে যেতে পারি না। ওঁকে একা ফেলে গেলে, ওই ক্ষেমীর-মাই একদিন ওঁকে বিষ খাইয়ে মেরে, বাকী যা আছে তা নিয়ে পালাবে।

একটা কথা ভুলে যেও না, আমি নারী। বাংলাদেশের জলবায়ুতে সেই দেশেরই চিরন্তন সংস্কার রক্তে ধারণ করে, বড় হ'য়ে উঠেছি।

আর যাই হোক্, স্বামীর পরিচয়ই তো বহন ক'রে আমার সারাটা জীবন কাটাতে হবে। আমাদের বিবাহিত জীবন সোজাই চলুক, আর বাঁকাই চলুক, তা রেলগাড়ীর মত চিহ্নিত পথেই চল্‌তে হবে। এদিক ওদিক যাওয়া চলবে না।

তোমাকে যে জানালুম, তার কারণটা পূর্বেই আমি বলেছি। কিছুদিন ধরেই চিন্তা করেছি, কারো কাছে সব খুলে বলে আমাকে হালকা হতে হবে। আমার বিবেচনায় সে উপযুক্ত লোক হ'চ্ছ তুমি।

জান তো—যে পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ে, সেই পাতাই নিজেকে পচিয়ে সার হয়ে, গাছকে পুষ্ট করে, রক্ষা করে, বাঁচিয়ে রাখে। আমি সেই ঝরা পাতা।

সব শেষে একটা কথা বলে ইতি দিচ্ছি। তোমাকে যেমন অসঙ্কোচে আঘাতও দিতে পারি, তেমনি অসঙ্কোচে ভালবাসতেও পারি। ইতি

তোমার

কাহিনী

সদ্য কারামুক্ত বন্ধুটি এই চিঠি পেয়ে, সেইদিনই কাহিনীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। কাহিনীর যখন বিয়ে হয়, তখন বন্ধুটি জেলে। তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। বন্ধুটির পক্ষে কাহিনীর কোনো খোঁজ পাওয়া বা নেওয়া কোনোটাই সম্ভব হয়নি। তাই এই চিঠি পেয়ে সে আর স্থির থাকতে পারল না।

সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গা। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে বন্ধুটি যখন গিয়ে কাহিনীর বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হ'ল, রাত তখন ন'টা বেজে গেছে।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকতে যাবে, এমন সময় তার কানে এল ঘরের মধ্যে দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ। বন্ধুটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে কান-পেতে রইল। শুনল মদমত্ত জড়িতস্বরে অশ্লীল গালাগালি, অব্যক্ত আর্তনাদ! চাবুকের সপাসপ শব্দ। মুহূর্তে বন্ধুটির ভেতর সেই বিপ্লবী মূর্তি আত্মপ্রকাশ করল। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে যে দৃশ্য সে দেখল, তাতে তার মাথার মধ্যে দপ্‌ করে আগুন জ্বলে উঠল।

দেখল, কাহিনী উপুড় হয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। আর তার অনাবৃত শীর্ণ পিঠের উপর পড়ছে স্বামীর চাবুক। বন্ধুটির আত্ম-বিস্মৃতি ঘটল। সে এক চীৎকার দিয়ে উঠল। এবং স্বামীটি কিছু বলবার আগেই হাতের রুল দিয়ে তার মাথায় সজোরে আঘাত

করে বসল। একে মাতাল অবস্থা, তার উপর এই আঘাত, স্বামীটি রক্তাক্তদেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কাহিনী শশব্যস্তে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বললে—কে, কাব্য! একি করলে? একি করলে? খুন করলে?

বন্ধুটি স্থিরদৃষ্টিতে ভূতলশায়ী কাহিনীর স্বামীর দিকে চেয়ে বললে—না, খুন করিনি। শিক্ষা দিলুম মাত্র।

কাহিনী আর্তস্বরে বলতে লাগল—তুমি এক্ষুণি এখান থেকে চলে যাও—যাও—যাও। আর দেরী ক'র না।

বন্ধুটি নীরবে সেই রাতের অন্ধকারের মধ্যেই পা বাড়াল।

দীর্ঘদিন পরে কাব্য ও কাহিনীর সাক্ষাৎ। আর এই সাক্ষাতের মুহূর্তেই একটা নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল।

কিন্তু নাটকের আরও কিছু বাকী ছিল।

ঘটনাটা গড়াল আরও দূরে।

কাহিনীব স্বামীর জ্ঞান ফিবে এলে কাহিনীর কাছে সে সব শুনল। বন্ধুটিব নাম, ধাম, পরিচয়। স্বামীটি থানায় এজাহার দিল বন্ধুটির নামে। অভিযোগ—ডাকাতি।

অতএব বন্ধুটিকে হাজিব হতে হ'ল কোর্টে। আসামীর বিপক্ষে ক্ষেমীর-মা প্রভৃতি সাক্ষ্য দিল। কিন্তু প্রধান সাক্ষী হ'ল কাহিনী।

কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে অবিচলিতভাবে কাহিনী বন্ধুকে ডাকাত বলে সনাক্ত করল।

বন্ধুটি কোর্টে একটি কথাও বলেনি।

কিন্তু হাকিম কেন জানি না, ঘটনার কথা বিশ্বাস কবলেন না। তিনি অন্য কিছু সন্দেহ করে মামলাটা ডিস্‌মিস্ করে দিলেন।

তারপর বহুদিন চলে গেছে। আমি আব বন্ধুটি একদিন যাচ্ছিলুম; হঠাৎ কলেজ স্কোয়ারের পাশে কাহিনীর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

বন্ধুটি থম্‌কে দাঁড়াল। বললে—কাহিনী!

দেখলাম স্বামী-সহ ফুটফুটে একটি ছেলে কোলে গৃহিনী কাহিনীকে।

কাহিনীও অবাক ভাবে বললে—কাব্য!

কাহিনীব স্বামী হেসে বললেন—কি, চিনতে পারছেন? না চিনলে চিহ্ন দেখাতে পারি। বলে মাথাটা নুইয়ে হেসে ফেললেন।

বন্ধুটি তাকাল কাহিনীর দিকে। কাহিনীর দাম্পত্য-জীবনে নূতন করে মধুমাস এসেছে।

কাহিনী বললে—কাব্য, শোন। বলে একটু পাশে ডেকে নিয়ে বললে—উনি আব আগের মত নেই, সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। ওই ব্যাপারেব পব থেকেই যেন ওঁর দিব্যজ্ঞান লাভ হ'ল। এখন আর মদ খান না, যাকে বলে একদম ভালমানুষ হয়ে গেছেন। তোমাকে কিন্তু উনি বড়ই শ্রদ্ধা করেন। উনি তোমার বহু খোঁজ করেছিলেন।

স্বামীটি কাছে এসে হেসে বললেন—খুব তো সেদিন বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বীবত্ব দেখিয়ে এলেন। এবার একবাব আসুন না আমাদেব বাড়ীতে। ওখান থেকে আমবা চলে এসেছি। এখানে নূতন বাড়ী কিনেছি। আসুন, সেটাও দেখা হবে, আর আমার মারেব শোধও তুলতে পাবা যাবে। আসছেন তো?

বন্ধুটি কতকটা মন্ত্রমুগ্ধেব মত বললে—আচ্ছা, যাব!

পরক্ষণেই সকলকে অবাক করে দিয়ে আমাকে একটা হ্যাচ্‌কা টান দিয়ে বললে—চল্। বলেই হন্ হন্ করে হেঁটে চলল।

কিছুদূর বন্ধুর সঙ্গে গিয়েই আমাব খেয়াল হ'ল, বললুম—ওদের ঠিকানাটা তো নেওয়া হয়নি! নিয়ে আসিগে।

বন্ধুটি খপ্ করে আমাব হাতটা ধবে বললে—না, দবকার নেই।

আমি বললুম—কেন?

বন্ধুটি বললে—কাহিনী তার জীবনকে ফিরে পেয়েছে। কোনো পথেই তার ভেতব যেন ভাঙন না আসে। ও সুখী হোক। ও শান্তিতে থাক।

বলতে বলতে বন্ধুর চোখে-মুখে এক অনির্বচনীয় আত্মতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। শ্যামলদা আর বৌদির ভেতর দেখেছি মিলন মাধুর্যময় প্রেমের বাস্তব ছবি। আর কাব্য ও কাহিনীর বিচ্ছেদের মধ্যে দেখলুম সেই প্রেমের অলৌকিক ছবি। দুটোই সত্যি, দুটোই খাঁটি। কাহিনীর ফটোখানার দিকে চেয়ে রইলুম।

বন্ধুর কাহিনী! কাব্য ও কাহিনী।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। ফটোখানা এবং চিঠিটা আবার প্যাক করে স্যুট্‌কেসের ভেতর রাখতে যাব এমন সময় নজরে পড়ল স্যুট্‌কেসের পাশে একখানা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে রয়েছে। কাগজখানা তুলে দেখলুম, উপরে লেখা আছে 'ফুট্‌কুরী'।

আমার নাম। বন্ধুটি আমাকে ঐ নামেই আদর করে ডাকত। একদিন আমি বন্ধুকে বলেছিলুম—ছ্যাখ, তুই যে কথায় কথায় আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে চাচ্ছিস, সত্যিই যদি আমি তোকে ত্যাগ করে চলে যাই, তবে তোর অবস্থাটা কি হবে একবার চিন্তা করে দেখেছিস?

বন্ধুটি বললে—হুঁ, করেছি। কাঁধের এই আবর্জনার বোঝা নামিয়ে হাল্‌কা হব।

আমি বললুম—হাল্‌কা হবি তা ঠিক, কিন্তু এত হাল্‌কা হবি যে আর চলতেই পারবি না। আমি হচ্ছি তোর আশ্চর্যবোধক চিহ্নের তলাকার ফুট্‌কুরী। আমি না থাকলে তোর সামনে থাকবে দাঁড়ির যতিচিহ্ন। তোর গতি যাবে থেমে। আর তোকে নিঃসঙ্গ দেখে, সবাই যাবে আশ্চর্য হয়ে!

সেই থেকে বন্ধু আমাকে ফুট্‌কুরী বলে ডাকত।

বন্ধুটি আমার নামে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে।

প্রিয় ফুট্‌কুরী,

আমি ওপারে গেলুম। তোর জন্যে দু'দিন অপেক্ষা করলুম।......

অবনীবাবুকে তোকে সংবাদ দিতে বলে গেলুম।.........আর কিছুতেই থাকা সম্ভব হ'ল না।......ভালভাবে থাকিস। ইতি—

তোর কাব্য

অবনীবাবু, মানে প্রথম যার মুখে বন্ধুর এপার ছেড়ে ওপারে যাবার খবরটা শুনলুম। অবনীবাবু আমাদের গৃহস্থালীর মধ্যে এক-জন অনারারী গেষ্ট, অনাহারীও বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝেই আমাদের খাবারের ভাগ তাকে দিতে হ'ত। চাকরীর জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে হতাশ হ'য়ে চা ফেরি করছেন।

যা হোক—বন্ধুর এই আকস্মিক ওপারে যাওয়ার কারণটা বড়ই করুণ। ইদানিং বন্ধুটি ভীষণ অর্থাভাবে প'ড়েছিল। ফলে তার চারদিকে পাওনাদারের যেন প্রাচীর সৃষ্টি হয়ে গেল। হাঁটতে, বসতে, খেতে, শুতে পাওনাদারের তাগাদা শুনতে লাগল। বন্ধুটি আবার পাওনাদারকে মোটেই সহ্য করতে পারত না ; পাওনাদারকে দেখলেই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত।

এদিকে আমি হচ্ছি পাওনাদার প্রুফ। পাওনাদারের গালা-গালি ও টিট্‌কারি যা কিছুই বর্ষিত হোক না কেন, ও আমার গায়ে বেঁধে না, পিছ্‌লে প'ড়ে যায়। অতএব পাওনাদার এলেই আমি ঢালের মত এগিয়ে যেতুম, বন্ধুকে রাখতুম আমার আড়ালে।

বন্ধুটির এই চিঠির মধ্যের দুটো লাইন প'ড়ে বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করলুম—"তোর জন্যে দু'দিন অপেক্ষা করলুম।...আর কিছুতেই থাকা সম্ভব হ'ল না।"

কেমন—খুব যে কথায় কথায় আমাকে লক্ষ্য করে বলা হ'ত—"ত্যজ দুর্জন সংসর্গম্‌—" অর্থাৎ তার মতে আমি হচ্ছি তার দুর্জন সঙ্গী।

তা মাত্র তো দুটো দিন ছিলুম না। আর ছিলুম না কি সাধ করে ? বন্ধুটির এই রকম টানাটানি অবস্থা। আমারও অর্থাগমের ঘরে রাহু, শনি, কেতু এক সঙ্গে শ্যেন্ দৃষ্টি দিয়ে বসেছে। তাই ভাবলুম কোথাও গিয়ে দুটো দিন দু পাত্ আয় করে আসি। হঠাৎ

দেখা সেদিন পথে আমার দাদার ভায়রাভাই কেষ্টবাবুর সঙ্গে। দেখেই আমি বত্রিশ দন্ত বিকশিত করে তিনি যে আমার আপন-জন তা ভাবে-প্রকারে বুঝিয়ে দিলুম। বীণাপাণিকে মানে দাদার ভায়রাভাইর স্ত্রীকে অনেকদিন দেখিনি, তাকে দেখবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠল। কেষ্টবাবু অবশ্য এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন. কিন্তু আমি তাকে মোটে সে চান্সই দিলুম না।

অতএব তার স্কন্ধে আরূঢ় হ'য়ে চলে গেলুম কালীঘাট। যাবার সময় অবশ্য লোক মারফত বন্ধুকে একটা খবরদিয়ে ছিলুম যে একটা চাকরীর চেষ্টায় যাচ্ছি, ফিরতে দুদিন দেরী হবে। কারণ আমি জানি আমার জন্যে চিন্তা করবার দুনিয়ায় ঐ একটা লোকই বর্তমান আছে। মুখে যতই বলুক আমাকে সে দু চোখে দেখতে পারে না, কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমি চোখের আড়াল হ'লে তার এক দণ্ডও চলবে না।

তাই ভাবলুম—মাত্র দুটো দিন ছিলুম না। এরই মধ্যে ওপারে যেতে হ'ল!

দুটো দিন কালীঘাটে দাদাব ভায়রাভাইর বাড়ীতে থেকে, খেয়ে, তাদেব কাছ থেকে যথেষ্ট আপ্যায়ন আদায় করে চলে এলুম। আসবার সময় নিজেই উপযাচক হয়ে বললুম—আবার আসব। কথাটা বলা উচিত ছিল তাদের তরফ থেকে। তা—তারা তাদের কর্তব্য না করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে আমি তো আর অচেতন থাকতে পারি না।

বন্ধুর কাছে খবর দিয়েছিলুম চাকরীর চেষ্টায় যাচ্ছি। খবরটা শুনে হয়ত সে হেসেছিল। হাসবার কথাই বটে! হন্যে হয়ে কত তো ঘুরলুম। পেলুম কই? পেলে কি আর এই চারশবিশের সোল এজেন্সী নিতুম! কি করব? বাঁচতে হবে তো?

যাই হোক আমি গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলুম, বন্ধুটি তো ওপারে গিয়ে পার পেল। কিন্তু আমি কি করি?

হঠাৎ মনে হল—বন্ধুর ওপারে যাবার ব্যাপার নিশ্চয়ই সকলের অগোচরেই ঘটেছিল। সেটা কি করে পাওনাদারদের গোচরীভূত হল? এবং দেখতে না দেখতে আমাদের বাসার সামনের গলিটা তাদের গোচারণভূমিতে পরিণত হল?

পরে অবশ্য অনুসন্ধানে জেনেছি যে অবনীবাবু পঞ্চাননের চায়ের দোকানে বসে বন্ধুর এই আর্থিক শোচনীয়তার কথা ও যার ফলে সে ওপারে গমনে বাধ্য হল সেই খবরটা সখেদে বলছিলেন আমাদের বীরুবাবুকে। অবনীবাবু অবশ্য জানতেন না, সেই পাওনাদারদের একজন হচ্ছে আমাদেরই চাওয়ালা পঞ্চানন।

পঞ্চাননের কানে কথাটা যেতেই তার হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে খান্ খান্ হয়ে গেল।

তক্ষুণি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের বাড়ীওয়ালা সুরেন বাবু। পঞ্চানন অমনি হাউমাউ করে সুরেনবাবুর কাছে সংবাদটা পরিবেশন করলে। তারপর যথারীতি সংবাদটা পাওনাদারদের মধ্যে রীলে হতে হতে গিয়ে যা দাঁড়াল তা হল এই—পাওনাদারদের চোখের সামনে লালবাতি জ্বালিয়ে বন্ধুটি আমার ভেগেছে। অতএব একটা হায়-হায় পড়ে গেল। এদিকে আমিও দুদিন ধরে এখানে নেই, কাজেই ঘটনাটার এও একটা জোরাল প্রমাণ।

বন্ধুটির চিঠিখানা আবার পড়লুম। লিখেছে—"আমি ওপারে গেলুম।" ওপার মানে গঙ্গার ওপারে। হাওড়ায় তার বোনের বাড়ী গিয়ে সে আত্মরক্ষা করেছে।

এক জায়গায় লিখেছে, "মেজদার কাছে চিঠি লিখেছি টি. এম. ও. করে টাকা পাঠাতে। টাকাটা এলেই আমি এসে সকলের পাওনা মিটিয়ে দেব।"

আমি জানি—সে করেও এক পয়সা দেনা রাখবে না। যাই হোক্—এখন আমি কি করি? একমুহূর্ত যে আমার তাকে ছাড়া চলে না। দুদিন কালীঘাট ছিলুম, কিন্তু প্রাণটা পড়ে রয়েছে তার

কাছে। একবার ভাবলুম—আমিও চম্পট্ দিয়ে ওপারে বন্ধুর কাছে গিয়ে উঠি। মরুক ব্যাটারা হাহাকার করে। কিন্তু তারপরই ভাবলুম—না সেটা ঠিক হবে না। বন্ধুকে কিছুতেই এদের কাছে ছোট হতে দিতে পারি না। বন্ধু যে কত মহৎ, কত উঁচু প্রাণ নিয়ে জন্মেছে, তা এরা কি করে বুঝবে? এরা কি করে তার কদর দেবে! তাই মুহূর্তের জন্যেও তাকে এরা প্রবঞ্চক ভাবুক—এ আমি হতে দেব না। আমি এখানে থেকে তাদের এই বোঝাব যে আমরা অর্থহীন হতে পারি, কিন্তু বিবেকহীন নই। অর্থের মাপকাঠিতে আর যারই বিচার কর অন্ততঃ আমার বন্ধুটির বিচার কর না। তাহলে একটা মহৎ লোককেই যে শুধু অপমান করা হবে তা নয়, তোমরাও লজ্জিত হবে।

অতএব বন্ধুর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় আমি দুয়ার খুলে বসে রইলুম।

সমাপ্ত